

স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা

নবম শ্রেণীর জন্য



28.5.90

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নবম শ্রেণীর ইতিহাস
Vide T. B. No. Syll / H / IX / 87 / 76 dated 13.11.87

স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা

(নবম শ্রেণী)

ডক্টর সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি.
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানী
পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নবম শ্রেণীর ইতিহাস
Vide T. B. No. Syll / H / IX / 87 / 76 dated 13.11.87

স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা

(নবম শ্রেণী)

ডক্টর সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি.
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা

এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানী
পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—মে, ১৯৮৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৮৭

মূল্য : ২৫·০০ টা. মাত্র

ললিতকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯ কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীনিমাইকুমার ঘোষ, দি ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০৯ এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ইতিহাসের নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নবম শ্রেণীর পাঠ্য 'স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা' লিখিত হইয়াছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া ইতিহাসের নূতন পাঠ্যক্রম রচিত হইয়াছে তাহা যথাযথভাবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে স্বদেশ ও সভ্যতার মূল ধারাটি সহজে জানিতে ও বুঝিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ যতটুকু প্রয়োজন তাহা দেওয়া হইয়াছে। সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগের উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে যতখানি সম্ভব প্রাঞ্জল করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থখানিতে ইতিহাসের আধুনিক গবেষণালব্ধ-জ্ঞানের সারমর্মের সহিত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিতি গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস আছে। তবে কোনভাবেই তরুণ শিক্ষার্থীদের মনকে ভারাক্রান্ত এবং বিষয়টিকে ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। এই গ্রন্থের কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা যদি কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা গ্রন্থকারকে জানান তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংশোধনের চেষ্টা করা হইবে। সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট এই গ্রন্থ সাদরে গৃহীত হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি—

পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৯৪ } বিনীত
গ্রন্থকার

HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX

CHAPTER I: Geography and History—Chief physical features—main ethnic elements—influence of Geography on History—the fundamental unity—source of ancient Indian History.

CHAPTER II: Dawn of Indian Civilization—Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of culture—Harappan civilization—chief features, antiquity, extent, urban character, town planning—social, economic and religious life—relations with the outside world.

CHAPTER III: The Vedic Age—the Aryans, homeland, literary works—Social, economic, religious life and political life of the Rig-Vedic Aryans—later developments—expansion of Vedic culture—beginning of Iron Age.

CHAPTER IV: Protest movement—social, economic and religious causes of the movement—Jainism and Buddhism—lives and teachings of Mahavira and the Buddha.

CHAPTER V: The Age of Imperialism and Political Unification—Sixteen Mahajanapadas—rise of Magadha from Bimbisara to the Mauryas—Chandragupta—Asoka—invasions of India by foreigners—Persian invasion—Alexander's invasion and its effects reference to the rule of the Indo-Greeks, Sakas and Pahlavas—Social and economic condition under the Mauryas—history of the Kushanas—the Ṣatvahana empire—history of the Gupta empire—Samudragupta—Chandragupta II—Fa-Hien—causes of the fall of the Gupta empire—Gupta culture.

CHAPTER VI: Struggle for Domination—North India—Hunas—rise of Gauda under Sasanka—Harsavardhana—Pratihara and Pala empires—tripartite struggle—important Pala and Sena rulers. Deccan—the early Chalukyas of Badami—Pulakesi II—the Rashtrakutas—South India—the Pallavas of Kunchi—the Cholas of Tanjore.

CHAPTER VII: (i) Social, economic and cultural life from the 7th century A.D. to the 12th century A.D. (ii) Commercial and cultural contacts with outside world.

CHAPTER VIII : Medieval India—the sultanate period——advent of Islam in India—Arab conquest of Sind—beginning of Muslim rule—foundation of the Delhi Sultanate—Khalji imperialism—Muhammad bin Tughluq—Firuz Tughluq—invasion of Timur—the Sayyids and Lodis.

CHAPTER IX : Rise of some Regional Powers—(i) Bengal, (ii) Bahmani Kingdom, (iii) Vijaynagar empire. Impact of Islam on India during the Sultanate Period—Sufism—Bhakti cult——religious teachers—art, literature and culture.

CHAPTER X : The Mughal Age (1526—1707) : Origins of the Mughals—foundation of the Padshahi by Babar—Mughal—Afghan contest—Sher Shah—Akbar—Jahangir and Shah Jahan—Aurangzeb—activities of the European trading companies.

CHAPTER XI : India under the Mughals—political unification—administration—trade and industry—cultural life.

CHAPTER XII : Decline and disintegration of the Mughal empire—invasion of Nadir Shah and its effects—growth of regional powers—Bengal, Hydrabad, Mysore, Awadh, Sikhs and Marathas—third battle of Panipath—its impact.

CHAPTER XIII : Growth of European commerce and conflict among European Companies—Anglo-French conflict in the Deccan—its results—causes of French failure. Growth of East India Company's commerce and political power in Bengal till 1765. British Imperial Expansion—Marathas, Mysore, Subsidiary Alliance, Sikhs—annexation of the Punjab—Dalhousie and imperial expansion—novel features.

CHAPTER XIV : Administrative Foundations—growth of British political power till 1765—implications of Dewani and Dyarchy, Growth of centralisation—Hastings to Cornwallis—new judicial and police system—land revenue—three types of arrangements—their broad effects. Industry and Trade—the cultural scene—English education—social and cultural movements.

CHAPTER XV : Peasant unrest and uprisings—Wahabi and Farazi movements—Tribal movements—Kols and Santhals—The Revolt of 1857—causes, extent of popular participation—leadership and nature of the revolt.

বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়

ভৌগোলিক পরিবেশ ও ইতিহাস

(Geography and History)

ভারত উপমহাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনগোষ্ঠী (**Physical features and ethnic elements**) :

প্রকৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি—ভৌগোলিক অবস্থান, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি—যে কোন



দেশের ইতিহাসের গতিপথকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ। আয়তনে ইহা

রাশিয়া বাদে প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমান এবং ইংলণ্ডের প্রায় কুড়ি গুণ। দুই হাজার মাইল দীর্ঘ ও প্রায় দুই হাজার মাইল বিস্তৃত এই বিশাল ভূভাগ সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত। ভারতের উত্তরদিকে হিমালয় পর্বতমালা অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া এই দেশকে স্থলপথে এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে সুলেমান ও হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী এবং উত্তর-পূর্বে আরাকান পর্বত একদিকে আফগানিস্তান, ইরান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ এবং অপরদিকে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতকে পৃথক করিয়াছে। অপর তিনদিকে রহিয়াছে সমুদ্র। দক্ষিণ-পশ্চিমে আরবসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগর।

আয়তন ও সীমা

ভূ-বিজ্ঞানীরা ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিচার করিয়া সমস্ত ভূখণ্ডকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন: (১) **হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত অঞ্চল**। কাশ্মীর, কাংড়া, কুমায়ুন, সিকিম ও তরাইসহ হিমালয়ের দক্ষিণে ঢালু সমস্ত অঞ্চল এই বিভাগের অন্তর্গত। (২) **সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতলভূমি**। উত্তর ভারতে অবস্থিত ইহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশাল ও উর্বর সমতলভূমি। উত্তরে রাজস্থান, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ হইতে দক্ষিণে মধ্যভারত পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। (৩) **মধ্যভারতের মালভূমি**। গাঙ্গেয় সমতলভূমির দক্ষিণে ও বিন্ধ্য পর্বতমালার উত্তরে ইহা অবস্থিত। একদা এই ভূভাগের বেশির ভাগ অরণ্যময় ছিল। আদিম অধিবাসী কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা এখানে বাস করিত। (৪) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি**। উত্তরে বিন্ধ্যপর্বতমালা এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যে ইহা অবস্থিত। (৫) **সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল**। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত এবং কৃষ্ণা, গোদাবরী ও কাবেরী নদী সেবিত এই অঞ্চলে আছে অনেক উর্বর স্থান ও সমৃদ্ধ বন্দর।

পাঁচটি প্রাকৃতিক বিভাগ

ভারতের জনগোষ্ঠী (Ethnic elements):

বহু জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি অধ্যুষিত ভারতের কথা মনে রাখিয়া পণ্ডিতগণ এই দেশকে 'নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর' (ethnological museum) আখ্যা দিয়াছেন।[১] শুধু দৈহিক আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া ভারতীয় জাতিগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়: (১) **নেগ্রিটো** (Negrito), (২) **প্রটো-অস্ট্রালয়েড** (Proto-Australoid), (৩) **মঙ্গোলয়েড** (Mongoloid), (৪) **মেডিটারেনিয়ান** (Mediterranean), (৫) **ওয়েস্টার্ন ব্রাকিসেফালাস** (Western Brachycephalous) ও (৬) **নর্ডিক বা আর্য** (Nordic or Aryan)। কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি ও নিম্ননাসিকাযুক্ত নেগ্রিটো জাতির লোকেরা ভারতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আন্দামান, আসাম ও দক্ষিণ ভারতের উপজাতিদের মধ্যে ইহাদের বংশধরদের দেখা পাওয়া যায়। চ্যাপ্টা নাক ও পুরু ঠোঁট বিশিষ্ট প্রটো-অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত সাদৃশ্য আছে এমন কিছু মানুষ দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগোষ্ঠীর

দৈহিক আকৃতিগত বিভাগ

(১) ভিনসেণ্ট.এ. স্মিথ, অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া দ্রষ্টব্য।

মধ্যে ছড়াইয়া আছে। হরিদ্রাভ, চ্যাপ্টা নাক ও চোয়াল উঁচু মঙ্গোলয়েড বা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক আছে আসাম, সিকিম ও মণিপুর অঞ্চলে। লম্বা মাথা, ছোট নাক ও ক্ষীণ তনু মেডিটারেনিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীর সহিত সাদৃশ্যযুক্ত মানুষ আছে গাঙ্গেয় উপত্যকা, পাঞ্জাব ও রাজপুতনায়। ওয়েস্টার্ন ব্রাকিসেফালাস বা ছোট মাথার লোকের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত মানুষ দেখা যায় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, তামিলনাড়ু ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। গৌরবর্ণ ও উন্নতনাসা নর্ডিক বা আর্যজাতির লোকেরা বাস করে প্রধানত পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে। উপরি-উক্ত নির্দিষ্ট স্থানগুলি ছাড়াও বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর লোকদের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করিতে দেখা যায়।

আকৃতি ও ভাষার দিক হইতে বিচার করিয়া ভারতের জনগোষ্ঠীকে আবার চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে: (১) আর্য বা ভারতীয় আর্য। ইহারা গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় ও উন্নত নাসিকাযুক্ত। ইহাদের ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বেশির ভাগ এই শ্রেণীভুক্ত। (২) দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী দ্রাবিড়গোষ্ঠী। ইহারা অনেকটা খর্বকায় এবং কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। ইহাদের ভাষা তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কানাড়ী উত্তর ভারতের ভাষা হইতে পৃথক। (৩) অরণ্য ও পর্বতে বসবাসকারী এই দেশের আদিম অধিবাসীরা খর্বাকৃতি, নিম্ননাসিকাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। ইহাদের অস্ট্রিক ভাষাও প্রথম দুই শ্রেণী হইতে পৃথক। কোল, ভীল, মুণ্ডা, হো, ওঁরাও প্রভৃতি উপজাতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। (৪) হরিদ্রাভ গাত্রবর্ণ, উঁচু চোয়াল ও নিম্ন নাসিকাযুক্ত মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষদের বেশির ভাগ হিমালয়ের পাদদেশ, আসাম, সিকিম ও দার্জিলিং অঞ্চলে বাস করে। গুর্খা, ভুটিয়া ও খাসী উপজাতির লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহাদের ভাষাও প্রথম তিন শ্রেণীর ভাষা হইতে পৃথক।

আকৃতি ও ভাষা ভিত্তিক জাতি বিভাগ

ভারত ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব (Influence of Geography on Indian History):

ভারত ইতিহাসে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। এই দেশের পর্বত, সমুদ্র, ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী ও জলবায়ু ভারতের জীবন, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে এক অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। ভারতের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অনেকখানি হিমালয়ের অবদান। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার শুষ্ক ও শীতল বায়ুপ্রবাহ হইতে ইহা ভারতকে রক্ষা করে। আবার পনের শত মাইল দীর্ঘ হিমালয় পর্বতমালার চূড়ায় চূড়ায় যে বিশাল তুষার স্তূপ জমিয়া উঠে তাহা হইতে ভারতের নদ-নদীগুলি সারা বৎসর জল পাইয়া থাকে। হিমালয়ের বুকে ধাক্কা খাইয়া মৌসুমী বায়ু এই দেশে বারিপাত ঘটায়। উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত থাকায় এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে সে নিজেকে দূরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রাকৃতিক সীমারেখার মধ্যে সে আপন মনে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া চলিয়াছে। আবার উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের গিরিপথগুলি দিয়া মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান ও পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশ, তিব্বত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

পর্বতের প্রভাব

গড়িয়া তুলিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের খাইবার, বোলান ও গোমাল গিরিপথগুলি দিয়া আর্য, গ্রীক, শক, হূণ, তুর্কী, পাঠান, মুঘল প্রভৃতি জাতিগুলি ভারতে প্রবেশ করিয়া এই দেশের জনসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। উত্তর-পূর্বের গিরিপথগুলি দিয়া ব্রহ্মদেশ, তিব্বত ও চীনের সঙ্গে যুগ যুগ ধরিয়া বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চলিয়াছে। ভারতের মধ্যভাগে অবস্থিত বিন্ধ্যপর্বতমালা ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক হইতে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। উত্তরে আর্যাবর্ত এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের জলবায়ু, জীবনধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া বিন্ধ্যপর্বত রাজনৈতিক ঐক্যের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। যুগে যুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করে নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতের দক্ষিণ ভাগ উপদ্বীপের আকৃতি-বিশিষ্ট। ইহার তিনদিকে আছে বঙ্গোপসাগর, ভারতমহাসাগর ও আরবসাগর। সাগর হইতে উত্থিত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই দেশে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টির উপর ভারতের কৃষি অনেকখানি নির্ভরশীল। দক্ষিণ

সমুদ্রের প্রভাব

ভারতের বিশাল উপকূলরেখা বরাবর যে জীবনধারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা দেশের উত্তরাংশের জীবনধারা হইতে খানিকটা পৃথক। দক্ষিণ দিকের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলরেখা বরাবর আছে অনেক বন্দর যাহাদের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, বোর্নিও, সুমাত্রা, জাভা এবং পশ্চিম এশিয়ার আরব, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। এই সমুদ্রপথেই চীন, রোম, মিশর, সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিত এই দেশের বাণিজ্য চলিত। মুঘলযুগে এই সমুদ্রপথ অরক্ষিত থাকায় ইউরোপের নৌবিদ্যায় পারদর্শী জাতিগুলি —পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি—সমুদ্রের উপর অধিকার স্থাপন করিতে ও উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হয়। ভারতের বিশাল অরক্ষিত উপকূল দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করে। ভারত পরাধীন হইয়া যায়।

ভারতের জীবনচর্যা, দার্শনিক চিন্তা ও সংস্কৃতিতে নদ-নদীর অসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতের প্রধান নদ-নদী সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ দিকে সমুদ্রে পড়িয়াছে। ইহাদের গতিপথের দুই দিকে যে জনপদগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের পুষ্টি যোগায় এই নদীগুলি। এদের জলধারায় উত্তর

নদ-নদীর প্রভাব

ভারতের সমতলভূমিতে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য চলে নদীপথে। বিন্ধ্য ও পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উদ্ভূত নদীগুলি—তাপ্তী, নর্মদা, কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা, কাবেরী ও গোদাবরী—দক্ষিণ ভারত ও সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষি, বাণিজ্য ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম।

এদেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, পরিমিত বৃষ্টি, উর্বরা ভূমি সবই প্রকৃতির দান। হিমালয় ও সমুদ্রবেষ্টিত ভারতে সবসময় বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা কম ছিল।

জলবায়ুর প্রভাব

ভূমি উর্বর হওয়ায় এবং নিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে এদেশের মানুষ অল্প আয়াসে শস্য উৎপাদন করিতে পারে। জীবনধারণ সহজসাধ্য হওয়ায় এদেশের মানুষ যুগে যুগে উন্নত সংস্কৃতির সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। ধর্মচর্চা, দার্শনিক আলোচনা, সাহিত্য সৃষ্টি ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করিতে তাহাদের অবসরের অভাব হয় নাই।

ভারতের মৌলিক ঐক্য (Fundamental unity of India) ঃ

ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্য আবার বিভিন্ন ধরনের—প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় ও সামাজিক। এককথায় বলা যায় ভারত 'পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ' (epitome of the world)। শীতল, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ এই তিন ধরনের জলবায়ু ভারতে বিদ্যমান। ভূপ্রকৃতিতেও বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। গাঙ্গেয় অববাহিকা যেমন শস্যশ্যামলা তেমনি রাজপুতনায় ঊষর থর মরুভূমি রহিয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত মানবগোষ্ঠীর নমুনা ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। নিগ্রোজাতির লোক যেমন আছে তেমনি আছে মঙ্গোলীয় ও আর্যরা। গ্রীক, শক হূণ, পাঠান, মুঘল প্রভৃতি বিদেশীরা ভারতের জনসমাজে মিশিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সবরকম জীব-জন্তু, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা এই দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে প্রধান ভাষা পনেরটি, তবে প্রচলিত মোট ভাষার সংখ্যা দুই শতাধিক। এইখানে বাস করেন পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্মমতের অনুগামীরা। এই দেশে প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলি হইল হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম, শিখ, পারসীক ও খ্রীষ্টান। রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, পরিধান ও খাদ্য বিষয়েও ভারতীয়দের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য রহিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মানুষের মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারে মিল নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পোশাক ও খাদ্যে পার্থক্য আছে।

বৈচিত্র্য

'নানা ভাষা, নানা মত ও নানা পরিধান' থাকা সত্ত্বেও ভারত ইতিহাসের মূল সুরটি কিন্তু ঐক্য ও সমন্বয়ের। ভারতবর্ষ শব্দটি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগকে বুঝাইতেছে। এই ভূ-ভাগে যাহারা বাস করে তাহারা ভারতীয়।[১]

ভারতীয় ঐক্যকে চারিভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায় ঃ ভাবগত, ভাষাগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। একথা স্বীকার করিতে হইবে এই ভারতীয় ঐক্য মূলতঃ ভাবগত, বস্তুগত নয়। আর্যদের আগমনের পর হইতে ইংরেজ অধিকারের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত যুগে যুগে ভারতে বিদেশীরা প্রবেশ করিয়াছে। গ্রীক, শক, তুর্কী, পাঠান, মুঘল ও ইংরেজরা এই দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এদেশীয় ও বিদেশী সভ্যতার সমন্বয়ে নূতন ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। তবুও বলা যায় ভারতীয় সভ্যতার মূল চরিত্র অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। বিদেশীরা ভারতীয় সভ্যতাকে পুষ্ট করিয়াছে। ইহার চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন ঘটাইতে পারে নাই। এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী এবং এক সভ্যতার অংশীদার ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক। এদেশের কবি, দার্শনিক ও সাহিত্যিকরা যুগে যুগে এই ভাবগত ঐক্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র দেশকে এক অখণ্ড সত্তা হিসাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ভাবগত

(১) উত্তরং যদ্ সমুদ্রস্য
হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নামঃ
ভারতী যন্ত্র সন্ততি॥ বিষ্ণুপুরাণ। সমুদ্রের উত্তরে, হিমালয়ের দক্ষিণে ভারত। সেখানে ভরতসন্তান ভারতীয়রা বাস করে।

বিদেশীরা ভারতের এই ঐক্যকে স্বীকার করিয়াছেন। জনমনে এক অখণ্ড ভারত সত্তা বিরাজমান রহিয়াছে।

ভারতীয় ঐক্যের দ্বিতীয় মূল সূত্রটি হইল ভাষা। ভারতীয় ভাষাগুলি ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে 'প্রাকৃত' ভাষা দেশের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে সম্রাট অশোক তাঁহার আদর্শ প্রচার করেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্র ভাষার স্থান গ্রহণ করে। সংস্কৃত ভাষায় সরকারী কাজকর্ম পরিচালিত হইত। গুপ্তযুগে এই ধারা পূর্ণতা পায়। যদিও উত্তর-গুপ্তযুগে দেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হিসাবে টিকিয়া থাকে। সংস্কৃত হইতে ভারতীয় ভাষা সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতের দুইখানি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত দেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই দুই মহাকাব্য পরবর্তীকালে স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং দেশের মধ্যে ভাবগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে। আধুনিক কালে ইংরাজী ভাষা ভারতীয়দের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করিয়াছে।

ভাষাগত

ভারতের কবি, শিল্পী ও দার্শনিকরা যুগে যুগে রাজনৈতিক ঐক্যের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহারা এই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। আসমুদ্র-হিমাচল এক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা তাঁহারা রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা 'চক্রবর্তী' সম্রাটের জয়গান করিয়াছেন। মৌর্য, গুপ্ত, খলজী, তুঘলক, মুঘল, ইংরেজ শাসকগণ ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গড়িয়াছেন। বলাবাহুল্য, একই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধ শক্তিশালী হইয়াছে। সারা দেশে একই ধরনের শাসন, আইন, বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থা ভারতীয়দের মনে ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছে। আধুনিককালে ব্রিটিশ শাসন, বিচারব্যবস্থা, আইন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা—রেলপথ নদীপথ, রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি—নূতন ঐক্যবোধের সৃষ্টি করে। ইংরাজী শিক্ষার প্রসার এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এই ঐক্যবোধকে আরও জোরদার করিয়াছে।

রাজনৈতিক

সর্বোপরি, বহু পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে, সমস্ত ভারতীয় জনগণ একই রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশীদার, একই ধরনের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণকারী ও প্রায় একই ধরনের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ভারতীয়রা একই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সুতরাং সারা ভারতব্যাপী 'আমরা বিবিধের মাঝে মিলন' দেখি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়।

সাংস্কৃতিক

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান (Sources of Ancient Indian History):

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচর্চার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হইল ইহার কোন লিখিত ইতিহাস নাই। অনেকে মনে করেন ভারতীয়দের ইতিহাসবোধ ছিল না। সেইজন্য

তাঁহারা অন্যান্য জাতির মত ইতিহাস লেখেন নাই।[১] আবার কেহ কেহ ইহার অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের মতে হিন্দুরা ইহকাল ও জাগতিক ঘটনাকে প্রাধান্য দিত না বলিয়াই ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়াছে। এই ব্যাখ্যা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। শিল্প ও সাহিত্যের অন্যান্য দিকে তাহারা যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছে। অনেকের ধারণা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অযত্নে বা বৈদেশিক আক্রমণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, একথা স্বীকার করা যায়, প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের উপাদান, ইতিহাসের ধারণা ও ইতিহাস রচনার পরিবেশ ছিল। শুধু ইতিহাস লেখা হয় নাই। তবে যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করা কঠিন কাজ হইলেও একেবারে দুঃসাধ্য নয়। আধুনিককালে পণ্ডিতেরা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি, মুদ্রা, সাহিত্য, রাজকাহিনী ও বিদেশীদের রচিত বিবরণী হইতে সেই ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন। এই উপাদানগুলিকে মোট চারিভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান**, (২) **প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র**, (৩) **সমকালীন ঐতিহাসিক রচনা** ও (৪) **বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী**।

(১) **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান**ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে আবার চারিভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ, (খ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, (গ) লেখ ও (ঘ) মুদ্রা।

(ক) **প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ**ঃ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে খননকার্যের ফলে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতা। সাঁচী, সারনাথ, তক্ষশীলা ও কোশাম্বী প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ফলে বৌদ্ধ যুগের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হাতে আসিয়াছে। বোলপুরের কাছে পাণ্ডু রাজার ঢিবি এবং বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুর গড় আবিষ্কারের ফলে ঐ সমস্ত এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, সাঁচী, সারনাথ, তক্ষশীলা, কোশাম্বী চন্দ্রকেতুর গড় ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য

(খ) **প্রাচীন যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য**ঃ খননকার্যের ফলে মাটির নীচে অনেক মূর্তি, মন্দির, পোড়ামাটির কাজ ও পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া পাওয়া গিয়াছে শিল্পের অন্যান্য অসংখ্য নিদর্শন। তবে শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় এইগুলি তেমন কাজে লাগে না। ধর্মের ইতিহাস রচনায় এইগুলির মূল্য অপরিসীম।

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য

সাঁচীর স্তূপ, সারনাথের বৌদ্ধবিহার, চোল ও পল্লব রাজগণের প্রস্তর নির্মিত মন্দির, পাঞ্জাব ও কান্দাহার অঞ্চলে প্রাপ্ত গান্ধার শিল্প-রীতির নিদর্শন বহনকারী

(১) মুসলিম জ্ঞানতাপস আলবিরুণী ১০০০ খ্রীঃ এই দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয়দের ইতিহাসবোধের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 'হিন্দুরা ঐতিহাসিক পারম্পর্য বুঝে না। তাহারা রাজাদের ঐতিহাসিক পরম্পরা অনুযায়ী ঘটনা বিবৃত করিতে যত্ন নেয় না। যদি তাহাদের ঐতিহাসিক তথ্য দিতে বলা হয় ও বাধ্য করা হয় তখন বিমূঢ় অবস্থায় তাহারা গল্প বলিতে শুরু করে। সাচাও (Sachau), আলবিরুণী, ১ম খ. দ্রষ্টব্য। ঐতিহাসিক ফ্লীট (Fleet)-ও হিন্দুদের ইতিহাসবোধের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। 'হিন্দুগণ ঐতিহাসিক রচনার প্রতি উদাসীন; তাহারা রাজন্যবর্গের কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ। ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য চাপ দিলে তাহারা কল্পনা ও কিংবদন্তীর আশ্রয় গ্রহণ করে।'

মূর্তিগুলি ধর্ম ও শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য উপাদান। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন হইতে সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(গ) **লেখ** (Inscriptions) ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মধ্যে লেখ-এর স্থান সর্বাগ্রে। প্রাচীনকালের রাজারা তাঁহাদের কীর্তি-কাহিনী প্রস্তর, তাম্র বা ব্রোঞ্জ ফলকে খোদিত করিয়া রাখিতেন। এইজন্য সোনা, রূপা ও লোহার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। এই লিপিগুলি হইতে রাজাদের রাজত্বকাল, সমকালীন ঘটনাবলী, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী ভাষায় উৎকীর্ণ অশোকের শিলালিপিগুলি তাঁহার শাসনকালের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক উপাদান। ইহা ছাড়া বহু ভারতীয় রাজার লেখ পাওয়া গিয়াছে। কলিঙ্গরাজ খরবেলের হাতিগুম্ফা লিপি, হরিষেণ রচিত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি, সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির নাসিক প্রশস্তি, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালিপি,[১] হর্ষবর্ধনের তাম্রলিপি, শশাঙ্কের গঞ্জামলিপি ও উমাপতিধর রচিত বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি[২] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রাপ্ত লেখ হইতেও ভারত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে।[৩]

লেখ : প্রস্তর, তাম্র, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা ও লোহা

(ঘ) **প্রাচীন মুদ্রা** ঃ মুদ্রা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রাপ্ত মুদ্রার বিশ্লেষণ হইতে তৎকালীন রাজা, রাজবংশ এবং সেই যুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মুদ্রার গঠন-রীতি হইতে বৈদেশিক প্রভাবও নির্ণয় করা যায়। কুষাণ ও গুপ্ত যুগের মুদ্রায় রোমান মুদ্রা-রীতির প্রভাব দেখা যায়। প্রাচীন ভারতের এমন অনেক শাসক আছেন যাঁহাদের পরিচয় শুধু মুদ্রা হইতে পাওয়া যায়। আমরা প্রাচীন মুদ্রা হইতে ইন্দো-গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণ যুগের ইতিহাস পাই।


প্রাচীনকালের মুদ্রা

(২) **প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র** ঃ ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, বৌদ্ধ পিটক, জাতক ও জৈন সূত্র গ্রন্থগুলি হইতে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ও ধর্ম সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে অজস্র ঐতিহাসিক তথ্য আছে। সিংহলী ইতিবৃত্ত দীপবংশ ও মহাবংশে ভারতীয় বৌদ্ধদের কথা আছে। এইগুলি হইতে সযত্নে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস রচনা করা হয়।

প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র

(৩) **সমকালীন ঐতিহাসিক রচনা** ঃ প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচিত হয় নাই ঠিকই, তবে সমকালীন লেখকদের রচনায় ইতিহাসের উপাদান গঠিত হইয়াছে। কুষাণ-

(১) মহীশূরের অন্তর্গত।

(২) রাজশাহী জেলার অন্তর্গত।

(৩) পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত পারসেপলিস, নক্স-ই-রুস্তম, বেহিস্তান প্রভৃতি লেখ হইতে ভারত ইতিহাসের উপাদান পাওয়া গিয়াছে।

যুগে রচিত অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', কলহণের কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী', বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কচরিত'[১], সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ও বাক্‌পতিরাজ রচিত 'গৌড়বাহ'[২] বা 'গৌড়বধ' গ্রন্থগুলি হইতে ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস, নাটক হইতে মৌর্য ইতিহাসের উপাদান মেলে। কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যে ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে গুপ্ত ও শুঙ্গ যুগের ঐতিহাসিক তথ্য আছে।

সমকালীন ঐতিহাসিক রচনা

(৪) **বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণী**ঃ প্রাচীনকালে ভারত দর্শনে আসেন বহু বিদেশী পর্যটক। ইঁহাদের অনেকে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের ভারত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবার অনেকে এদেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালের ভারত পর্যটকদের মধ্যে ছিলেন প্রধানত গ্রীক, চৈনিক ও মুসলমানগণ। রোমান ও তীব্বতীয়রা জনশ্রুতি বা অন্যের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া বিবরণী লিখিয়াছেন। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি, কুইনটাস কার্টিয়াস রুফাস ও তিব্বতের তারানাথ এইরূপভাবে ভারত সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রীকদের রচনা হইতে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী তথ্য পাওয়া যায়। হেরোডোটাস (Herodotus), টিসিয়াস (Ctesias) ও আলেকজাণ্ডারের তিন সঙ্গী নিয়ারকাস, এ্যারিস্টোবুলাস ও ওনেসিক্রিটাস অনেক তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা', স্ট্রাবো, ডায়োডোরাস ও এ্যারিয়ানের রচনা, প্লুটার্কের 'জীবনী' ও টলেমির 'ভূগোলে' ভারতের কথা আছে। অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস'[৩] (ভারত মহাসাগরে ভ্রমণ)-এ তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক চিত্রটি পাওয়া যায়। চীনা পর্যটকদের মধ্যে তিনজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হইলেন ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্ ও ই-সিং (I-tsing)। ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়কালের, হিউয়েন সাঙ্ হর্ষবর্ধনের ও ই-সিং সপ্তম শতকের শেষদিকের বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন।[৪] মুসলমান পর্যটকদের মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখ করা যায়—আলবিরূণী, সুলেমান ও আল-মাসুদি। নবম ও দশম শতকে সুলেমান ও আল-মাসুদি ভারতে আসেন। একাদশ শতকের প্রথমদিকে আলবিরূণী তাঁহার ভারত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন তাহীকক-ই-হিন্দ (ভারত অনুসন্ধান) নামক গ্রন্থে। ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে এই গ্রন্থে অনেক তথ্য আছে।

বিদেশীদের বিবরণী

---

(১) দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয় রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যর জীবনী

(২) অষ্টম শতকে বাক্‌পতিরাজ প্রাকৃত ভাষায় গৌড়বাহ রচনা করেন। ইহা কনৌজরাজ যশোবর্মন কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কল্পিত কাহিনী।

(৩ পুরোনাম 'Periplus of the Erythraean Sea.'

(৪) ফা-হিয়েনের গ্রন্থের নাম 'ফো কুয়োকি' (Fo Kouoki)। হিউয়েন সাঙের সিউকি (SIYUKI)।

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও** :—(ক) ভারতের আয়তন কত? (খ) উত্তর-পশ্চিম ভারতের তিনটি গিরিপথের নাম কর। (গ) ভারতের মোট ভাষার সংখ্যা কত? (ঘ) ভারতের প্রধান ভাষা কয়টি? (ঙ) কাহার নামানুসারে ভারতের নাম হইয়াছে? (চ) ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষার নাম কি? (ছ) কোন্ পর্বতমালা ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে? (জ) ভারতকে 'নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর' বলা হয় কেন? (ঝ) নৃতাত্ত্বিক দিক হইতে ভারতকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? কি কি? (ঞ) আকৃতি ও ভাষার দিক হইতে ভারতীয়রা কয়ভাগে বিভক্ত? (ট) অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কে? (ঠ) হর্ষচরিত কে রচনা করেন? (ড) রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা কে? (ঢ) ইণ্ডিকার লেখক কে? (ণ) পেরিপ্লাস কি? (ত) গৌরবাহ শব্দের অর্থ কি (থ) গৌড়বাহ গ্রন্থটি কে রচনা করেন? (দ) মুদ্রারাক্ষসের রচয়িতা কে? (ধ) কালিদাস কোন্ যুগের লোক? (ন) সন্ধ্যাকর নন্দীর গ্রন্থের নাম কি? (প) অশোকের শিলালিপি কোন্ ভাষায় লিখিত? (ফ) আইহোল শিলালিপিতে কোন্ রাজার পরিচয় আছে? (ব) দেওপাড়া প্রশস্তিতে কোন্ রাজার কথা আছে? (ভ) হরিষেণ কে ছিলেন? তিনি কি জন্য বিখ্যাত? (ম) পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত এবং ভারত ইতিহাসের সহিত সম্পর্কিত দুইটি লেখের নাম কর। (য) একজন তিব্বতী ঐতিহাসিকের নাম কর। (র) প্রাচীন যুগের তিনজন মুসলমান ঐতিহাসিকের নাম কর। (ল) আল্ বিরুণীর রচিত গ্রন্থের নাম কি? তিনি কখন ভারতে আসেন? (ব) কোন্ গুপ্ত সম্রাটের রাজত্বকালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন? (শ) আলেকজাণ্ডারের তিনজন ঐতিহাসিক সঙ্গীর নাম কি? (ষ) হাতিগুম্ফা লিপিতে কোন্ রাজার পরিচয় পাওয়া যায়? (স) লেখগুলি কিসের উপর উৎকীর্ণ করা হইত?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও** :—(ক) ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ কয়টি? বিভাগগুলির পরিচয় দাও। (খ) ভারতের জনগোষ্ঠীগুলির পরিচয় দাও। (গ) ভারতে কি ধরনের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়? (ঘ) ভারতীয় সভ্যতার উপর পর্বতের প্রভাব আলোচনা কর। (ঙ) ভারতের আদিম অধিবাসী কাহারা? (চ) ভারতের ইতিহাসে সমুদ্র ও নদ-নদীর প্রভাব আলোচনা কর। (ছ) ভারতের জলবায়ু কিভাবে জীবন ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করিয়াছে? (জ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? কি কি? (ঝ) প্রাচীন ভারতের লিখিত ইতিহাস না থাকিবার কারণ কি? (ঞ) প্রাচীন মুদ্রা হইতে আমরা কি ধরনের তথ্য পাই? (ট) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কাহাকে বলে?

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর** :—(ক) ভারতবর্ষকে 'পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ' বলা হয় কেন? (খ) ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর। (গ) ভারতীয় ঐক্যের মূল সূত্রগুলি কি? (ঘ) প্রাচীন

ভারতীয় ইতিহাসের দুইটি প্রধান উপাদানের উপর একটি প্রবন্ধ রচনা কর। (ঙ) বিদেশী পর্যটকগণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় কিভাবে সাহায্য করিয়াছেন ?

৪। **টীকা লিখ :—**(ক) নেগ্রিটো জাতি (খ) প্রটো-অস্ট্রালয়েড (গ) ভারতের উপকূলভাগ (ঘ) ভারতের ভৌগোলিক সীমা (ঙ) পারসেপলিস, নক্‌স-ই-রুস্তম ও বেহিস্তান লেখ (চ) আলেকজাণ্ডারের তিন ঐতিহাসিক সঙ্গী (ছ) পেরিপ্লাস (জ) নাসিক প্রশস্তি (ঝ) হাতিগুম্ফা লিপি (ঞ) এলাহাবাদ প্রশস্তি (ট) দেওপাড়া প্রশস্তি (ঠ) মেগাস্থিনিস (ড) ফা-হিয়েন (ঢ) হিউয়েন-সাঙ্‌।

৫। **ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি দেখাও :—** (ক) সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতলভূমি (খ) মধ্যভারতের মালভূমি (গ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (ঘ) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল (ঙ) হিমালয়, সুলেমান পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালা।

৬। **শূন্যস্থান পূরণ কর :—**(ক) ভারতের উত্তরে — এবং দক্ষিণে —। উত্তর-পশ্চিমে — এবং উত্তর-পূর্বে — রহিয়াছে। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে — এবং দক্ষিণ-পূর্বে রহিয়াছে —। (খ) ভূ-বিজ্ঞানীরা ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করিয়া সমস্ত দেশকে মোট — ভাগে ভাগ করিয়াছেন। (গ) ভারতের জনগোষ্ঠীকে দৈহিক আকৃতির দিক হইতে বিচার করিয়া — ভাগে ভাগ করা যায়। আকৃতি ও ভাষার দিক হইতে বিচার করিলে ভারতে — জাতিগোষ্ঠী দেখা যায়।

৭। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও :—**(ক) অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলিপিগুলি ব্রাহ্মী / খরোষ্ঠী / পালি / সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। (খ) ভারতের দক্ষিণ ভাগ ব-দ্বীপ / উপদ্বীপের আকৃতি বিশিষ্ট। (গ) ভারতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা দুই / তিন শতাধিক। (ঘ) ভারতের দৈর্ঘ্য দুই হাজার / তিন হাজার বর্গমাইল। (ঙ) নবম / দশম / একাদশ / দ্বাদশ শতকে সুলেমান ও আল-মাসুদি ভারতে আসেন। (চ) রামায়ণ ও মহাভারতে ঐতিহাসিক তথ্য আছে / নাই। (ছ) বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম পিটক / সূত্র / বেদ। (জ) প্লিনি ও কুইনটাস কার্টিয়াস রুফাস গ্রীক / রোমান ঐতিহাসিক। স্ট্রাবো ডায়োডোরাস, এ্যারিয়ান, প্লুটার্ক, টলেমী গ্রীক / রোমান ঐতিহাসিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব
(Dawn of Indian Civilization)

পুরাতন, মধ্য ও নব্য প্রস্তর যুগ (Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of culture) ঃ

তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস গড়িয়া উঠে। ভারতের আদিম মানুষ ও তাহাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। এই উপাদান প্রধানত এইসব মানুষদের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও কারিগরী যন্ত্র। যন্ত্রের আয়তন, গঠনের তারতম্য ও যন্ত্রের জন্য ব্যবহৃত মসলার প্রকৃতি বিচার করিয়া ঐতিহাসিকগণ প্রাক-ঐতিহাসিক যুগকে মোট চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন ঃ (১) পুরাতন প্রস্তর যুগ, (২) মধ্য প্রস্তর যুগ, (৩) নব্য প্রস্তর যুগ ও (৪) তাম্র-প্রস্তর যুগ। এইখানে প্রথম তিনটি যুগ ও পরবর্তী অংশে তাম্র-প্রস্তর যুগ বা হরপ্পা সভ্যতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব ভারতের শোণ, পাঞ্জাবের শতদ্রু ও দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলে প্রাচীন প্রস্তর যুগে নির্মিত অনুন্নত ও অমসৃণ যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে (Palaeolithic age)। এই যুগের মানুষ বনজঙ্গলে দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করিত। কাঁচা মাংস ও ফলমূল খাইত। মৃৎ-শিল্প ও ধাতুর ব্যবহার তাহাদের জানা ছিল না। কৃষিকার্য, চাষ-আবাদ বা পশু-পালন কোনটাই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এই অর্ধ-সভ্য মানুষরা নেগ্রিটো জাতিভুক্ত ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। প্রাচীন প্রস্তর যুগের পরে আসে মধ্য প্রস্তর যুগ (Mesolithic age)। গুজরাট, সিন্ধু প্রদেশ, মাদ্রাজ ও পশ্চিম বাংলায় মধ্য প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই যুগে ব্যবহৃত যন্ত্র ও অস্ত্রগুলি বেশ কিছুটা উন্নত ধরনের। মসৃণ পাথরের ফলা ও নুড়ির ব্যবহার ইহারা জানিত। জীব-জন্তুকে পোষ মানাইতে শিখিয়াছিল। এই সময় মৃৎশিল্পের উদ্ভব হয়, তবে কুম্ভকারের চক্রের প্রচলন হয় নাই। ধীরে ধীরে কৃষির সূচনা হয়। ইহার পর আসিল নব্য প্রস্তর যুগ (Neolithic age)। এই যুগে জীবিকা হিসাবে কৃষিকার্য ও পশুপালনের আরও অগ্রগতি হয়। এই যুগের মানুষ যাযাবর জীবনের পাশাপাশি গৃহ নির্মাণ করিয়া বসতি স্থাপন শুরু করে। তামার নিদর্শন পাওয়া গেলেও মানুষ তখনও ধাতুর ব্যবহার তেমন আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাহারা প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র ও যন্ত্র ব্যবহার করিত। এই অস্ত্র ও যন্ত্রগুলি ছিল তীক্ষ্ম, সূক্ষ্ম ও মসৃণ। মধ্য প্রস্তর যুগের সহিত তুলনায় এইগুলি ছিল আরো উন্নত। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ গুহায় বা বাসস্থানের দেওয়ালে ছবি আঁকিয়া উহাকে শোভিত করিত এবং আগুন জ্বালাইতে শিখিয়াছিল। সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান, দাক্ষিণাত্য ও পূর্ব ভারতের বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের সভ্যতা

মধ্য প্রস্তর যুগ

নব্য প্রস্তর যুগ

তাম্র-প্রস্তর যুগ (Chalcolithic Age)

হরপ্পা সভ্যতা (Harappan civilization) ঃ নব্য প্রস্তর যুগের পর শুরু হয় তাম্র-প্রস্তর যুগ। প্রস্তরনির্মিত যন্ত্র, তৈজসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি

এই যুগে লোহ বাদে আর সমস্ত রকম ধাতুনির্মিত দ্রব্যের প্রচলন হয়। ইহার মধ্যে তাম্র ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারই বেশী। এই তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা। সিন্ধু নদের উপত্যকা ছিল এই সভ্যতার লীলাভূমি। সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদারো এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলার হরপ্পা ছিল এই সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র। রাজস্থানে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে প্রাচীন সরস্বতী নদীর অববাহিকায় কালিবঙ্গানে (Kalibangan) হরপ্পা সভ্যতার তৃতীয় প্রধান শহর পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া সৌরাষ্ট্র, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, রাজস্থান, সিন্ধুর চানহুডারো ও আহমেদাবাদের লোথালে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বলা যায় সিন্ধুপ্রদেশ, পাঞ্জাব, গুজরাট ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জুড়িয়া এই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। অনেকের মতে, এই সংস্কৃতি পশ্চিমে ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী সীমান্ত, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ এবং দক্ষিণে ক্যাম্বে উপসাগর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পূর্বদিকে হরিয়ানার রূপার ও উত্তর প্রদেশের আলমগীরপুরে এই সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হরপ্পা সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিস্তার

হরপ্পা সভ্যতার পরিচয় (Main features of the Harappan civilization) ঃ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্যার জন **মার্শালের নেতৃত্বে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দয়ারাম সাহানী** কর্তৃক এই সভ্যতা আবিষ্কারের পূর্বে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল ভারতীয় সভ্যতার সূচনা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। আর্যদের এদেশে আগমন হইতে ইহার আরম্ভ। এই ধারণা এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। হরপ্পা সভ্যতার সূচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সাধারণভাবে গৃহীত মত অনুযায়ী খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সনে এই সভ্যতার সূচনা হইয়াছিল। সুতরাং সেদিক হইতে বিচার করিলে ভারতীয় সভ্যতা পাঁচ সহস্র বৎসরের প্রাচীন এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম মিশর, ব্যাবিলন ও আসিরীয় সভ্যতাগুলির সমকালীন। আর্যদের ভারতে আগমন, ঋক্ বেদের রচনাকাল, পশ্চিম এশিয়ায় লৌহযুগের সূচনা ইত্যাদি তথ্য হইতে অনুমান করা যায় যে হরপ্পা সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সন পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীনত্ব

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত নরকঙ্কালগুলি পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের মোট চারিভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) প্রটো-অস্ট্রালয়েড, (২) আলপিনয়েড (Alpinoid), (৩) মেডিটারেনিয়ান এবং (৪) মঙ্গোলয়েড। অর্থাৎ বলা যায়, পৃথিবীর প্রধান প্রধান মানবগোষ্ঠীর লোকেরা এখানে বাস করিত। ইহা ছিল একটি আন্তর্জাতিক সভ্যতা। এই অঞ্চলে মোট কত লোক বাস করিত সঠিক জানা যায় না। পণ্ডিতদের অনুমান পঁয়ত্রিশ হাজার হইতে

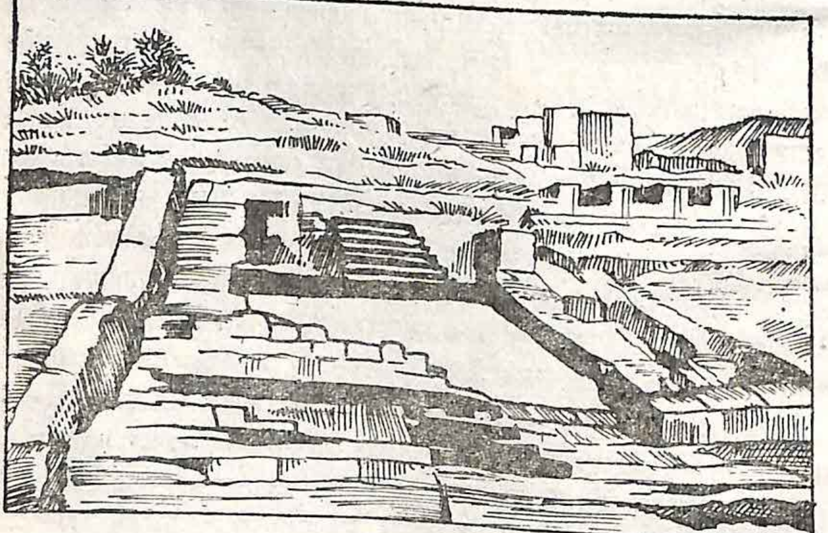
(১) ১৯২২-২৪ সনের মধ্যে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়। এই সভ্যতা আবিষ্কারের পর পণ্ডিতদের ধারণা ছিল সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে এই সভ্যতা সীমাবদ্ধ। পরবর্তীকালে রাজস্থান, গুজরাট ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ সেইজন্য এই সভ্যতার আবিষ্কৃত প্রথম নগর হরপ্পার নামানুসারে ইহার নামকরণ করিয়াছেন হরপ্পা সভ্যতা।

এক লক্ষ মানুষ সিন্ধু উপত্যকায় বসবাস করিত। হরপ্পা সভ্যতার মানুষের ভাষা কি ছিল নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের ব্যবহৃত দুই হাজার 'সীল' পাওয়া গিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বৈষয়িক কাজকর্মে এগুলি ব্যবহার করা হইত। এই সীলগুলির ভাষা বা ভাব আজও জানা যায় নাই কারণ এইগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। এই অঞ্চলের মানুষের লিখিত অন্য কোন তথ্য আমাদের হাতে নাই। প্রাচীন মিশর বা ব্যাবিলনীয় সভ্যতার লিখিত নিদর্শন আছে। এইদিক হইতে বিচার করিয়া বলা যায় হরপ্পা সভ্যতার দিগন্ত অনেকখানি সীমাবদ্ধ ছিল।

হরপ্পার অধিবাসী ও ভাষা

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে হরপ্পা সভ্যতা মূলতঃ ও প্রধানতঃ নগর সভ্যতা। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও কালিবঙ্গান শহরের পরিকল্পনা, গঠন কৌশল ও নাগরিক জীবনের যে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয়। শহরগুলিতে দুইটি অংশ পাওয়া যায়। একটি উঁচু বা দুর্গ-সংলগ্ন অঞ্চল। ইহা শাসকশ্রেণীর বাসস্থান। অপরটি নীচু বা শহর অঞ্চল—সাধারণ নাগরিকের বাসস্থান। মহেঞ্জোদারোর নগর দুর্গ-সংলগ্ন একটি বৃহৎ স্নানাগার ও হরপ্পায় একটির বৃহৎ শস্যাগার পাওয়া গিয়াছে।[১] নগর দুইটির পরিকল্পনা প্রায় একরকম। ইহাদের আয়তন প্রায় এক বর্গমাইল। নগরের রাস্তাগুলি নয় হইতে চৌত্রিশ ফুট প্রশস্ত এবং সোজা। উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তা-

নগর পরিকল্পনা



মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার

গুলি শহরগুলিকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছিল। প্রত্যেক অঞ্চলে আবার অনেক অপরিসর রাস্তা বা গলি ছিল। শহরের বাড়িগুলি সমান মাপের পোড়া ইঁটে তৈয়ারি হইত।

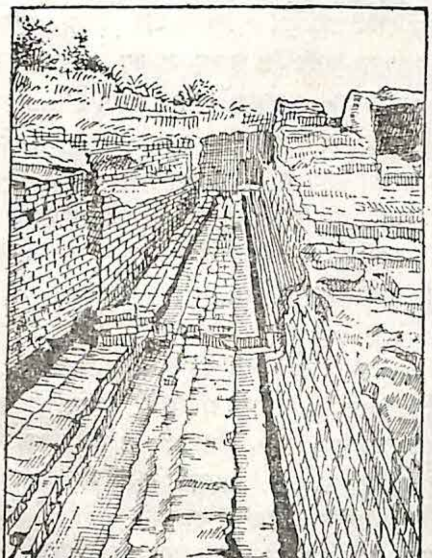
(১ মহেঞ্জোদারোর স্নানাগারের আয়তন ১৮০ × ১০৮ ফুট ; হরপ্পার শস্যাগার ১৬৯ × ১৩৫ ফুট।

এখানে যে বাড়িগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা বিভিন্ন আয়তনের দ্বিতল, ত্রিতল, মাঝারি ও একেবারে ছোট ছোট বাড়ি। ছোট বাড়িগুলির আয়তন ত্রিশ বর্গফুটের বেশী নয়। বাড়িগুলির আয়তনে তারতম্য থাকিলেও পরিকল্পনায় ছিল না। প্রতি বাড়িতে দরজা, জানালা, সিঁড়ি, স্নানঘর ও চতুষ্কোণ চত্বর ছিল। প্রতি বাড়িতে একটি এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্য বাড়ির বাহিরে আরেকটি কুয়া ছিল। জল ও আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য উন্নত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক ব্যাসামের মতে রোমান সভ্যতার পূর্বে অপর কোন প্রাচীন সভ্যতায় এমন উন্নত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা দেখা যায় না।

গৃহ পরিকল্পনা

পলিমাটি দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলে খাদ্যের অভাব ছিল না। প্রয়োজনে নদীপথে সহজে খাদ্য আমদানী করা যাইত। গম ও যব ছিল প্রধান খাদ্যশস্য। ইহা ছাড়া ভাত, দুধ, তরকারি, খেজুর, ভেড়া ও গরুর মাংস খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় গৃহপালিত পশুর মধ্যে ষাঁড়, মহিষ, মেষ, হাতি ও উটের কথা জানা যায়। অন্যান্য পশুর মধ্যে ছিল বাঘ, সিংহ, গরু, কুকুর, গাধা, বাঁদর, খরগোশ ইত্যাদি। পোশাকের জন্য তুলা ও পশম উভয়ই ব্যবহার করা হইত। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার ভালবাসিত। অলঙ্কারের মধ্যে আংটি, হার, কঙ্কণ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। অলঙ্কার নির্মাণে সোনা, রূপা ও

সামাজিক জীবন



রাস্তা ও রাস্তার নীচে পয়ঃপ্রণালী
(মহেঞ্জোদারো)



অলঙ্কার পরিহিতা নারীমূর্তি
(হরপ্পা সভ্যতা)

অন্যান্য ধাতু ব্যবহার করা হইত। গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য তামা ও ব্রোঞ্জ দ্বারা তৈয়ারি করা হইত। অস্ত্র হিসাবে কুঠার, বর্শা, ছোরা, তীর, ধনুক, গুলতি,

ঢাল ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। হরপ্পা সভ্যতার মানুষ তরবারির ব্যবহার জানিত না। খাট, চেয়ার, টুল ও আলো দ্বারা বৈঠকখানা সাজানো হইত। পাশাখেলা, শিকার ও ষাঁড়ের লড়াই ছিল আমোদ-প্রমোদ ও অবসর-বিনোদনের উপকরণ।



মানুষের প্রতিমূর্তি



হরপ্পার সীল

অর্থনৈতিক জীবন

কৃষিকাজ ছিল এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা। বেশীর ভাগ মানুষ চাষ-আবাদের কাজে নিযুক্ত থাকিত। প্রধানতঃ ধান, গম, যব ও তূলার চাষ হইত। পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, সুতা কাটা ও কাপড় বুনার কাজ প্রচলিত ছিল। সোনার অলঙ্কার নির্মাণ, সূত্রধর মিস্ত্রির কাজ, ইঁট তৈয়ারি ও গৃহ-নির্মাণে বহু লোক নিযুক্ত থাকিত। ধাতব দ্রব্যের উপর খোদাইয়ের কাজ এবং মৃৎশিল্পে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। হরপ্পার শহরগুলি দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। বেলুচিস্তান, সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্যের সহিত হরপ্পার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। মূল্যবান পাথর, শাঁখ ও ধাতু এইসব অঞ্চল হইতে হরপ্পায় আমদানী করা হইত। ভারতের বাহিরে পারস্য, আফগানিস্তান, মেসোপটেমিয়া, মিশর, ক্রীট, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার সহিত এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত। হরপ্পার সীল ও রুদ্রাক্ষ মেসোপটেমিয়ায় এবং মেসোপটেমিয়ার সীল সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে।



পশুপতি মূর্তি

হরপ্পা সভ্যতার যুগে মানুষ শক্তি বা দেবী পূজা করিত। এখানে অনেক নারী-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় এখানকার মানুষ মাতৃমূর্তি পূজা করিত। হিন্দু দেবতা শিব বা

পশুপতি ইহাদের উপাস্য দেবতা ছিলেন। ইঁহার মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পশু, বৃক্ষ, অগ্নি ও জল পূজার প্রচলন ছিল। লিঙ্গ পূজাও ছিল এই সভ্যতার অঙ্গ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ ও যোগাভ্যাসের রীতি ছিল। এই অঞ্চলে কোন মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। মৃতদেহ কবর দেওয়া বা দাহ করিবার ব্যবস্থা চালু ছিল।

ধর্মীয় জীবন

মিশর, ক্রীট, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত হরপ্পা সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। মেসোপটেমিয়া ও হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। মিশরের অনুকরণে নির্মিত টুল ও দীপাধার ঐ অঞ্চলের সহিত সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে। হরপ্পার বণিকদের একাংশ মেসোপটেমিয়ায় বসবাস করিয়া ঐ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ লইত। পারস্য ও আফগানিস্তান হইতে রূপা ও নীলকান্তমণি হরপ্পা অঞ্চলে আমদানী করা হইত। দক্ষিণ তুর্কমেনিয়ার সহিত স্থলপথে হরপ্পা সভ্যতার যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

বহির্বিশ্বের সহিত সম্পর্ক

হরপ্পা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য : হরপ্পা ও পরবর্তীকালের বৈদিক সভ্যতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগর-কেন্দ্রিক আর বৈদিক সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক। একটি নগর জীবনকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। কৃষিকাজ ছাড়া, শিল্পকাজ, নানাপ্রকার কারিগরি কর্ম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল হরপ্পার মানুষের প্রধান জীবিকা। অপরটি গ্রামীণ জীবন, কৃষি ও পশুপালনকে নির্ভর করে। বৈদিক আর্যদের অর্থনীতিতে কারিগরি কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ গুরুত্ব পাইত না। সিন্ধু উপত্যকায় লৌহের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। বৈদিক আর্যরা লৌহের ব্যবহার জানিত। এই তথ্য হইতে আমরা জানিতে পারি বৈদিক সভ্যতা হরপ্পা-পরবর্তী যুগের। ধর্মীয় জীবনে উভয় সভ্যতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। হরপ্পার মানুষ মূর্তিপূজা করিত। বৈদিক যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। হরপ্পার প্রধান উপাস্য পশুপতি শিব ও মাতৃমূর্তি। বৈদিক ধর্মে শিব বা মাতৃপূজার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বৈদিক দেবতারা হইলেন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি প্রভৃতি। সিন্ধু সভ্যতায় ষাঁড় পূজা পাইত ; বৈদিক সভ্যতায় গাভী আদরের বস্তু। সর্বোপরি, হরপ্পা সভ্যতায় ঘোড়ার নিদর্শন ছিল অতি বিরল। অপরদিকে বৈদিক যুগে ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়।



হরপ্পার নর্তকী

হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ : দুই হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ হরপ্পা সভ্যতা

ধ্বংস হইয়া যায়। পণ্ডিতগণ ইহার পতনের বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চল অনুর্বর হইয়া উঠিবার ফলে এই সভ্যতার পতন হয়। পার্শ্ববর্তী মরুভূমি অঞ্চল ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া এই অঞ্চলকে গ্রাস করে। জমিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং চাষবাস ব্যাহত হয়। কোশাম্বী প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে, হরপ্পা সভ্যতার পতনের আসল কারণ হইল বন্যা। প্রাকৃতিক কারণে জমি বসিয়া যায় বা উঁচু হইয়া উঠে। উহাতে এই অঞ্চলে ঘন ঘন বন্যা দেখা দেয়। চাষবাস ব্যাহত হইবার ফলে সভ্যতার পতন হয়। তৃতীয় একদল ঐতিহাসিকের মতে, আর্যদের আক্রমণে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যায়। হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্বে এই অঞ্চলে বিদেশী অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। শেষপর্বে প্রাপ্ত হাতিয়ার ও মৃৎপাত্র হইতে পণ্ডিতগণ এরূপ অনুমান করিয়াছেন। মহেঞ্জোদারোর শেষ পর্বে এই অঞ্চলে আতঙ্ক, ত্রাস ও রক্তপাত দেখা দিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ভীত অধিবাসীরা স্বর্ণালঙ্কার মাটিতে পুঁতিয়া রাখে। এক একস্থানে পুঞ্জীভূত বহু নরমুন্ড পাওয়া গিয়াছে। শেষপর্বে নূতন নূতন মারণাস্ত্র কুঠার, ছুরি, ছোরা ইত্যাদি এই অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়াছিল। হরপ্পার শেষপর্বের কবরস্থানগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল বিদেশীদের। বৈদিক আর্যদের ব্যবহৃত অলঙ্করণযুক্ত মৃৎপাত্র এই অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। অশ্বারোহী আর্যরা ইরান হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করে। অনুমান করা যাইতে পারে, আর্যদের সহিত এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং ইহাতে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যায়।

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও :—**(ক) প্রাগৈতিহাসিক যুগকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? (খ) প্রত্যেকটি বিভাগের নাম কর। (গ) প্রাচীন প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন কোন্ কোন্ স্থানে পাওয়া গিয়াছে? (ঘ) নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন কোন্ কোন্ স্থানে পাওয়া গিয়াছে? (ঙ) হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারক কে? (চ) কত খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কৃত হয়? (ছ) হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কোন্ কোন্ স্থানে পাওয়া গিয়াছে? (জ) মহেঞ্জোদারো কোথায় অবস্থিত? (ঝ) লোথাল স্থানটি কোন্ রাজ্যে অবস্থিত? (ঞ) কালিবঙ্গান কোথায়? (ট) কোন্ সময়ে হরপ্পা সভ্যতার সূচনা হইয়াছিল? (ঠ) ইহার অবসান কবে হইয়াছিল? (ড) ভারতের বাইরে হরপ্পার সীল কোথায় পাওয়া গিয়াছে?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :—**(ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি কি? (খ) মধ্য প্রস্তর যুগের সভ্যতায় কি ধরনের উন্নতি ঘটিয়াছিল? (গ) মধ্য প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? (ঘ) সিন্ধু-সভ্যতাকে হরপ্পা সভ্যতা বলিবার কারণ কি? (ঙ) বহির্বিশ্বের সহিত হরপ্পা সভ্যতার সম্পর্ক কিরূপ ছিল? (চ) হরপ্পা সভ্যতার যুগে নগর পরিকল্পনার ধরনটি কিরূপ ছিল?

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর :**—(ক) হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (খ) হরপ্পা সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি? (গ) হরপ্পা সভ্যতার যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় দাও। (ঘ) হরপ্পা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাও। (ঙ) হরপ্পা সভ্যতার যুগে ধর্মীয় জীবনের পরিচয় দাও। এই সভ্যতার সময়কাল নির্ণয় কর।

৪। **টীকা লিখ :**—(ক) চানহুদারো (খ) কালিবঙ্গান (গ) আলমগীরপুর (ঘ) হরপ্পার বাণিজ্য সম্পর্ক (ঙ) হরপ্পার সীল (চ) হরপ্পার শিল্প (ছ) হরপ্পার যুগে ধাতুর ব্যবহার (জ) হরপ্পার যুদ্ধাস্ত্র।

৫। **ভারতের রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দেখাও :**—(ক) মহেঞ্জোদারো (খ) হরপ্পা (গ) কালিবঙ্গান (ঘ) লোথাল (ঙ) চানহুদারো (চ) আলমগীরপুর (ছ) রুপার।

৬। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**—(ক) ঐতিহাসিকগণ প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগকে মোট — ভাগ করিয়াছেন। এগুলি হইল —। (খ) প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ — বাস করিত। মৃৎশিল্প ও ধাতুর ব্যবহার —। (গ) নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ — বসতি স্থাপন শুরু করে। উহারা — শিখিয়াছিল। (ঘ) সরস্বতী নদীর অববাহিকায় — হরপ্পার তৃতীয় প্রধান শহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। (ঙ) ভারতের বাইরে — সহিত হরপ্পায় বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত। (চ) হরপ্পা সভ্যতা ছিল — কেন্দ্রিক।

৭। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও :**—(ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ চাষ-আবাদ জানিত / জানিত না। (খ) মধ্য প্রস্তর যুগের মানুষ জীবজন্তুকে পোষ মানাইতে শিখিয়াছিল / শেখে নাই। (গ) লোথাল রাজস্থান / গুজরাটে অবস্থিত। (ঘ) হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন মিশর ব্যাবিলন ও আসিরীয় / গ্রীক, রোমান সভ্যতার সমকালীন। (ঙ) হরপ্পা ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে যোগাযোগ ছিল / ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়
বৈদিক যুগ
(The Vedic Age)

আর্যদের আদিবাসভূমি ও আদিগ্রন্থ ঋক্‌বেদ ঃ

আর্যদের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান ও ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়। এই সময় হইতে আর্যদের রচিত সাহিত্য ভারত ইতিহাসের প্রধান উপাদান। আর্যরা ভারতে যে নূতন জীবন যাপন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি গড়িয়া তোলেন তাহা ভারতীয় সভ্যতার মূল বনিয়াদ রচনা করে। এই সংস্কৃতির ধারা আজও ভারতীয় জীবনে অব্যাহত রহিয়াছে। আর্যদের আদি বাসস্থান লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নাই। একথা স্বীকার করা ভাল এই বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য কোন মত নাই। একদল পণ্ডিত মনে করেন আর্যরা এই দেশের লোক। এখান হইতে তাহারা ইউরোপে প্রবেশ করে। অপরদল ইউরোপকে আর্যদের আদি বাসভূমি বলিয়া মনে করেন। ইঁহাদের যুক্তি বেশ জোরালো। আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীতে যে সাতটি ভাষা আছে—লাটিন, জার্মান, গ্রীক, গথিক, সংস্কৃত, কেলটিক ও পারসিক—তাহার মধ্যে পাঁচটি ইউরোপের ভাষা। মনে রাখিতে হইবে আর্য কোন জাতি নয়। ইহা একটি ভাষাগোষ্ঠী। উপরি-উক্ত সাতটি ভাষার মধ্যে একটি বা একাধিক ভাষায় যাহারা কথা বলিত তাহারাই আর্য। অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে পণ্ডিতেরা মনে করেন ইউরোপই আর্যদের আদি বাসভূমি। অধিকাংশের মতে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি-বোহেমিয়া বা কাস্পিয়ান সাগর ও দক্ষিণ রাশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল আর্যদের আদি বাসস্থান। বলা যায়, পোলাণ্ড হইতে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ তৃণভূমি আর্যদের আদি বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। আনুমানিক দুই হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া পাঞ্জাব, সিন্ধু, সরস্বতী ও গঙ্গা-যমুনা অববাহিকায় বসতি গড়িয়া তোলেন। আর্যদের প্রধান গ্রন্থ বেদ। বেদের চারি অংশ—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। ঋক্‌বেদ আর্যদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার আনুমানিক রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ। অপর তিনটি বেদ পরবর্তীকালের রচনা। বেদে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা বেশ কঠিন। তবে ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

ঋক্‌বেদে সহস্রাধিক স্তোত্রে প্রকৃতি-বন্দনা করা হইয়াছে। সামবেদে ঋক্‌বেদের স্তোত্রগুলিকে শ্লোকের আকারে রচনা করিয়া যাগযজ্ঞের সময় সুর করিয়া গাওয়া হইত। আংশিক গদ্য ও পদ্যে রচিত যজুর্বেদে যাগযজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্র ও অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা আছে। অনেক পরে রচিত অথর্ববেদে চিকিৎসা, বশীকরণ, মারণ, উচাটন-বিদ্যা, সৃষ্টি-রহস্য প্রভৃতির বর্ণনা আছে। প্রত্যেকটি বেদের আবার চারিটি অংশ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা অংশে স্তোত্র ও স্তবগুলি পদ্যে লিপিবদ্ধ আছে। গদ্য ও পদ্যে লিখিত ব্রাহ্মণ অংশে যাগযজ্ঞ ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। আরণ্যক অংশে তপস্যা, ধ্যান ও উপাসনার রীতি-নীতি

বেদ ও বেদাঙ্গ

আছে। উপনিষদ্ বা বেদান্তে আছে গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তা। সৃষ্টি, ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কে আলোচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পরবর্তীকালে বেদ হইতে যে গ্রন্থগুলি রচিত হয় তাহা সূত্র নামে পরিচিত। সূত্র দুইভাগে বিভক্ত—বেদাঙ্গ ও দর্শন। বৈদিক সাহিত্য শুদ্ধভাবে পাঠ ও যাগযজ্ঞ সঠিকভাবে পালন করিবার জন্য বেদাঙ্গ-রচিত হয়।[১] ছয়জন বৈদিক ঋষি ষড়দর্শন—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা—রচনা করেন।[২]

ঋক্‌বেদের যুগে আর্যদের রাজনৈতিক জীবন (Political life of the Rig-Vedic Aryans) ঃ

ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া বসবাস করিত। ভরত, যদু, অনু, পুরু, তুর্বস প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের গোষ্ঠীপতিদের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। গোষ্ঠীপতিরা অন্য গোষ্ঠীর আক্রমণ হইতে নিজেদের গোষ্ঠীগুলিকে রক্ষা করিত। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অনার্যদের সহিত যুদ্ধ করাও ছিল তাহাদের কাজ। পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীপতিরাই রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত ভরত উপজাতির রাজা সুদাস দশটি উপজাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাজিত করেন। অনেকের ধারণা রাজা সুদাস একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগের সম্রাট, একরাট, রাজচক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধিগুলি এই সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

ঋক্‌বেদের যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক ছিল। রাজারা বংশানুক্রমিক ধারায় রাজত্ব করিতেন। ঋক্‌বেদে নির্বাচিত রাজতন্ত্রের কোন উল্লেখ নাই।

রাজার ক্ষমতা ও দায়িত্ব

উপজাতি ও তাহার সম্পত্তি রক্ষা করা ছিল রাজার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। অর্থাৎ রাজাকে অভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে তাঁহার উপজাতি ও দেশকে রক্ষা করিতে হইত। এযুগে গরু ও জমি ছিল আর্যদের প্রধান সম্পত্তি। এইগুলি লইয়া বিরোধ দেখা দিলে রাজাকে তাহার নিষ্পত্তি করিতে হইত। জনগণ স্বেচ্ছায় রাজাকে যে কর দিত তাহা লইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত।

ঋক্‌বেদের যুগে পিতৃশাসিত পরিবার বা কুল ছিল রাষ্ট্রের ভিত্তি। বৃহত্তর প্রশাসনিক এককগুলির নাম গ্রাম, বিশ ও জন। গ্রামের কর্তা ছিল গ্রামনী ও বিশের বিশপতি। জনের কর্তা গোপ হইতেন প্রায়শঃ রাজা স্বয়ং। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া বিশ গঠিত হইত। বিশ ও জনের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিক জানা যায় না।

শাসনবিভাগ

রাজকীয় কর্মচারীদের মধ্যে গ্রামনী, সেনানী এবং পুরোহিত ছিল প্রধান। গ্রামনী ছিলেন গ্রামের কর্তা, সেনানী সৈন্যবাহিনীর। পুরোহিত রাজাকে প্রয়োজনমত পরামর্শ দিতেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। কূটনৈতিক কাজে সাহায্য করিবার জন্য রাজা দূত নিযুক্ত করিতেন।

(১) বেদাঙ্গের ছয়টি ভাগ—শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প।
(২) কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ, জৈমিনি ও ব্যাস ষড় দর্শন রচনা করেন।

সৈন্যবাহিনীর তিনটি অঙ্গ ছিল—পদাতিক, রথী ও অশ্বারোহী। ঋক্‌বেদে চলমান দুর্গের উল্লেখ আছে। লৌহনির্মিত তীর, ধনুক, বল্লম ও তরবারি প্রধান যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

রাজার প্রভূত ক্ষমতা থাকিলেও তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তাঁহাকে জনগণের সম্মতি লইয়া এবং রীতি-নীতি মানিয়া রাজ্যশাসন করিতে হইত। এই প্রসঙ্গে 'সভা' ও 'সমিতি' নামক দুইটি প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভা ছিল বয়োবৃদ্ধদের প্রতিষ্ঠান আর সমিতিতে জনসাধারণ সভ্য হইতেন। বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দিলে রাজাকে সভা ও সমিতির পরামর্শ লইতে হইত। পুরোহিতসহ এই দুই গণ-প্রতিষ্ঠান রাজশক্তি নিয়ন্ত্রণ করায় বৈদিক যুগে রাজকীয় ক্ষমতার দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব হয় নাই।

সভা ও সমিতি

সামাজিক জীবন (Social life):

আর্যরা ভারতে আসিবার পর গৌরবর্ণ আর্যদের সহিত এই দেশের কৃষ্ণবর্ণ অনার্যদের পার্থক্য সূচিত হয়। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে অনার্যরা পরাজিত হইয়া ক্রমশঃ আর্যদের সমাজভুক্ত হইতে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্যদের উপনিবেশ সম্প্রসারণের ফলে সমাজে ক্রমশঃ জটিলতার সৃষ্টি হয়। সমাজকে সংগঠিত করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ক্ষমতা ও বৃত্তির ভিত্তিতে সমগ্র জাতিকে চারিভাগে ভাগ করা হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ঋক্‌বেদের পুরুষ সুক্তে চারিবর্ণের উল্লেখ আছে।[১] তপ, জপ, পূজার্চনা, আধ্যাত্মিক কার্যাদি ছিল ব্রাহ্মণের কাজ। দেশরক্ষা, শাসন, যুদ্ধ, শিকার ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের ; কৃষিকার্য, বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৈশ্যের ও উপরি উক্ত তিনবর্ণের সেবা চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের কাজ। বৈদিক যুগে এই সামাজিক বিভাগ হয় কর্ম ও গুণের ভিত্তিতে। চারি জাতির মধ্যে মেলামেশা, আহার-বিহার বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা ছিল না। তবে পরবর্তীকালে এই বর্ণভেদ ব্যবস্থা যে জাতিভেদ ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চতুর্বর্ণ

বৈদিক সমাজের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল চতুরাশ্রম। সমাজের ঊর্ধ্বতন তিন শ্রেণীর জীবনে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—মোট চারিটি পর্যায় ছিল। জীবনের প্রথম পর্যায়ে ব্রহ্মচর্য বা বাল্যকালে গুরুগৃহে থাকিয়া শাস্ত্রশিক্ষা এবং দ্বিতীয় পর্বে যৌবনে গার্হস্থ্য বা বিবাহাদি করিয়া সংসারধর্ম পালন। তৃতীয় পর্বে প্রৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ বা সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণ এবং শেষ বয়সে সন্ন্যাস বা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন। ধর্মাশ্রিত জীবনে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ধর্মসাধনা ছিল আর্যজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চতুরাশ্রম

ঋক্‌বেদের যুগে সমাজের ভিত্তি ছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। পরিবারের কর্তাকে গৃহপতি বা দম্পতি বলা হইত। এই পরিবার ছিল একান্নবর্তী এবং একই বাড়িতে বসবাস

(১) আদি পুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু লইতে বৈশ্য ও পদযুগল হইতে শূদ্রের উৎপত্তির কথা আছে।

করিত। পরিবারের লোকেদের উপর গৃহপতির অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ ছিল একচেটিয়া। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পুত্রের জন্ম কাম্য ছিল তবে কন্যাকে অবহেলা করা হইত না।

পরিবার ও সামাজিক রীতি-নীতি

এই যুগে স্ত্রীশিক্ষার সুযোগ ছিল। ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা প্রভৃতি বিদুষীরা শিক্ষার উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে মন্ত্রও রচনা করিয়াছিলেন। সমাজে বাল্য-বিবাহের প্রথা ছিল না। পতি নির্বাচনে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল। পুরুষের ক্ষেত্রে বহু-বিবাহ প্রথা চালু ছিল তবে বহুপতিত্ব একেবারেই ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। সতীদাহ প্রথা একেবারে অজানা ছিল না। আইনের দৃষ্টিতে নারীর কোন স্বাধীনতা ছিল না। তবে গৃহের অভ্যন্তরে নারীর স্থান পুরুষের তুলনায় হীন ছিল বলা যায় না। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ দেখা যায় না। মেয়েদের জন্য পর্দা প্রথা ছিল না।

বৈদিক যুগে নারী-পুরুষের পোশাকে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। নারী-পুরুষের ব্যবহৃত পোশাকের তিনটি অংশ হইল নিবি (ভিতরের পোশাক), বাস (নীচের পোশাক) ও অধিবাস (উপরের পোশাক)। বিভিন্ন রং ও প্রকারের পোশাকের জন্য তুলা, পশম ও মৃগচর্ম ব্যবহার করা হইত। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পাগড়ী ও সোনার অলঙ্কার পরিত। বৈদিক আর্যদের খাদ্যাভ্যাস সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। তরকারী, ফল, দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও মাংস খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য পাইত। দুইটি উত্তেজক পানীয় সোম ও সুরা পানের রীতি ছিল। নৃত্য-গীত, শিকার, পাশাখেলা, দৌড়, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে বৈদিক আর্যরা অবসর-বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ করিত।

পোশাক খাদ্যাভ্যাস ও আমোদ-প্রমোদ

অর্থনৈতিক জীবন (Economic life) :

ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা সকলে গ্রামে বাস করিত। পুর বা শহরের সংখ্যা ছিল নগণ্য। শহরগুলি ছিল সাধারণতঃ প্রাকার বা দুর্গ। গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থাৎ গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস গ্রামেই উৎপন্ন হইত। গ্রামবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও পশু পালন। বাস্তু ও চাষের জমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মালিকানা স্বীকৃত হইত। পশুচারণ ভূমি ছিল গ্রামবাসীদের সকলের সাধারণ সম্পত্তি। ভূমিতে জলসেচন ও লাঙ্গলের সাহায্যে চাষপ্রথা প্রচলিত ছিল। উৎপন্ন কৃষি ফসলের মধ্যে ধান ও যবই ছিল প্রধান। কৃষির পরেই ছিল পশুপালন। পালিত পশুদের মধ্যে গরুই প্রধান। কৃষিকার্যের জন্য বা বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের উৎস হিসাবে গরুকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইত। মূল্যের একক বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গরুকে ব্যবহার করা হইত। গরুর পরেই ছিল ঘোড়ার স্থান। সামরিক প্রয়োজন, যাতায়াত ও পরিবহনে ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। পশমের যোগান দিত বলিয়া মেষ আর্যদের অর্থনীতিতে গুরুত্ব পাইত।

কৃষি ও পশুপালন

বৈদিক যুগে বিভিন্ন শিল্পে বহু তাঁতী, মিস্ত্রি, কারিগর, সূত্রধর ও কুম্ভকার

নিযুক্ত থাকিত। বয়ন শিল্পে বেশ কিছু লোক জীবিকা নির্বাহ করিত। সূত্রধর চাষের জন্য লাঙ্গল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, আসবাব, যানবাহন ও রথ নির্মাণ করিত। কুম্ভকার গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার মৃৎপাত্র তৈয়ারি করিত। মিস্ত্রি বাসস্থান, স্বর্ণ-শিল্পী অলঙ্কার ও চর্ম-শিল্পী পাদুকা প্রস্তুত করিত। বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরি কর্মে সমাজের একাংশের জীবিকা নির্বাহ হইত। অনার্য দাসশ্রেণীর লোকেরা উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সহায়ক হইত।

শিল্প

এই যুগের আর্যরা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ লইত। তবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যই ছিল প্রধান। নদী ও স্থলপথে দেশের বিভিন্ন অংশের সহিত পণ্য বিনিময় চলিত। বৈদিক যুগে ব্যবহৃত 'নিষ্ক' নামক স্বর্ণমুদ্রা, 'মনা' নামক ওজন ও বিনিময় ব্যবস্থার উল্লেখ হইতে বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শুরুতে অনার্য পণিরাই ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধানত নিযুক্ত ছিল। পরে আর্যরা বাণিজ্যে যোগ দেয়। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। অনুমান করা হয়, আর্যরা সমুদ্রপথে বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিত। পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগরীয় উপকূলের সহিত আর্যদের বাণিজ্য চলিত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

বাণিজ্য ঃ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক

ধর্মীয় জীবন (Religious life) ঃ

ঋক্‌বেদ হইতে আমরা আর্যদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাই। ঋক্‌বেদের ধর্মীয় জীবন ও ধর্মচিন্তা হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মূল ভিত্তি। এই ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রকৃতি পূজা। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে দেব-দেবী কল্পনা করিয়া আর্যরা পূজা করিত। আর সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে প্রাণ আছে বলিয়া উহারা কল্পনা করিয়া লয়। আর্যদের ধর্মবিশ্বাসের আরও দুইটি প্রধান দিক আছে। প্রাচীন গ্রীকদের মত আর্য দেবতাদের মধ্যে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য দেখা যায়। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, যম, রুদ্র প্রভৃতি ঋক্‌বেদের প্রধান দেবতা। পৃথিবী, অদিতি, উষা, রাত্রি, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর উল্লেখ আছে ঠিকই তবে তাহাদের তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাই। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, একেশ্বরবাদের দিকে ঝোঁক ঋক্‌বৈদিক ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঋক্‌বেদের স্তোত্রগুলিতে বিশ্বজনীন ঐক্যবোধের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ঈশ্বর বহু নাম ধারণ করিলেও আসলে তিনি এক ও অভিন্ন।

প্রকৃতি পূজা ও সর্বপ্রাণবাদ

পুরুষ দেবতার প্রাধান্য ও একেশ্বরবাদের ধারণা

ঋক্‌বেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র হইলেন প্রধান। তিনি যুদ্ধ ও বৃষ্টির দেবতা। জরথুস্ট্র ধর্মমতে আলোর দেবতা আহুর মাজদার ন্যায় বরুণ আলোর দেবতা। আদিত্য বরুণ শুধু আলোর দেবতা নন, তিনি মহাজাগতিক শৃঙ্খলার ধারক ও অভিভাবক। বিশ্বচরাচরে পাপের শাস্তি বিধান করিয়া বিশ্ব-বিধান রক্ষা করা ছিল তাঁহার কাজ। ঋক্‌বেদের রুদ্র ঝড় ও জঙ্গলের দেবতা। সম্ভবতঃ রুদ্র ছিলেন অনার্য

দেবতা। পরবর্তীকালে রুদ্র শিবরূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দেবতা অগ্নি ছিলেন মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ। পুরোহিত প্রদত্ত যজ্ঞাহুতি তিনি স্বর্গে দেবতাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। যম মৃত্যুর দেবতা এবং সুরার দেবতা ছিলেন সোম। ঋক্‌বেদের যুগে দেবতা বিষ্ণুর বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। পরবর্তীকালে বিষ্ণু আর্যদের একজন প্রধান দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি পান। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা রূপে তিনি পূজিত হন।

যজ্ঞ ও দার্শনিক চিন্তা

বৈদিক যুগের ধর্ম বিশ্বাসের অপর দিক হইল যজ্ঞানুষ্ঠান। আর্যরা বিশ্বাস করিত যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্ট করিয়া মানুষ তাহার প্রার্থিত সবকিছুই পাইতে পারে। ইহাদের যজ্ঞ ছিল অনেকটা সামাজিক। সাধারণতঃ গোষ্ঠী-পতিরা যজ্ঞের ব্যয়ভার বহন করিতেন। পুরোহিত যজ্ঞ পরিচালনা করিতেন। যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আর্যধর্ম বিশ্বাসের অপর দিকটি হইল তত্ত্বজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব। প্রাচীন আর্যরা আরণ্যক ও উপনিষদে ঈশ্বর, সৃষ্টি, আত্মা ও পরকাল সম্পর্কে তাঁহাদের বিশ্বাস ও উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করেন। এইগুলি ভারতীয় দর্শনের প্রধান স্তম্ভ।

পরবর্তীকালের পরিবর্তন (Later developments) :

পরবর্তীকালের পরিবর্তন বলিতে বুঝায় ঋক্‌বেদের পরবর্তীকাল হইতে বুদ্ধপূর্ব যুগ পর্যন্ত আর্যসভ্যতার অগ্রগতি (খ্রীঃ. পূ. ১৫০০ হইতে ৬০০ খ্রীঃ. পূ. পর্যন্ত)। এই পর্বে রাজনীতিতে তিনটি প্রধান পরিবর্তন দেখা যায় : (১) বিভিন্ন উপজাতির মিশ্রণ ও বৃহৎ রাজ্য গঠন, (২) রাজার শক্তি বৃদ্ধি ও (৩) শাসনযন্ত্রের সম্প্রসারণ। বহু উপজাতির মিশ্রণে এই যুগে কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি বৃহৎ গোষ্ঠী ও রাজ্য সৃষ্টি হয়। রাজা অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভ করেন ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকলের উপর রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সভা' ও 'সমিতি' টিকিয়া ছিল ঠিকই তবে ইহাদের ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছিল। এই যুগের রাজারা রাজসূয়, বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সম্রাট, একরাট প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন। শাসনযন্ত্রের সম্প্রসারণের ফলে নূতন নূতন রাজ-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি হয়। নূতন কর্মচারীদের মধ্যে সংগ্রহিত্রী (কোষাধ্যক্ষ), ভাগদুখ (কর আদায়কারী), সূত (ঘোষক), ক্ষত্রী (রাজসরকার), অক্ষবাপ (জুয়ার অধ্যক্ষ), গো-বিকর্তন (শিকার সঙ্গী) প্রভৃতি প্রধান। বৃহৎ রাজ্যগঠন ও রাজশক্তির সম্প্রসারণ এই যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নাই। অথর্ববেদ অনুসারে বৃহৎ রাজতন্ত্রের পাশাপাশি এই যুগে নির্বাচিত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

রাজ-নীতি

ঋক্‌বৈদিক যুগের সহিত তুলনায় এই যুগের সমাজ অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়া-ছিল। সমাজে বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। জাত্যন্তর গ্রহণ কঠিন হয় ঠিকই তবে একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় নাই। চারিটি প্রধান বর্ণ বা জাতি ছাড়াও নূতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল।

সমাজ

পরিবর্তিত অবস্থায় শূদ্রদের দুর্দশা বাড়িয়াছিল। সমাজে বর্ণবৈষম্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্যতারও সূচনা হইয়াছিল। গৃহনির্মাণ, আহার ও পোশাকে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। সমাজে নারীর অধিকার ও ভূমিকা আরও সঙ্কুচিত হইয়াছিল। এই যুগে বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ বা বহু-পতিত্বের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

ঋক্‌বেদের পরবর্তীকালে মানুষ পূর্বের মত গ্রামেই বাস করিত তবে নগরসভ্যতার সহিত পরিচিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কৃষি ও পশুপালন ছিল প্রধান জীবিকা। চাষে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ এবং নূতন শস্য (যেমন গম) চাষের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এই যুগের অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অর্থনীতি

পরবর্তীকালের সাহিত্যে শ্রেষ্ঠিন বা ধনী বৈশ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বে নেপাল, পশ্চিমে তক্ষশীলা এবং দক্ষিণে পৈথান বা প্রতিষ্ঠান[১] পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলিত। সামুদ্রিক বাণিজ্যও অনেকখানি বাড়িয়াছিল। সমকালীন সাহিত্যে সমুদ্র-বাণিজ্যের বিবরণ আছে। শিল্পের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও শ্রম-বিভাজন বাড়িয়াছিল। কারিগর ও শিল্পীদের সহিত নূতন বৃত্তিধারী গণৎকার, চিকিৎসক, নৃত্যশিল্পী, বাদক প্রভৃতি যুক্ত হইয়াছিল। এই যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও ব্রোঞ্জের সহিত লৌহ, সীসা ও টিনের ব্যবহার যুক্ত হয়।

ঋক্‌বেদের যুগের শেষে ধর্মের ক্ষেত্রে জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সহজ, সরল প্রকৃত পূজার পরিবর্তে আর্যগণ জটিল যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে থাকে। ইহার ফলে সমাজে পুরোহিতের সংখ্যা ও মর্যাদা দুইই বাড়িয়া যায়।

ধর্ম

পরবর্তী বৈদিক যুগে নূতন নূতন দেবদেবীর প্রাধান্য দেখা দেয়। প্রজাপতি, বিষ্ণু ও রুদ্র এই যুগের প্রধান দেবতা। নূতন নূতন ধ্যানধারণা ধর্মচিন্তার অঙ্গীভূত হয়। জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রভৃতি ধারণাগুলি ক্রমশঃ বিকাশলাভ করে। এই যুগে উপনিষদের দার্শনিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি অতি উন্নতস্তরে পৌঁছিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদিক সভ্যতার বিস্তার :

আর্যরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ ধরিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রথমে তাহারা আফগানিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ঋক্‌বেদে সপ্তসিন্ধুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সপ্ত-সিন্ধু হইল পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী—শতদ্রু, বিপাশা, ঝিলাম, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা—সিন্ধু ও সরস্বতী। আর্যরা উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মধ্যদেশ ও সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ইহাদের অধিকারে আসে। আর্য-সংস্কৃতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় স্থিতিলাভ করে এবং এই অঞ্চল তাহাদের সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়। কাশী, কোশল, বিদেহ, কুরু, বৎস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য স্থাপিত হয়। পরে মালব ও মথুরায় আর্যরা বসতি গড়িয়া তোলে। আরও পরে পূর্ব ভারতের মগধ, বঙ্গদেশ ও আসামে আর্যদের অনুপ্রবেশ

(১) মহারাষ্ট্রের আরঙ্গাবাদ জেলা।

ঘটে। এই পর্বের একেবারে শেষদিকে আনুমানিক ৬০০ খ্রী. পূ. আর্যরা দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিল। 'সাতপথ ব্রাহ্মণ' হইতে জানা যায় আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরের সহিত এই যুগের আর্যদের পরিচয় ছিল।

লৌহযুগের সূচনা—ইহার গুরুত্ব :

আনুমানিক খ্রী. পূ. ১০০০ অব্দে ভারতে লৌহযুগের সূচনা হইয়াছিল। আজও তাহা শেষ হয় নাই। ভারতে লৌহযুগের সূচনার সহিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষ এবং ঐতিহাসিক যুগের শুরু হয়। বলা যায় লৌহযুগের সূচনা ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এই লৌহযুগের সূচনা হয় দুই ভাবে। উত্তর ভারতে তাম্র-প্রস্তর যুগের পর লৌহযুগের সূচনা হয়। দক্ষিণ ভারতে নব্যপ্রস্তর যুগের পরই আসে লৌহযুগ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতে কোন ব্রোঞ্জ যুগ ছিল না।

লৌহযুগ ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লইয়া আসে। প্রথমত, প্রস্তর ও তাম্র-নির্মিত কারিগরি ও কৃষি যন্ত্রপাতির পরিবর্তে লোহ-নির্মিত কারিগরি ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়। ব্রোঞ্জ বা তাম্র অপেক্ষা কম মূল্যবান ও সহজলভ্য এই ধাতুতে ধনী বা অভিজাতদের একচেটিয়া অধিকার ছিল না। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধাতুর প্রচলন হয়। ইহাতে কৃষির উৎপাদন কয়েক গুণ বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়ত, নূতন নূতন অঞ্চল পরিষ্কার করিয়া কৃষিকাজ শুরু করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ অনেক জঙ্গল ও পতিত জমি চাষের আওতায় আসে। উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কৃষিতে যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয় তাহা নগর সভ্যতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। তৃতীয়ত, বর্ধিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বর্ধিত শ্রমের চাহিদাও সৃষ্টি করে। অনেকে অনুমান করেন লৌহযুগের প্রথম দিকে ভারতে দাস প্রথার উদ্ভব হয়। চতুর্থত, লৌহযুগে সমাজে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। উন্নত লোহ-নির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে নূতন নূতন কারিগরি শিল্প গড়িয়া উঠে। ভারতীয় সমাজ পশুপালক জীবন শেষ করিয়া কৃষি-নির্ভর জীবনে প্রবেশ করে। নূতন শক্তিশালী অস্ত্র-শস্ত্র রাজশক্তির উদ্ভব ও সম্প্রসারণে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও :**—(ক) আর্যদের আদিগ্রন্থের নাম কি? (খ) বেদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? কি কি? (গ) আর্যরা কোন্ সময়ে ভারতে প্রবেশ করেন? (ঘ) সপ্তসিন্ধু অঞ্চল কোন্‌টি? (ঙ) বেদের কয়টি অংশ? কি কি? (চ) ঋক্‌বেদ কোন্ সময়ে রচিত হয়? (ছ) বেদাঙ্গ কয়টি? (জ) দর্শন কয়ভাগে বিভক্ত এবং কি কি? (ঝ) উপনিষদ কি? (ঞ) বৈদিক যুগের তিনজন বিদুষী মহিলার নাম কর।

(ট) তিনজন বৈদিক ঋষির নাম কর। (ঠ) তিনটি বৈদিক উপজাতির নাম কর। (ড) আর্যদের ভাষার নাম কি? (ঢ) আর্যরা কি ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিত? (ণ) সাতটি আর্য ভাষা কি কি? (ত) সূত্র কি? (থ) বেদাঙ্গ কি জন্য রচিত হয়? (দ) বেদের সহিত বেদাঙ্গের সম্পর্ক কি?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও** ঃ—(ক) আর্যদের আদিবাসস্থান কোথায় ছিল? (খ) বৈদিক সাহিত্য বলিতে কি বুঝ? (গ) বৈদিক যুগে রাজার দায়িত্ব ও ক্ষমতা কিরূপ ছিল? (ঘ) চতুরাশ্রম কি? (ঙ) চতুর্বর্ণের সৃষ্টি কিভাবে হয়? (চ) বৈদিক আর্যদের ধর্মবিশ্বাসের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও। (ছ) বৈদিক ঋষিদের দার্শনিক চিন্তার মূলে কি ছিল? (জ) ভারতে লৌহ যুগের সূচনা কখন হয়? ইহা কি পরিবর্তন ঘটায়? (ঝ) বৈদিক আর্যদের বাণিজ্যিক কার্যাবলীর পরিচয় দাও। (ঞ) ভারতে বৈদিক সভ্যতা কিভাবে বিস্তার লাভ করে?

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর** ঃ—(ক) বৈদিক আর্যদের ধর্মীয় জীবন কিরূপ ছিল? (খ) বৈদিক আর্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় দাও। (গ) আর্যদের রাজনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি? (ঘ) ঋক্‌বেদের পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার কি কি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছিল? (ঙ) ঋক্‌বেদের পরবর্তীকালে ধর্মীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলির পরিচয় দাও।

৪। **টীকা লিখ** ঃ—(ক) বেদাঙ্গ (খ) ষড়্‌দর্শন (গ) সংহিতা (ঘ) উপনিষদ (ঙ) ব্রাহ্মণ (চ) সভা ও সমিতি (ছ) একরাট ও রাজচক্রবর্তী (জ) রাজা সুদাস (ঝ) রাজসূয়, বাজপেয় ও অশ্বমেধ (ঞ) নিষ্ক ও মনা।

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর** ঃ—(ক) পোল্যান্ড হইতে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত—আর্যদের আদি বাসস্থান। (খ) আর্যভাষাগুলির মধ্যে—হইল ইউরোপের ভাষা। (গ) —ও—ছিল আর্যদের প্রধান সম্পত্তি। (ঘ) রাজা সুদাস—উপজাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাজিত করেন। (ঙ) ঋক্‌বেদের যুগে সতীদাহ প্রথা একেবারে—ছিল না।

৬। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও** ঃ—(ক) আর্যদের ভারতে আগমনের পর ভারতের প্রাগৈতিহাসিক / ঐতিহাসিক যুগের শুরু হয়। (খ) ভারতের গঙ্গা-যমুনা / সিন্ধু-পাঞ্জাবে আর্যরা প্রথম বসতি স্থাপন করে। (গ) আর্যদের ভাষা পালি / প্রাকৃত / সংস্কৃত। (ঘ) ঋক্‌বেদের যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের অগ্রগতি ঘটিয়াছিল / ঘটে নাই। (ঙ) ঋক্‌বেদের পরবর্তীকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে নাই / ঘটিয়াছিল। (চ) ঋক্‌বেদের পরবর্তীকালে জাতিভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পায় / হ্রাস পায়। (ছ) ঋক্‌বেদের যুগে আর্যরা গ্রামে/ নগরে বাস করিত।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রতিবাদী আন্দোলন
(Protest Movement)

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ (Social, Economic and Religious causes) :

বৈদিক যুগের শেষদিকে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ব ভারতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই প্রত্যন্ত প্রদেশে এবং প্রধানত অব্রাহ্মণদের মধ্যে খ্রী. পূ. ৬০০ অব্দে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ঠিক একই সময়ে কনফুসিয়াস চীনদেশে এবং জরথুস্ত্র পারস্য দেশে তাঁহাদের নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। বৈদিক সমাজের কাঠামোটি চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও আধিপত্য দেওয়া হয়। বৈশ্য ও শূদ্রদের সামাজিক সম্মান ছিল না। ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রশ্নে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এই যুগে ভারতীয়রা পশুপালক উপজাতি জীবন শেষ করিয়া কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে প্রবেশ করে। অনেকগুলি নগর গড়িয়া উঠে এবং বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয়। আর্যদের ধর্ম ছিল যাগ-যজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর। যজ্ঞে বহু পশু হত্যা করা হইত এবং প্রচুর অর্থব্যয় হইত। বৈশ্য ও শূদ্রদের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত হইতে যাগ-যজ্ঞের ব্যয়নির্বাহ হইত। ক্রমাগত পশুহত্যা চাষবাসের ক্ষতি করিত। সুতরাং বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে যাগ-যজ্ঞ নির্ভর, ব্যয়বহুল ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠে।

সামাজিক

ভারতে লোহ যুগের সূচনা পূর্বেই হইয়াছিল। এই যুগে লোহের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। লোহের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। উন্নত কৃষির জন্য প্রচুর গো-সম্পদের প্রয়োজন হইত। অথচ যজ্ঞের সময় গো-হত্যার ফলে চাষের ক্ষতি ছিল অনিবার্য। কৃষির উদ্বৃত্তের ফলে নূতন নূতন নগরীর পত্তন হয়। এইসব নগরীর একটি বড় অংশ ব্যবসায়ী ও শিল্পশ্রমিক। সমাজে ধনসম্পদের দিক হইতে ব্যবসায়ীরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হন। কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক—সমাজের এই তিন শ্রেণী উপজাতীয় রাজাদের অবিরাম যুদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের যাগ-যজ্ঞ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইত। ব্যবসায়ীর পক্ষে অন্যান্য উপজাতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন ছিল। তাহা ছাড়া নিরাপদ বাণিজ্যপথ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তাহাদের কাম্য ছিল। তাহারা জানিত, শুধু কেন্দ্রীভূত রাজশক্তিই এই চাহিদা পূরণ করিতে সক্ষম। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বৈশ্য ও শূদ্রদের একাংশ বেশ ধনী হইয়াছিল। অথচ বৈদিকধর্মে শিল্প ও বাণিজ্যকে তেমন গুরুত্ব বা উৎসাহ দেওয়া হয় নাই। সমাজে ধনবৈষম্য ও দারিদ্র্য দুইই

অর্থনৈতিক

বাড়িয়াছিল। অনেক স্বাধীন মানুষ ও শ্রমিকের অবস্থা ক্রীতদাসদের তুলনায় ভাল ছিল না। ফলে সমাজে অসন্তোষ, হতাশা ও ব্যর্থতা বোধের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই অর্থনৈতিক সঙ্কট এই যুগের ধর্মবিশ্বাসে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। বৈদিক যুগের শেষদিকে উপনিষদে যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করা হয়। ধ্যান ও জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। জন্মচক্র ও কর্মফলে বিশ্বাসী পরিব্রাজক ও শ্রমণ নামে পরিচিত একদল সন্ন্যাসী বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, বর্ণাশ্রম ধর্ম ও দেবদেবীকে অস্বীকার করেন। ইঁহারা অহিংসা ও সৎ আচরণের উপর জোর দেন। অদৃষ্টবাদী ও নাস্তিক আজিবিকগণ এই ধারার অগ্রগতি ঘটান। মহাবীর ও বুদ্ধ আত্মা, জন্মান্তর ও কর্মফলকে গ্রহণ করেন। ঈশ্বর ও দেবদেবী সম্পর্কে নীরব থাকেন। সামাজিক উন্নতি বা সর্ব মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য অহিংসা ও সৎ আচরণের নির্দেশ দেন।

ধর্মীয়

জৈনধর্ম ও মহাবীর (Jainism and Mahavira)ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের একটি প্রধান ধারা হইল মহাবীর প্রবর্তিত জৈনধর্ম। জৈনধর্মের প্রধান প্রচারক বর্ধমান মহাবীরের জীবন ও সাধনা ভারতীয় সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। জৈন ঐতিহ্য অনুযায়ী জৈনদের চব্বিশজন ধর্মগুরু বা তীর্থঙ্করের মধ্যে তিনি ছিলেন শেষ ব্যক্তি। মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ছাড়া আর কেহই ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। মহাবীরের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে পার্শ্বনাথ 'নির্গ্রন্থ' নামক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।[১] মহাবীর পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত ধর্মমত ও অনুশাসনগুলির সংস্কার করিয়া জৈনধর্মকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। সেই দিক হইতে বিচার করিলে মহাবীর জৈনধর্মের সংস্কারক, প্রবর্তক নন।

জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠা

বর্ধমান মহাবীর আনুমানিক খ্রী. পূ. ৫৪১ অব্দে বিহারের বৈশালীনগরে কুন্দপুরের এক ক্ষত্রিয় রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সিদ্ধার্থ জ্ঞাতৃক গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন। তাঁহার মাতা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবিদের নেতা চেতকের ভগিনী। অর্থাৎ জন্মসূত্রে মহাবীর এই যুগের শক্তিশালী বৈশালী ও মগধের রাজপরিবারগুলির সহিত যুক্ত ছিলেন। রাজপুত্রের উপযুক্ত শিক্ষা তাঁহাকে দেওয়া হয়। যশোদা নাম্নী এক মহিলাকে তিনি বিবাহ করেন এবং একটি কন্যাসন্তান লাভ করেন। জীবনের এই পর্বে তিনি পুরাপুরি ধার্মিক গৃহীর জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহীর জীবন তাঁহাকে সুখ-শান্তি দিতে পারে নাই। তিনি আধ্যাত্মিক জীবন, আত্মা, পরলোক, জন্মচক্র ও কর্মফলবাদ লইয়া চিন্তা করিতে শুরু করেন। আত্মার মুক্তি চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হন এবং ত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহ ও সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

মহাবীরের জন্ম ও প্রথম জীবন

পার্শ্বনাথ প্রতিষ্ঠিত নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ অনুসরণ করিয়া মহাবীর

(১) গ্রন্থিহীন বা আসক্তিহীন সমাজ।

বার বৎসর কাল কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনায় জীবন কাটান। প্রথমদিকে আজিবিক সম্প্রদায়ের নেতা গোশাল তাঁহার তপস্যার সঙ্গী ছিলেন। পরে তিনি ভ্রাম্যমান জীবন ও কঠোর তপস্যার দিনগুলি একাকী অতিবাহিত করেন। তপস্যার ত্রয়োদশ বৎসরে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান নির্বাণ বা কৈবল্য-জ্ঞান লাভ করিয়া জিন (বিজেতা) বা জিতেন্দ্রিয় হন। এই জিন শব্দ হইতে জৈন শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাবীর দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর লোভ, মায়া, মোহ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ সাংসারিক বন্ধনমুক্ত হন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন রাজ্যে মহাবীর তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলেই তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথমদিকে জৈনধর্ম প্রধানতঃ মগধ, কোশল, বিদেহ ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মগধরাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মৌর্য-যুগে জৈনদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার জীবনের শেষদিকে এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গরাজ খরবেলও জৈন ছিলেন। মহাবীর আনুমানিক খ্রী. পূ. ৪৬৮ অব্দে রাজগৃহের নিকট পাবা-নগরে জৈনধর্মের রীতি অনুযায়ী অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

তপস্যা ও দিব্যজ্ঞান লাভ

ধর্মপ্রচার



বর্ধমান মহাবীর

মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ তাঁহার নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য চারিটি মূল-নীতি নির্দেশ করিয়া যান। এই চারিটি নীতি হইল ঃ (১) অহিংসা, (২) সত্যবাদিতা, (৩) চুরি না করা এবং (৪) সম্পত্তির প্রতি আসক্ত না হওয়া। মহাবীর এইগুলির সহিত আরও দুইটি নীতি যুক্ত করেন—ব্রহ্মচর্য ও সর্বস্বত্যাগ, এমনকি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত। এই নীতিগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় মহাবীর তাঁহার অনুগামীদের মোহমুক্ত, সৎ জীবনযাপনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। মহাবীর হিন্দুদের ন্যায় আত্মা, কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতেন। আত্মা তার কর্মানুযায়ী জন্মচক্রের মধ্যে ঘুরিতে থাকে। শুদ্ধ সৎচিন্তা, সৎজ্ঞান ও সদাচারণের মাধ্যমে মানুষ এই জন্মচক্র ও কর্মফলের বন্ধন হইতে

মহাবীর প্রতিষ্ঠিত জৈনধর্মের মূল নীতিগুলি

মুক্ত হইয়া সিদ্ধশীল হইতে পারে বা নির্বাণ লাভ করিতে পারে। এইজন্য কঠোর তপস্যা ও অনশন দরকার। নির্বাণ লাভের পর মানুষ চিরশান্তির সন্ধান পায় এবং জন্মচক্র হইতে মুক্ত হয়। মহাবীর পৃথিবীর সমস্ত জড় ও অজড় বস্তুতে প্রাণ আছে বলিয়া মনে করিতেন। প্রাণনাশ করা মহাপাপ বলিয়া তিনি প্রচার করেন। আত্মার মুক্তির জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের উপর জোর দেন।

আত্মা, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ

মহাবীরের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুগামীরা বা জৈনরা দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া যায়। তাঁহার শিষ্য ভদ্রবাহু-র-এর নেতৃত্বে যে দল দাক্ষিণাত্যে যান তাঁহারা পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া দিগম্বর জৈন নাম ধারণ করেন। আর স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে যাঁহারা উত্তর ভারতে রহিলেন তাঁহারা শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিয়া শ্বেতাম্বর আখ্যা পান। তবে ধর্মের মূল-নীতি ও আচরণ সম্পর্কে ইঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা দেয় নাই। মহাবীরের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্মীয় অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়। প্রথমদিকে তাঁহার নির্দেশগুলি চৌদ্দটি পূর্বায় (Purvas) বিভক্ত ছিল। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় পাটলিপুত্রে এবং গুজরাটের বলভীতে আহূত সভায় মহাবীরের অনুশাসনগুলিকে বারটি 'অঙ্গে' লিপিবদ্ধ করেন। দিগম্বর সম্প্রদায়ের লোকেরা অবশ্য ইহা মানিয়া লয় নাই। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ অঙ্গ, উপাঙ্গ ও মূলসূত্রে বিভক্ত হইয়া পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর গোষ্ঠী

জৈন সাহিত্য

মহাবীর গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। প্রথমদিকে মগধ, কোশল, বিদেহ ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের মধ্যবর্তী সময়ে ইহা বিস্তার লাভ করে। পূর্বে উড়িষ্যা ও পশ্চিমে মথুরা পর্যন্ত ইহা প্রসারিত হয়। আরও পরবর্তী-কালে ভারতের দুইটি অঞ্চলে জৈনধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়। গুজরাট ও রাজস্থানে কতকাংশে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের এবং দাক্ষিণাত্যের মহীশূর ও হায়দ্রাবাদে দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর যাবত জৈনধর্ম ভারত সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইহার অবদান কম নহে। অথচ সমকালীন বৌদ্ধধর্ম এই দেশে তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ হইল জৈনধর্ম গৃহীমানুষের আসক্তিহীন, সদাচারী, অহিংস জীবনের উপর জোর দেয়। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম সংঘবদ্ধ জীবন ও সন্ন্যাসের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। জৈনধর্ম হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের অনেকখানি গ্রহণ করিয়া এই ধর্মমতের সহিত আপোষ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম তাহা করে নাই। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানে জৈন ও হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

জৈনধর্মের বিস্তার

জৈনধর্মের স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব

বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্মমত (Life and teachings of the Buddha): প্রতিবাদী আন্দোলনের অপর প্রধান ধারাটি হইল বৌদ্ধধর্ম। গৌতমবুদ্ধ এই ধর্মমত প্রচার করেন এবং তাঁহার নামানুসারে ইহা বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে[১] নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর লুম্বিনী গ্রামে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় শুদ্ধোধন কপিলাবস্তুর নির্বাচিত রাজা ছিলেন। তাঁহার মায়ের নাম মায়াদেবী। জন্মের পরেই সিদ্ধার্থ তাঁহার মাকে হারান এবং মাতৃষ্বসা গৌতমীর নিকট পালিত হন। এইজন্য তাঁহার অপর নাম গৌতম। রাজা শুদ্ধোধন ষোল বৎসর বয়সে গোপা বা যশোধারা নাম্নী এক মহিলার সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ দেন। প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করিয়াও রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনে শান্তি ছিল না। মানব-জীবনের ব্যাধি, বার্ধক্য, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনাগুলি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। তিনি দুঃখ হইতে পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে থাকেন। এমন সময় তিনি শান্ত, আনন্দিত এক ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তাঁহার পুত্র রাহুলের জন্মের পরেই ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

জন্ম ও প্রথম জীবন



বুদ্ধদেব

সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ

গৃহত্যাগ করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল সিদ্ধার্থ গুরুর নির্দেশে ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি আত্মসংযম ও জ্ঞানের সাধনা করেন। পরে তিনি কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনার মাধ্যমে কর্মবন্ধন ক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন। সাধনার শেষ পর্বে গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে একটি পিপুল গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সিদ্ধার্থ পরম জ্ঞানের সন্ধান পান। ইহার পর তিনি জ্ঞানদীপ্ত বা 'তথাগত বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। এস্থান হইতে তিনি কাশীর নিকট সারনাথে যাইয়া তাঁহার নবলব্ধ জ্ঞান প্রচার করেন। ইতিহাসে এই ঘটনা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে পরিচিত। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হন। জীবনের বাকী পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিয়া কাটান। প্রধানত বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বুদ্ধদেব

বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্মপ্রচার

(১) বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যুর সর্বজনগ্রাহ্য কোন তারিখ নাই। তবে বেশীর ভাগ পণ্ডিতের কাছে গ্রহণযোগ্য তারিখ দুইটি হইল খ্রী. পূ. ৫৬৬ ও ৪৮৬ অব্দ।

নিজ মত প্রচার করেন। আশী বৎসর বয়সে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কুশী নগরে খ্রী. পূ. ৪৮৬ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। রাজা বিম্বিসার, আনন্দ, শারিপুত্র, মৌদগল্লায়ন প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের মূল-নীতি হইল সত্য উপলব্ধি। মানুষ তাহার কর্মফল অনুসারে জন্মচক্রে আবর্তিত হয়। এই জন্মচক্র বা দুঃখ হইতে মুক্তির জন্য প্রথমে চারিটি সত্য বা আর্যসত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ঃ (১) জীবন বা অস্তিত্ব দুঃখের (২) কামনা-বাসনা দুঃখের কারণ, (৩) কামনা-বাসনার অবসান (৪) কামনা-বাসনা অবসানের জন্য একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ। চরম ভোগবিলাস বা চরম কৃচ্ছ্রসাধনা বুদ্ধের পথ নয়। চীনদেশীয় দার্শনিক কনফুসিয়াসের মত তাঁহার নির্দেশিত পথ 'মধ্যপথ'। এই পথ 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে পরিচিত। এই পথের আটটি অঙ্গ হইল—সৎবাক্য, সৎকার্য, সৎ জীবিকা, সৎ চেষ্টা, সৎ চিন্তা, সৎ চেতনা, সৎ সঙ্কল্প ও সৎদৃষ্টি। এই পথেই জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলীত হয় ও বোধ আসে। শান্তি, জ্ঞান ও শেষে সমস্ত আসক্তি হইতে মুক্ত অনন্ত শান্তি ও সুখময় নির্বাণ লাভ ঘটে। গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপায় হিসাবে যাগ-যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানকে নস্যাৎ করেন। তিনি বেদ, দেবদেবী ও জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জন্মচক্র ও দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উপায় শীল ও প্রজ্ঞা। শীল অর্থাৎ সৎ আচরণ—অহিংসা, বাসনাহীনতা, সত্যবাদিতা ও আসক্তিহীনতা—দ্বারা চিত্ত তৈয়ারী হয় এবং ধ্যানাভ্যাস বা প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়।

বুদ্ধের ধর্মমত

চারিটি সত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ

বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য ঃ

বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার মত ও বাণীগুলিকে সঙ্কলিত করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে মোট চারিটি অধিবেশন (রাজগৃহ, বৈশালী, পাটলিপুত্র ও কাশ্মীর) ডাকা হয়। পাটলিপুত্রে অশোকের অধীনে এবং কাশ্মীরে কণিষ্কের নেতৃত্বে সভা বসে। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থ হইল পিটক। ইহার তিনটি অংশ—সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম। সুত্তে ধর্মীয় আলোচনা, বিনয়ে বৌদ্ধ মঠের নিয়ম-কানুন এবং অভিধম্মে আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক আলোচনা আছে। বুদ্ধের বাণী ও মতের ব্যাখ্যা লইয়া পরে তাঁহার অনুগামীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। ইঁহারা হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায় নামে পরিচিত। হীনযানবাদীগণ বৌদ্ধমতের মূল অষ্টাঙ্গের প্রতি অবিচল থাকেন এবং বুদ্ধ মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেন। মহাযানবাদীগণ বুদ্ধের মূর্তিপূজা ও তান্ত্রিক আচার পালন করিতেন। এই অভ্যন্তরীণ বিরোধ সত্ত্বেও বুদ্ধের মৃতুর পর এই ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হয়। চীন, ইন্দোচীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ইহা বিস্তার-লাভ করে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের তুলনামূলক বিচার ঃ

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রতিবাদী আন্দোলনের দুইটি প্রধান ধারা। ইহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়। উভয় ধর্মমত বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী আন্দোলন। ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ প্রথার উপর উভয় ধর্মের বিশ্বাস ছিল না। উভয়েই রক্তক্ষয়ী যাগ-যজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে। উভয়েই জন্মান্তর ও কর্মফলবাদে বিশ্বাসী ছিল। তবে জৈনধর্মের মত বৌদ্ধধর্ম পরমাত্মায় বিশ্বাসী ছিল না। আবার অহিংসা ও সদাচারে বিশ্বাসী হইলেও বৌদ্ধধর্ম জৈনদের মত অহিংসার চরম ব্যাখ্যায় বা কৃচ্ছ্রসাধনের যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করিত না। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মধ্যে অপর প্রধান পার্থক্য হইল জৈনরা হিন্দু দেবদেবী ও আচার-অনুষ্ঠানের কতকাংশ গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্মের সহিত আপোষ করে। বৌদ্ধরা হিন্দু দেব-দেবী ও আচার-অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া একটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার পত্তন করে। এইজন্যই পরবর্তীকালে জৈনধর্ম ভারতে টিকিয়া থাকে আর বৌদ্ধধর্ম প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ঃ

জৈনধর্ম খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রতিবাদী আন্দোলনের এক প্রধান ধারা হইলেও ইহা হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও লৌকিক আচার-আচরণের সহিত আপোষ করিয়া লয়। উপনিষদের পরমাত্মা, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদকে ইহা গ্রহণ করে। এই ধর্ম গৃহী-ভক্তদের সৎ আচরণ ও পবিত্র জীবনের উপর জোর দেয়। কৃচ্ছ্রসাধনা এই ধর্মের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক। ইহা সততা, মিতব্যয়িতা ও অহিংসার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সমস্ত বিশ্বচরাচরে জৈনগণ প্রাণের অস্তিত্ব দেখেন। প্রাণী হত্যাকে জৈনগণ মহাপাপ বলিয়া মনে করেন। এই ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী ও নিরীশ্বরবাদী হইলেও পরবর্তীকালে হিন্দু দেব-দেবীদের গ্রহণ করিতে ইহার বাধে নাই। জৈন সন্ন্যাসীগণ প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেন। বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার দ্বারা ইঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। আত্মা (soul) ও বস্তুর (matter) ধারণা লইয়া জৈন দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় ইহার প্রভাব কম নয়। জৈনধর্ম অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত, সংযম, ত্যাগ ও পবিত্র জীবনের সাধনা করিয়া মানুষ কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। সে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। জৈনদের অহিংসা, ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

জৈনধর্মের প্রভাব

গৌতম বুদ্ধ উপনিষদের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নীরবতা পালন করেন। জৈনদের মত কঠোর অহিংসাব্রত ও কৃচ্ছ্রসাধনও তিনি গ্রহণ করেন নাই। জাতিভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের যাগ-যজ্ঞ ও আচার-অনুষ্ঠানের তিনি বিরোধিতা করেন। বুদ্ধ মনে করিতেন সৎ আচরণ, মৈত্রী, করুণা,

শীল ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে বা শ্রেষ্ঠ মানব হইতে পরে। এই অনিত্য পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব দুঃখময়। সৎ জীবন যাপন করিয়া মানুষ দুঃখ এড়াইতে পারে। বুদ্ধ চাহিতেন প্রতিটি মানুষ 'আত্মদীপ' হইবে। অর্থাৎ নিজের মধ্যে জ্ঞানের দীপশিখা জ্বালাইয়া নিজেকে শুদ্ধ করিবে। তিনি সন্ন্যাস জীবনের উপর বিশেষ জোর দেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল বিহারগুলির অবদান অসাধারণ। এইগুলি কালক্রমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ও সোমপুরীর নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। বুদ্ধ সৎ ও পবিত্র ভাবে জীবিকা অর্জন করিতে উপদেশ দেন। তিনি মনে করিতেন সমাজের পক্ষে হানিকর (যেমন মদের ব্যবসা) এমন কোন জীবিকা অনুসরণ করা উচিত নয়। তিনি প্রচার করেন চুরি, হত্যা ও ব্যভিচার সমাজজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাই তিনি মানুষকে এইসব অন্যায় কার্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ সমাজে নূতন ভাবধারা ও নৈতিক আদর্শ সৃষ্টি করিয়া সমাজবিপ্লব ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, পতিত-পতিতা, অস্পৃশ্য, চন্ডাল সকলেই বুদ্ধের করুণাঘন আশীর্বাদ লাভ করেন। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত লোভ ও হিংসা সমাজে নানা অমঙ্গল সৃষ্টি করে। তাই তিনি নির্লোভ মানুষ ও অহিংস সমাজ গঠনের উপর জোর দেন। অস্তিত্বহীন প্রবহমান বিশ্বে সুখ, শান্তি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা ছিল বুদ্ধের দর্শন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এই জীবনবোধ ও দর্শনের প্রভাব গভীর ও স্থায়ী হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ—**(ক) মহাবীর জৈনধর্ম কোথায় প্রচার করেন? (খ) জৈনদের দুইটি প্রধান গোষ্ঠীর নাম কি? (গ) মহাবীরের প্রচারিত ধর্মের নাম 'জৈন' হইবার কারণ কি? (ঘ) গৌতম বুদ্ধের সন্ন্যাস গ্রহণের আগের নাম কি? (ঙ) আজীবিক সম্প্রদায় কাহারা? (চ) নিগ্রন্থ সম্প্রদায় কে প্রতিষ্ঠা করেন? (ছ) আর্যসত্য কি? (জ) জৈনদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি? (ঝ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি? (ঞ) পার্শ্বনাথ কে ছিলেন? (ট) জিন শব্দের অর্থ কি? (ঠ) মহাবীরের জন্মস্থান কোথায়? (ড) বুদ্ধদেব কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (ঢ) জৈনদের দুইটি প্রধান ধর্মসম্মেলন কোথায় বসে? (ণ) বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি? (ত) চারিটি প্রধান বৌদ্ধ ধর্মসম্মেলন কোথায় বসিয়াছিল? (থ) নির্বাণ কি? (দ) বুদ্ধের কয়েকজন প্রধান শিষ্যের নাম লিখ। (ধ) জাতক কি?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—**(ক) প্রতিবাদী আন্দোলনের ফলে ধর্মচিন্তায় কি পরিবর্তন দেখা দেয়? (খ) মহাবীর কোন্ অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করেন? (গ) জৈন

ধর্মের মূল নীতিগুলি কি ? (ঘ) জৈনধর্ম ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছে ? ঙ) বৌদ্ধধর্মের মূল নীতিগুলি কি ? (চ) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাও (ছ) গৌতমবুদ্ধ কোন্ কোন্ অঞ্চলে ধর্ম-প্রচার করিয়াছিলেন ?

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর ঃ—**(ক) প্রতিবাদী আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা আলোচনা কর। (খ) মহাবীরের জীবন ও ধর্মাদর্শ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা কর। (গ) বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ। (ঘ) ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

৪। **টীকা লিখ ঃ—**(ক) দীপবংশ ও মহাবংশ (খ) মহাযানবাদ ও হীনযানবাদ (গ) দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় (ঘ) সূত্র (ঙ) পিটক।

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—**(ক) বৈদিক যুগের শেষদিকে সমাজে ধনবৈষম্য ও—দুইই বাড়িয়াছিল। (খ) রাজাদের যুদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের যাগ-যজ্ঞ দ্বারা সমাজের —ক্ষতিগ্রস্ত হইত। (গ) বৈদিক যুগের শেষদিকে যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠানকে—করা হয়। (ঘ) বর্ধমান মহাবীর বিহারের——জন্মগ্রহণ করেন। (ঙ) বুদ্ধদেবের পিতা—কপিলাবস্তুর নির্বাচিত রাজা ছিলেন। (চ) কাশীরের নিকট—বুদ্ধদেব প্রথম বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করেন। (ছ) ইতিহাসে বুদ্ধের ধর্ম-প্রচারের ঘটনা—নামে পরিচিত।

৬। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও ঃ—**(ক) খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ / অব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। (খ) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় / বৈশ্য-শূদ্রদের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত হইতে যাগ-যজ্ঞের ব্যয়নির্বাহ হইত। (গ) গোপাল / খরবেল মহাবীরের তপস্যার সঙ্গী ছিলেন। (ঘ) গয়া / কাশী / সারনাথে বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। (ঙ) গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন / ছিলেন না। (চ) নালন্দা ও বিক্রমশীলা বৌদ্ধ / জৈন শাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক ঐক্যের যুগ

(The Age of Imperialism and Political Unification)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ষোড়শ মহাজনপদ ও মগধের উত্থান

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি হইতে জানা যায় উত্তরে আফগানিস্তান হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত ভারতে মোট ষোলটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল। ইহারা ষোড়শ মহাজনপদ বা ষোলটি রাষ্ট্র নামে খ্যাত।[১] এই ষোলটি রাষ্ট্রের সবগুলিই রাজতান্ত্রিক নয়। বৃজি, মল্ল প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ছিল। ভৌগোলিক অবস্থিতির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় ষোলটি মহাজনপদের অধিকাংশই ছিল বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্য ভারতে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একচ্ছত্র আধিপত্য লাভের আশায় নিজেদের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থাকিত। বৈদিক সাহিত্যের সম্রাট, একরাট রাজচক্রবর্তীর ধারণা ইহাদের প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ষোলটি রাজ্যের মধ্যে চারিটি রাজ্য ক্রমশঃ নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ গ্রাস করিয়া ইহারা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করে। এই চারিটি রাজ্য হইল অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ। এই চারিটি রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল। শেষ পর্যন্ত মগধ তাহার অন্য তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যকে পরাস্ত করিয়া ভারতে প্রথম রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করে। মগধের নেতৃত্বে ভারতে প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চারিটি রাজবংশের অধীনে মগধের সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। ইহারা হইল হর্যঙ্ক, শৈশুনাগ, নন্দ ও মৌর্যবংশ। হর্যঙ্ক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিম্বিসার। তাঁহার কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা ছিল যাহা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যগুলির ছিল না। মগধের রাজধানী গিরিব্রজ ছিল চতুর্দিক পর্বত ও নদীবেষ্টিত অর্থাৎ সুরক্ষিত। এই রাজ্যের জমি ছিল অতিশয় উর্বর এবং প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। গঙ্গা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জনগণ নদীপথে এবং গঙ্গা শহরের মধ্যদিয়া স্থলপথে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য করিত। অর্থাৎ মগধ ছিল শিল্প-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। মগধ তার হস্তিবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারিত। তাহা ছাড়া প্রকৃত শক্তির উৎস লৌহ ও তাম্রখনিগুলির উপর ছিল মগধের প্রায়

মগধের উত্থানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ

(১) কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বৃজি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেনা, অস্মক, অবন্তী, গন্ধার ও কম্বোজ।

একচেটিয়া অধিকার। অন্য রাজ্যগুলির এই সমস্ত সুবিধা ছিল না। সর্বোপরি, আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মধ্যভাগে অবস্থিত মগধ মিশ্র সংস্কৃতির ফলে লাভবান হয়।

মগধের হর্যঙ্কবংশীয় রাজা **বিম্বিসার** (খ্রী পূ. ৫৪৫-৪৯৩) প্রথম মগধরাজ্যের বিস্তার-নীতি অনুসরণ করেন। বর্ধিষ্ণু মগধরাজ্য ক্রমশঃ তাঁহার নেতৃত্বে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়। রাজ্যজয়, বিভিন্ন রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও প্রশাসনিক সংস্কার মগধের অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করে। পূর্ব বিহারে অবস্থিত অঙ্গরাজ্য দখল করিয়া বিম্বিসার নিজ রাজ্যের আয়তন ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেন। অঙ্গের রাজধানী সমৃদ্ধ নদী-বন্দর চম্পা মগধের হস্তগত হয়। বৈশালী ও কোশল রাজ্যের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তিনি নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আরও সংহত করেন। তাঁহার কোশলমহিষী কোশলদেবী কাশীর একটি গ্রাম যৌতুক হিসাবে লইয়া আসেন। বৈশালী রাজপরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় উত্তরদিকে মগধের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিদেহ ও মদ্র রাজবংশের সহিত বিম্বিসার বৈবাহিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন। তিনি শুধু দক্ষ রাষ্ট্রনেতা নন, দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি একটি দক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া শাসন-ব্যবস্থার তদারকি করিতেন। তাঁহার রাজ্যের আয়তন ছিল ৩০০ লিগ [১]। তিনি নূতন রাজধানী রাজগৃহ নির্মাণ করেন। মহাবীর ও বুদ্ধ তাঁহার রাজত্বকালে মগধে নিজেদের ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ধর্মীয় সহনশীলতার পরিচায়ক।

বিম্বিসারের কৃতিত্ব (খ্রীঃ পূঃ ৫৪৫-৪৯৩)

বিম্বিসারের পর তাঁহার পুত্র **অজাতশত্রু** মগধের রাজা হন। তাঁহার সময়ে মগধের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরও জোরদার হয়। কোশলের সহিত মগধের বিরোধ দেখা দেয়। অজাতশত্রু কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে পরাজিত করিয়া কাশী দখল করিয়া লন। প্রসেনজিতের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। স্বর্ণখনির বিরোধ লইয়া বৃজি নামক এক গণরাজ্যের নেতৃত্বে লিচ্ছবি, শাক্য প্রভৃতি গণরাজ্যগুলি মিত্রসংঘ গঠন করিয়া মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অজাতশত্রু এই মিত্রসংঘকে পরাস্ত করিয়া গণরাজ্যগুলিকে মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের ক্ষমতাও তিনি খর্ব করিয়াছিলেন। বলা যায় সমগ্র পূর্ব ভারতে অজাতশত্রুর একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে তিনি পাটলিপুত্র নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর হর্যঙ্ক বংশের গৌরব অস্তমিত হয়। তাঁহার পুত্র উদায়ি বা উদয়ভদ্র পাটলিপুত্র নগরের নির্মাণকার্য শেষ করেন। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন নাগদশক। তিনি ৪৩০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অজাতশত্রু (খ্রীঃ পূঃ ৪৯২-৪৬২)

হর্যঙ্ক বংশের শেষ রাজা নাগদশককে হত্যা করিয়া তাঁহার অমাত্য শিশুনাগ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। শিশুনাগ ও তাঁহার পুত্র কালাশোক বা কাকবর্ণ ছিলেন এই বংশের দুইজন শক্তিশালী শাসক। মিলিতভাবে তাঁহারা খ্রীঃ পূঃ ৪৩০ হইতে

(১) এক লিগ সমান সাড়ে তিন মাইল।

৩৬৪ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শিশুনাগ অবন্তীরাজ প্রদ্যোতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। বৎস ও কোশল রাজ্যের বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করেন। এই রাজ্যগুলির উপর মগধের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুনাগের মৃত্যুর পর শিশুনাগ বংশ দুর্বল হইয়া পড়ে। তাঁহার পুত্র কালাশোক পাটলিপুত্রনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই বংশের পরবর্তী রাজাগণ দুর্বল ছিলেন। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জনৈক মহাপদ্ম নন্দ মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া নন্দবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

শিশুনাগ বংশ
শিশুনাগ ও কালাশোক

সমসাময়িক সাক্ষ্য হইতে জানা যায় মহাপদ্ম নন্দ হীনবংশজাত ছিলেন। তবে তৎকালীন রাজনীতিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী। সমগ্র উত্তর ভারত তিনি মগধের অধীনে আনয়ন করিতে সক্ষম হন। তাঁহার 'সর্বক্ষত্রান্তক' ও 'একরাট' উপাধি হইতে মনে হয় তিনি সমগ্র উত্তর ভারতের চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও মহীশূর তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। পাঞ্জাব হইতে গোদাবরী এবং মগধ হইতে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীনে স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে তিনিই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা।[১] মহাপদ্ম নন্দের পর তাঁহার আট পুত্র একে একে মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ বংশের শেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। তিনি ছিলেন গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক। গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায় ধননন্দ ছিলেন অত্যন্ত ধনশালী এবং বিশাল সামরিক বাহিনীর অধিকারী।[২] তবে নন্দবংশের রাজারা জনগণের আস্থা বা আনুগত্য কোনটাই অর্জন করিতে পারেন নাই। শূদ্র বংশীয় বলিয়া ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণরা তাঁহাদের বিরোধিতা করেন। ধননন্দের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই সুযোগে মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

নন্দবংশ ঃ খ্রীঃ পূঃ
৩৬৪-৩২৪ অব্দ ঃ
মহাপদ্ম নন্দ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (Chandragupta Maurya) ঃ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ সম্পর্কে তিন রকম মত প্রচলিত আছে। পুরাণ ও 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে তাঁহাকে নন্দরাজার মুরানাম্নী শূদ্রাণী উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রীক লেখক জাস্টিন তাঁহাকে 'সামান্য বংশজাত' বলিয়াছেন। বৌদ্ধ লেখকদের মতে মৌর্যরা ছিলেন একটি ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী।[৩] আধুনিক মত হইল চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মৌরিয় বা মৌর্য নামক ক্ষত্রিয় পরিবারের সন্তান।

চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩২৪-
৩০০ অব্দ ঃ বংশ
পরিচয়

চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সীমান্ত সংঘর্ষে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি বাল্যকালে তাঁহার মাতার সহিত মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে বাস করিতেন। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণের

(১) হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

(২) গ্রীক লেখকদের মতে ধননন্দের ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০,০০০ পদাতিক, ২০০০ রথ ও ৩০০০ হাতি ছিল।

(৩) মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চাণক্য তাঁহাকে তক্ষশিলায় লইয়া যান এবং সর্বতোভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলেন। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। গ্রীকবীর তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। চন্দ্রগুপ্ত কিন্তু ইহাতে দমিলেন না। তিনি নিজের প্রতিভা ও পরিশ্রমে একটি সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন। এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তিনি মগধের শেষ নন্দ বংশীয় রাজা ধননন্দকে পরাস্ত করিয়া মগধের অধীশ্বর হন। চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করা সহজ হইয়াছিল কারণ নন্দরাজগণ জনগণের সমর্থন বা সদিচ্ছা লাভ করিতে পারেন নাই।

চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন ও নন্দবংশের উচ্ছেদ

চন্দ্রগুপ্তের অপর কৃতিত্ব হইল উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিদের পরাস্ত করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার। গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে এই তথ্য পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষদিকে পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাসের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর সিরিয়া হইতে ভারত পর্যন্ত অঞ্চলের অধীশ্বর হন সেলুকাস নিকাটর। তিনি পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হইলে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে বাধা দেন। যুদ্ধে জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হইবার পূর্বেই উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে হেরাত, কান্দাহার, দক্ষিণ বেলুচিস্তান ও কাবুল এই চারিটি প্রদেশ ছাড়িয়া দেন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পাঁচশত হস্তী উপহার দেন। উভয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে মেগাস্থিনিসকে দূত হিসাবে পাঠান।[১]

গ্রীকদের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষ

সমকালীন সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তারে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। অশোকের যে বিশাল সাম্রাজ্যের কথা তাঁহার লেখগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি তাহার বেশীর ভাগ চন্দ্রগুপ্তের সময় বিজিত হয়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার কোন নূতন অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এমন প্রমাণ নাই। অশোক শুধু কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। প্লুটার্ক লিখিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার ছয় লক্ষ সৈন্য লইয়া 'সমগ্র ভারত বিধ্বস্ত ও পদানত করিয়াছিলেন'। রুদ্র দমনের জুনাগড় স্তম্ভলেখ হইতে জানা যায় যে পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র ও অবন্তী চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রও তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর এবং মাদ্রাজের তিনুভেলীজেলা তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। বলা যায়, উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান হইতে দক্ষিণে মাদ্রাজ এবং পশ্চিমে আরবসাগর হইতে পূর্বে মগধ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ বাংলাদেশও তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। শেষ জীবনে চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবতঃ জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবণবেলগোলায় জৈন-রীতি অনুযায়ী তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের অন্যান্য অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার

মৌর্যযুগে শাসনব্যবস্থা ঃ অত্যাচারী নন্দবংশের উচ্ছেদ ও বিদেশীদের হাত হইতে মাতৃভূমির একাংশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার চন্দ্রগুপ্তের জীবনের দুই প্রধান কীর্তি।

(১) কথিত আছে চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাস কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে ঐতিহাসিকরা এই বিষয়ে একমত নন।

তাঁহার অপর দুই প্রধান কীর্তি হইল বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য গঠন ও তাহার জন্য একটি পরিকল্পিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ও মেগাস্থিনিসের রচনা হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানিতে পারি। শাসনব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সামরিক বাহিনীর পরিচালনা, বিচার, শাসন ও আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ দায়িত্ব তাঁহাকে পালন করিতে হইত। তবে রাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রচলিত রীতি-নীতি তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইত। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান রাজার অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

রাজা সর্বেসর্বা

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় শাসনকার্যে রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ছোট উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। এই পরিষদ প্রাদেশিক শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক, বিচারক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নির্বাচন করিত। উপদেষ্টা পরিষদ ছাড়া ছিল মহামন্ত্রী, মন্ত্রিগণ বা সাধারণ মন্ত্রী। ইঁহারা রাজাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব-প্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত করা হইত। পুরোহিত, হিসাব-পরীক্ষক, পরিদর্শক, সচিব, অমাত্য প্রভৃতি কর্মচারীগণ শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেন। গুপ্তচর বিভাগ রাজাকে সর্ব বিষয়ে অবহিত রাখিত। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত।

উপদেষ্টা পরিষদ, মন্ত্রিগণ ও শাসন

মেগাস্থিনিসের বিবরণী :

পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকস মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিসকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। রাজধানী পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে মেগাস্থিনিস রাজধানীর শাসনব্যবস্থা ছাড়াও মৌর্য সাম্রাজ্যের এক বিবরণী প্রস্তুত করেন। মেগাস্থিনিসের এই অমূল্য গ্রন্থখানি (ইণ্ডিকা) সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালের গ্রীক লেখকগণ এই গ্রন্থখানি হইতে অজস্র উদ্ধৃতি দিয়াছেন। উদ্ধৃতি-গুলি একত্রিত করিয়া মেগাস্থিনিসের গ্রন্থখানিকে উদ্ধার করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে মৌর্যশাসন, সমাজ ও তৎকালীন অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

মেগাস্থিনিস মৌর্য রাজাদের রাজধানী পাটলিপুত্রকে ভারতের বৃহত্তম নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই নগরের দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে নয় মাইল এবং প্রস্থ পৌনে দুই মাইল। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ভারতে ১১৮টি শহর ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ গ্রীকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত প্রাসাদে নারী দেহরক্ষী দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন করিতেন। শাসনব্যবস্থায় তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সামরিক, বিচার, শাসন ও আইন-বিষয়ক সমস্ত বিষয়ে তিনি ছিলেন প্রধান। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে সম্রাট সারা দিন নানাকাজে ব্যস্ত থাকিতেন।

শাসনকার্যে রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ছোট উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। মেগাস্থিনিস ভারতে মোট সাতটি বর্ণ বা সামাজিক গোষ্ঠী দেখিয়াছিলেন। ইহারা হইল দার্শনিক, কৃষক, বণিক ও কারিগর, পশু পালক ও শিকারী, অমাত্য বা উপদেষ্টা, সৈনিক এবং পরিদর্শক। মেগাস্থিনিস সম্ভবতঃ ভারতীয় চতুর্বর্ণ ও বৃত্তিভিত্তিক নূতন

বর্ণগুলিকে মিশাইয়া এইরূপ বর্ণ বিভাগ করিয়াছিলেন। 'এ্যাগ্রোনময়' নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী জেলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিত। ইহারা সাধারণতঃ জমি, কর, খনি, পথঘাট ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করিত।

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্তের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল। সংখ্যার দিক হইতে কৃষকদের পরেই ছিল সৈন্যদের স্থান। ভারতীয় তীরন্দাজরা ছিল অত্যন্ত কুশলী যোদ্ধা। তীরন্দাজবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। রাজা ছিলেন দেশের সমস্ত জমির মালিক। রাজা ভূমিকর হিসাবে উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে পাটলিপুত্র নগরীর শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট ছয়টি বোর্ড ছয়টি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। এই ছয়টি বোর্ড হইল ঃ (১) শ্রমশিল্প, (২) বিদেশী নাগরিকদের তত্ত্বাবধান, (৩) জন্ম-মৃত্যুর হিসাব, (৪) ব্যবসা, ওজন ও মাপ, (৫) শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় ও (৬) বিক্রীত দ্রব্যের উপর এক-দশমাংশ কর হিসাবে আদায়। ঠিক একইভাবে পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট ছয়টি বোর্ড দেশের সৈন্যবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ছিল। সৈন্যবাহিনীর ছয়টি বিভাগ হইল ঃ (১) নৌ-বহর, (২) রসদ সরবরাহ ও যানবাহন, (৩) পদাতিক, (৪) অশ্বারোহী, (৫) রথ ও (৬) হস্তী।

পৌরশাসন ও সামরিক প্রশাসন

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে, প্রদেশগুলি জনপদ বা জেলা এবং জেলাগুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল। রাজপুত্ররা সাধারণতঃ প্রদেশগুলির শাসক হইতেন। জনপদ ও গ্রামের জন্য প্রদেস্ট্রি, মহামাত্য, স্থানিক, গোপ, গ্রামিক প্রভৃতি কর্মচারীরা ছিলেন। ইঁহারা নদীর তত্ত্বাবধান, জমির পরিমাপ, কর সংগ্রহ, খনি পরিদর্শন প্রভৃতি কাজ করিতেন। মৌর্যযুগে জমি রাজার সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। কৃষক রাজাকে ভূমিকর দিত। তাহা ছাড়া খনি, বন ও বাণিজ্য হইতে শুল্ক আদায় করা হইত।

শাসন বিভাগ

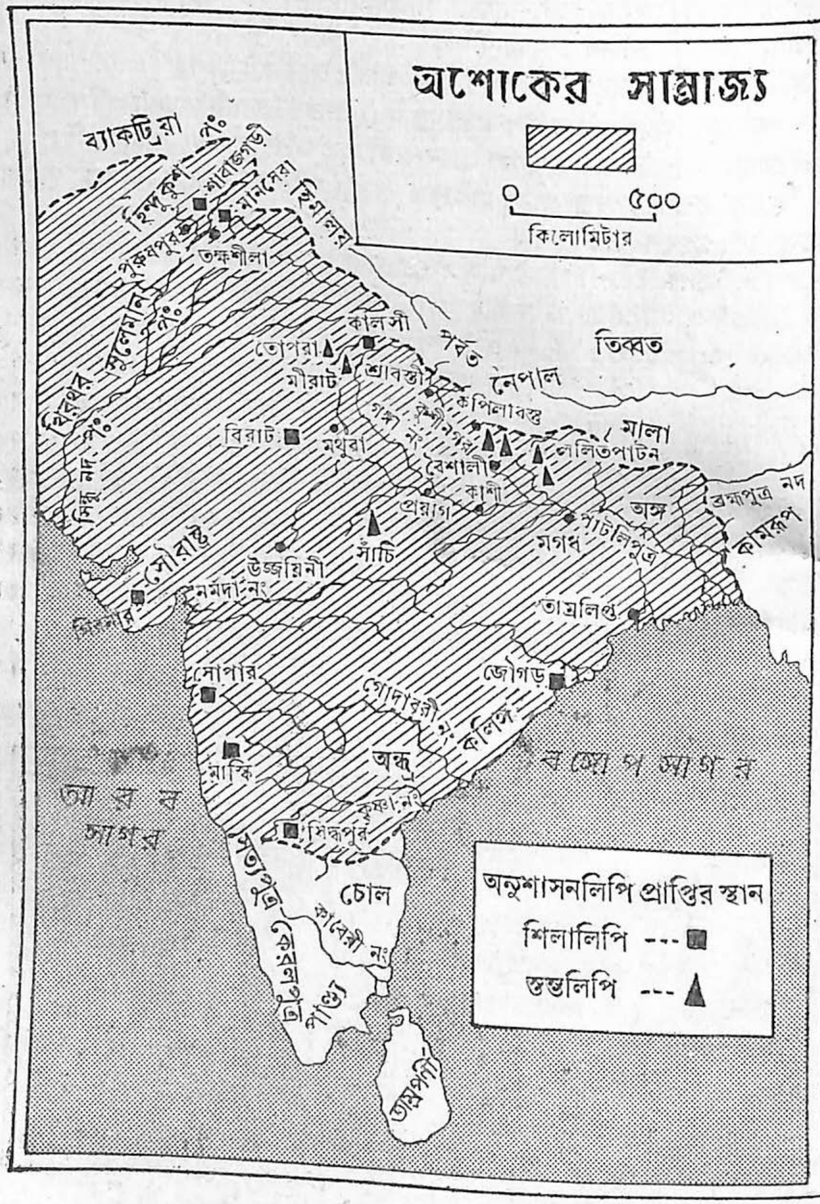
অশোক (Asoka) ঃ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে মগধের সিংহাসনে বসেন। তিনি খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৌর্যবংশের খ্যাতিমান দুই সম্রাটের মধ্যবর্তী এই মৌর্য সম্রাটের আমলে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই। বিন্দুসারের পর তাঁহার পুত্র অশোক 'প্রিয়দর্শী' উপাধি লইয়া মগধের সিংহাসনে বসেন। সিংহলী ইতিবৃত্ত অনুসারে

বিন্দুসার ঃ খ্রীঃ পূঃ ৩০০-২৭৩ অব্দ



রাজর্ষি অশোক

সিংহাসন লইয়া অশোকের সহিত তাঁহার ভ্রাতাদের বিরোধ হইয়াছিল। অশোক



ভ্রাতাদের পরাস্ত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথমদিকে একমাত্র

অশোক খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩৬ অব্দ

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল কলিঙ্গ বিজয়। বর্তমান উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের একাংশ লইয়া তৎকালীন কলিঙ্গরাজ্য গঠিত ছিল। কলিঙ্গরাজ দক্ষিণের চোল ও পাণ্ড্যরাজাদের সহায়তায় মগধের বিরোধিতা করিত।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিবার জন্য কলিঙ্গ অভিযানের প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া মগধের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য মগধ ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে অবস্থিত কলিঙ্গরাজ্যের মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়।

কলিঙ্গ জয়—২৬১ খ্রীঃ পূঃ

খ্রীঃ পূঃ ২৬১ অব্দে অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়া মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই যুদ্ধে এক লক্ষ মানুষ নিহত হয়। দেড় লক্ষ মানুষ বন্দী এবং অনেক গুণ বেশী মানুষ অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারত ইতিহাসে কলিঙ্গ যুদ্ধের গুরুত্ব অসাধারণ। এই যুদ্ধে মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি শেষ হয়। শুরু হয় শান্তি, সামাজিক প্রগতি ও ধর্ম বিজয় পর্বের।

পশ্চিমে সিরিয়ার সীমান্ত হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সুদূর দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র রাজ্যগুলি ছাড়া ভারতের আর সব অঞ্চল অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। অশোকের রাজত্বকালে এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় এক নূতন বিপ্লবের সূচনা হয়। কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহতা ও বীভৎসতা সম্রাটের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শৈব অশোক অতঃপর বুদ্ধ, বৌদ্ধ-ধর্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে তাঁহার চরিত্র, রাষ্ট্র-নীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়।

অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা

ঐতিহাসিক কোশাম্বীর মতে, দায়িত্বহীন রাজতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে অশোক জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনে রাজার নৈতিক দায়িত্বের কথা ঘোষণা করেন। এই নূতন রাষ্ট্রাদর্শই অশোকের শ্রেষ্ঠ অবদান।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া অশোক অহিংসা-নীতিকে তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। বিলাসবহুল প্রমোদযাত্রার পরিবর্তে তিনি ধর্ম বিজয়ের পথ ধরেন। যুদ্ধ ভেরী ধর্ম ভেরীতে রূপান্তরিত হয়। তিনি নিজে শুধু যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য-বিস্তার-নীতি ত্যাগ করেন তাহা নয়। তাঁহার সন্তানদের জন্যও এই আদর্শ রাখিয়া যান। অশোকের ধর্মাদর্শ বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। ইহাকে ঠিক বৌদ্ধধর্ম বলা যায় না। ইহা এক নূতন নৈতিক ধর্ম যাহার সহিত বৌদ্ধ তথা অন্যান্য অনেক ধর্মের মিল আছে। অশোক যে 'ধম্ম' প্রচার করেন তাহা শুধু বৌদ্ধধর্মের নয় সকল ভারতীয় ধর্মের মূলকথা। এদেশের চিরাচরিত নৈতিক আদর্শ (পোরানা পকিতি) তাঁহার 'ধম্মের' বাস্তব ভিত্তি। বুদ্ধের আর্য সত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা নির্বাণ লাভের কথা ইহাতে নাই। রিস ডেভিডস্ মন্তব্য করিয়াছেন যে অশোকের ধম্ম প্রকৃতপক্ষে কোন ধর্ম নয়। আসলে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের যা করা উচিত অশোকের ধম্মে তাহাই বলা হইয়াছে। ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকর অবশ্য অশোকের ধম্ম বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মনে করেন। তবে ইহা গৃহীমানুষদের জন্য পালনীয় বৌদ্ধধর্ম। অশোক তাঁহার বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসকে চিরাচরিত ভারতীয় নৈতিকবোধের সহিত যুক্ত করিয়া এক নূতন সামাজিক দর্শন সৃষ্টি করেন। ডঃ রোমিলা থাপারের মতে, অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে ভাবগত ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া ধম্ম প্রচার করেন। বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য সাধন তাঁহার ধর্মাদর্শের অন্যতম

বৌদ্ধধর্মের আদর্শ গ্রহণ—অশোকের ধম্ম

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। অশোকের ধর্মাদর্শে কয়েকটি সৎ আচরণের নির্দেশ আছে : সত্যকথা বলা, পিতা-মাতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা এবং সর্ব প্রাণীর প্রতি করুণা প্রদর্শন। অশোক প্রচার করেন যে সৎ আচরণ ও সৎ গুণাবলী প্রত্যেক মানুষের স্বর্গ লাভের পথ প্রশস্ত করে। এই গুণাবলী হইল দয়া, দান, সত্য, শুচিতা, ভদ্রতা, সৎ-কাজ ও চারিত্রিক কলুষতা হইতে মুক্তি। ঠিক একইভাবে তিনি ক্রোধ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতা হইতে মুক্ত থাকার আহ্বান জানান। সমস্ত ধর্মের প্রতি অশোক সমান সহনশীল ছিলেন। ব্রাহ্মণ, জৈন, আজিবিক ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তিনি সমানভাবে সাহায্য দিয়াছিলেন। তিনি বলপ্রয়োগে নিজ ধর্মমত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপর আরোপ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি সকল ধর্মের মধ্যে সত্য আছে বলিয়া মনে করিতেন। অন্যদের তাহা অনুধাবন করিতে উৎসাহ দিতেন। সহনশীলতা, করুণা, দয়া, সর্বজীবে প্রেম, সর্বমানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি অশোকের আদর্শ। 'সব মুনিসে মমা পজা'—সব মানুষই আমার সন্তান—অশোক ঘোষণা করেন। এই আদর্শ তিনি বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই তিনি মহামতি, 'দেবানাং পিয়' অশোক।

ধর্ম প্রচার : দেশে ও বিদেশে

অশোক তাঁহার ধর্মমত দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। অসংখ্য স্তম্ভ, শিলা ও গুহালিপিতে তিনি তাঁহার ধর্মাদর্শ খোদিত করিয়া দেন। ধর্মমহামাত্র ও রাজুক শ্রেণীর রাজকর্মচারীরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মাদর্শ ও নৈতিকতা প্রচার করিতেন। যুদ্ধভেরী ধর্মভেরীতে পরিণত হয় অর্থাৎ 'ধম্ম' প্রচারে এইগুলি ব্যবহৃত হয়। দেশের অভ্যন্তরে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ হয়। মানুষ ও প্রাণী উভয়ের স্বাচ্ছন্দ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রাজকর্মচারীরা জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ ও পান্থশালা স্থাপন করিয়া পথিক ও প্রাণীর কষ্ট দূর করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ধর্মমত-নির্বিশেষে সকলকে আশ্রয়দান এবং সাহায্য করিবার ব্যবস্থা ছিল। সুদূর দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, সিরিয়া, মিশর, সাইরিন (আফ্রিকা) এবং এপিরাসে (গ্রীসে) অশোক তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। সিংহলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজ পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা), মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক দেশগুলিতে মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

বিশ্বের ইতিহাসে অশোকের স্থান

বিশ্বের ইতিহাসে অশোক এক অসাধারণ চরিত্র। যুদ্ধজয়ের পরেই তিনি যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি ত্যাগ করিয়া ধর্ম বিজয়-নীতি গ্রহণ করেন। সমস্ত মানুষকে তিনি নিজের সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতিতে মন দেন। দ্বন্দ্ব ও হানাহানিতে মত্ত ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করেন। সমস্ত প্রাণি-জগৎকে রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি মানবিকতার যে নূতন আদর্শ প্রচার করেন তাহা বিস্ময়কর। প্রজার সর্বাত্মক কল্যাণ যদি রাষ্ট্রাদর্শের শ্রেষ্ঠ নীতি হয় তবে অশোক সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ শাসক। আর সর্বমানুষ ও প্রাণিজগতের মঙ্গলসাধন যদি শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম হয় তবে অশোক ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ মানব। পৃথিবীর আর কোন শাসকের মধ্যে এই দুই মহৎ গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। সর্বপ্রেমী, প্রজাকল্যাণকামী, সত্যদর্শী রাজর্ষি অশোক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিরাজ করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ

(Invasions of India by foreigners)

পারসিক আক্রমণ (Persian invasion) : খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ হইতে চতুর্থ শতাব্দীর অন্তর্বর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে। আক্রমণকারীরা ছিলেন পারস্য ও গ্রীসের অধিবাসী। গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে আমরা এই আক্রমণের কথা জানিতে পারি। পারস্য সম্রাট কাইরাস (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮—৫৩০ অব্দ) পৃথিবীতে বৃহত্তম সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন। তিনিই ভারত আক্রমণের সূচনা করেন। কাইরাস কাবুল উপত্যকা ও গান্ধার[১] জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। কাইরাসের পরবর্তীকালে পারস্য সম্রাট দারায়ুস (খ্রীঃ পূঃ ৫২২—৪৮৬ অব্দ) উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁহার অধিকার আরও প্রসারিত করেন। তিনি প্রথমে নৌবাহিনী পাঠাইয়া তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে সিন্ধু উপত্যকা দখল করেন। রাজপুতনার মরুভূমি পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্যসীমা প্রসারিত হয়।[২] উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই অঞ্চল হয় তাঁহার সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশ। দারায়ুসের পর জারেক্সেস ও অন্যান্য পারস্য সম্রাটগণ এই অঞ্চলের উপর নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে ম্যাসিডনের অধিপতি গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুসকে পরাজিত করিয়া পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করিলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারস্য অধিকারের অবসান হয়।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ (Alexander's Indian expedition) : ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্বে গ্রীসের উত্তরাংশে ক্ষুদ্র দেশ ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন ফিলিপ পুত্র আলেকজাণ্ডার। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দিগ্বিজয়ী বীর। আলেকজাণ্ডার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন। সুসভ্য গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অসভ্য বর্বর দেশে প্রচার করিবার বাসনাও তাঁহার ছিল। অতীতে পারস্য কর্তৃক গ্রীসদেশ আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া তিনি অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি পারস্যদেশ আক্রমণ করিয়া দখল করেন। পারস্য জয়ের পর পারস্যের ভারতীয় প্রদেশগুলি পুনর্দখল করিবার জন্য খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে অগ্রসর হন।

গ্রীসদেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে এই অঞ্চল অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে সদ্ভাব তো ছিলই না, বরং অনেকের মধ্যে বৈরীভাব

(১) বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ার।

(২) দারায়ুসের বেহিস্তান, নক্স-ই-রুস্তম ও পার্সিপোলিস লেখে এ সম্পর্কে তথ্য আছে।

ছিল। এই রাজ্যগুলির কয়েকটি ছিল রাজতান্ত্রিক, অন্যগুলি প্রজাতান্ত্রিক। রাজতান্ত্রিক রাজ্যগুলির মধ্যে অস্মক, পুষ্কলাবতী, তক্ষশীলা ও পুরু ছিল প্রসিদ্ধ। গণরাজ্যগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল গ্লৌকানিকই (Glaukanikoi), কথই (Kathaioi), শিবি, মালব, ক্ষুদ্রক, অম্বস্থ প্রভৃতি। তক্ষশীলা রাজ্য ছিল সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী স্থলে। আর ঝিলাম ও চেনাবের মধ্যে ছিল পুরু রাজ্য।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা: রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব



গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার

এই দুইটি রাজ্য ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি পুরুরাজকে পরাস্ত করিবার জন্য আলেকজাণ্ডারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সন্দেহ নাই এই অঞ্চলের রাজনৈতিক অনৈক্য এবং ভারতের সম্পদ কাহিনী গ্রীকবীরকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করিয়াছিল। তাঁহার জয়লাভও এ কারণে অনেকখানি সহজ হয়।

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) প্রথম পর্বে হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে কাবুল নদীর দুই তীর ধরিয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। (২) দ্বিতীয় পর্বে তাঁহার সম্মিলিত বাহিনী বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। (৩) শেষ পর্বে আলেকজাণ্ডার এইস্থান হইতে বেলুচিস্তানের মধ্যদিয়া পারস্যে প্রত্যাবর্তন করেন। আলেজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনীর একটি দল কাবুল নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া অগ্রসর হয়। পুষ্কলাবতীর রাজা অস্টক তাহাদের বাধা দিয়া পরাজিত হন। কাবুল নদীর উত্তর তীর ধরিয়া দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলিকে পরাস্ত করিয়া আলেকজাণ্ডার নিজে অগ্রসর হন। অস্মক জাতির রাজা তাঁহাকে বাধা দিয়া পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পর উভয় সেনাদল মিলিত হইয়া সিন্ধুনদ অতিক্রম করে। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি এবং অপর একজন স্থানীয় রাজা শশীগুপ্ত বিনাযুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নজরানা দেন।

ভারত অভিযানের সূচনা ও অগ্রগতি

এই সময়ে পাঞ্জাবে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন পুরু। তিনি ঝিলাম নদীর তীরে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেন। ইতিহাসে ইহা হিদাস্পিস বা ঝিলামের যুদ্ধ নামে পরিচিত। অসাধারণ সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও পুরু এই যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। আলেকজাণ্ডার পরাজিত পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার

হৃতরাজ্য ফিরাইয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, পনেরটি প্রজাতন্ত্রশাসিত অঞ্চল তাঁহার রাজ্যের সহিত যুক্ত করেন। ইহার পর আলেকজাণ্ডার চেনাব নদী অতিক্রম করিয়া চেনাব ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি দখল করিয়া লন। এগুলির বেশীর ভাগ ছিল গণরাজ্য। এইগুলিও পুরুকে দেওয়া হয়। দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার ফলে এই সময় আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহারা বিপাশা নদী অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে শক্তিশালী মগধ সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইতে ভয় পায়। তখন আলেকজাণ্ডার বাধ্য হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন।

ঝিলামের যুদ্ধ ও অন্যান্য অঞ্চল জয়

দেশে ফিরিবার পথে আলেকজাণ্ডার সিন্ধুদেশ জয় করেন। প্রতি পদক্ষেপে তাঁহাকে উপজাতিদের সহিত কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। শিবি, ক্ষুদ্রক ও মালবদের তিনি পরাস্ত করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে তিনি এই স্থান ত্যাগ করিয়া বেলুচিস্তানের মধ্যদিয়া পারস্যের উপকূল বরাবর ব্যাবিলনে পৌঁছান। এইখানে খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

সিন্ধুদেশ জয় ও প্রত্যাবর্তন

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল ঃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে এদেশে স্থায়ী গ্রীক রাজ্য স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়ে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য উত্তর-পশ্চিমের গ্রীকদের বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ দখল করিয়া লন। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া যায়। তবে এই কথা ঠিক আলেকজাণ্ডার উত্তর-পশ্চিমের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য স্থাপনের কাজকে সহজ করিয়া দেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ এদেশের জীবন ও সংস্কৃতির উপর স্থায়ী বা গভীর প্রভাব রাখিতে পারে নাই। ভারতীয় সাহিত্য ও ঐতিহ্যে ইহার কোন উল্লেখ নাই। তবে এই আক্রমণের ফলে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে যে সেতুবন্ধন রচিত হয় তাহাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ ভারত সম্পর্কে কৌতূহলী হন এবং অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণভাবে গ্রীকরাও ভারত সম্পর্কে আগ্রহী হইয়া উঠে। এদেশের ধর্ম ও দর্শন তাহাদের প্রভাবিত করে। অপরদিকে গ্রীক মুদ্রা, শিল্প ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এদেশের মুদ্রা, শিল্প ও জ্যোতিষচর্চায় প্রভাব রাখিয়া যায়। আলেকজাণ্ডারের আবিষ্কৃত জল ও স্থল পথে পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় সহজসাধ্য হয়। ব্যাকট্রিয়ার[১] গ্রীক উপনিবেশগুলি ভারতীয় ও গ্রীক সভ্যতার মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ঘাঁটি রূপে কাজ করিতে থাকে। পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজাদের সহিত মৌর্যরাজগণের সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলেই

(১) হিন্দুকুশ ও আমু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল।

সম্ভব হইয়াছিল। এককথায় বলা যায় গ্রীসদেশও সংস্কৃতি বা পশ্চিমী সভ্যতার সহিত ভারতের যোগাযোগ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরোক্ষ ফল।

মৌর্যযুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে উত্তর ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। হিন্দুসমাজের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য **বর্ণ** ও **আশ্রম** সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত। এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণে বিবাহ বা অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিত না। সৈনিকের পক্ষে কৃষক বা শিল্পীর বৃত্তি গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এই যুগে বহু ভারতীয় উপজাতি হিন্দুধর্মের সহিত মিশিয়া যায় এবং বহু বিদেশী (বহ্লীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি) ভারতে আসেন। বহু নূতন ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে প্রায় বিপ্লব ঘটিয়া যায়। বর্ণ ও বৃত্তি ভিত্তিক জাতিভেদের কঠোরতা অনেকখানি হ্রাস পায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বৈশ্য ও শূদ্রদের বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রীক লেখকদের বর্ণনা অনুযায়ী এই যুগে বৃত্তিভিত্তিক নূতন বর্ণ হইল কৃষক, পশুপালক ও বণিক। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস ভারতে মোট সাতটি বর্ণ বা সামাজিক গোষ্ঠী দেখিয়াছিলেন। ইহারা হইল দার্শনিক, কৃষক, বণিক ও কারিগর, পশুপালক ও শিকারী, অমাত্য বা উপদেষ্টা, সৈনিক এবং পরিদর্শক। মেগাস্থিনিস সম্ভবতঃ ভারতীয় চতুবর্ণ ও বৃত্তিভিত্তিক নূতন বর্ণগুলিকে মিশাইয়া এইরূপ বর্ণ বিভাগ করিয়াছিলেন। দার্শনিকদের মধ্যে চিকিৎসকগণও একটি নূতন গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি পায়। অভিনেতা, ভাঁড়, যাদুকর ইত্যাদি নূতন সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়।

সামাজিক জীবন

মৌর্যযুগে সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিল তবে স্বাধীনতা ছিল না। যাঁহারা ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চা করিতেন তাঁহারা অবিবাহিত থাকিতেন। অনেক রাজমহিষী শিশুপুত্রের অভিভাবিকা হিসাবে রাজ্যশাসন করিতেন। সাধারণভাবে বলা যায় নারী এই যুগে পুরুষের ধর্মসঙ্গিনী নয়। রাজা ও অভিজাতেরা বহু বিবাহ করিতেন। মহিলাদের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। মহিলারা রাজার দেহরক্ষীও হইতেন। চন্দ্রগুপ্তের মহিলা দেহরক্ষী বাহিনী ছিল। দেশে দাসপ্রথা ছিল। গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনা হইতে জানা যায় ভারতীয়রা শান্ত ও সরল জীবন যাপন করিত। চুরি ও অসত্যভাষণ ছিল বিরল ঘটনা। শুধু উৎসবের সময় মদ্যপান চলিত। দেশের প্রচলিত আইন ছিল সহজ ও সরল। অভিনয়, নৃত্য-গীত, বাদ্য, পাশা ও দাবা খেলার মাধ্যমে অবসর-বিনোদন চলিত।

নারীজাতির অবস্থা ও দাসপ্রথা

শান্ত ও সরল জীবন

জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল কৃষক। সমকালীন সাক্ষ্য হইতে বলা যায় মৌর্য যুগে কৃষকদের অবস্থা খারাপ ছিল না। সৈন্যবাহিনী ও অন্যান্য রাজকার্যে তাহাদের নিয়োগ করা হইত না। দেশের সমস্ত জমি রাজার সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত।

ভূমিকর ও উৎপন্ন শস্যের একাংশ রাজাকে কর হিসেবে দিতে হইত। দুঃসময়ে রাজা কৃষকদের বীজ ও খাদ্য সরবরাহ করিতেন। কারিগর কৃষির যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিত। এইজন্য রাজকোষ হইতে বেতন পাইত। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিলে রাজা শস্যসংগ্রহ করিয়া জনগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ কৃষি ও কৃষক

মৌর্যযুগে বাণিজ্যের উন্নতি হয়। সিরিয়া, মিশর ও গ্রীক রাজ্য-গুলির সহিত এই যুগে ভারতের বাণিজ্য চলিত। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে ভারত ও রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। মৌর্য রাজারা বিদেশ হইতে সুমিষ্ট মদ ও শুষ্ক আঙ্গুর আমদানি করিতেন। ইহার সহিত থাকিত রূপার পাত্র, সূক্ষ্ম বস্ত্র ও নানারকম প্রসাধন। এই দেশ হইতে রপ্তানী হইত বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন। তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা বিনিময়ে ব্যবহৃত হইত।

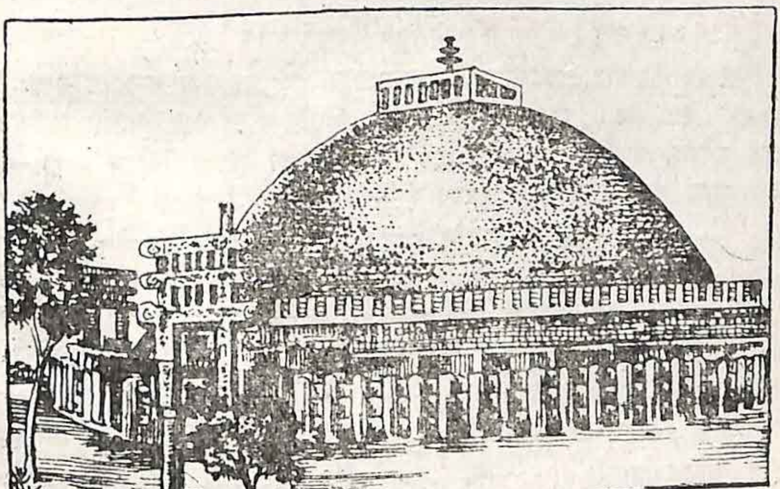
বাণিজ্য

শিল্প

মৌর্যযুগে শিল্পদ্রব্যের মধ্যে প্রধান হইল অস্ত্রশস্ত্র, কৃষির যন্ত্রপাতি এবং জাহাজ। ইহা ছাড়া জমকালো পোশাক, মসলিন ও ছাতা প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রস্তুত হইত সূতীবস্ত্র ও রেশম সূতা।

মৌর্যযুগে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের গ্রীক রাষ্ট্রগুলির সহিত মৌর্য রাজাদের দূত বিনিময় হইত। আলেকজান্দ্রিয়া ও এথেন্সে ভারতীয় বণিক, অভিযাত্রী ও দার্শনিকের সাক্ষাৎ মিলিত। মৌর্য রাজারা গ্রীকদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রশাসনের উচ্চপদে গ্রীকদের নিয়োগ করা

ইউরোপ ও এশিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক



সাঁচী স্তূপ

হইত। ভারতীয় মূর্তি ও মুদ্রা ব্যবস্থায় গ্রীক-রীতির স্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

মৌর্যযুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রকে ভারতের বৃহত্তম নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন এই সময় ভারতে ১১৮টি শহর ছিল। প্রতি শহরে ছিল পরিখা, তোরণ ও গম্বুজ। নদী অথবা সমুদ্রের নিকটবর্তী শহরগুলি ছিল কাঠের তৈয়ারী। আর দূরবর্তী বা উচ্চস্থানে অবস্থিত শহরগুলি ছিল ইঁট বা পাথরের। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদ গ্রীকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। সম্রাট অশোক ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। **সাঁচী স্তূপের** নির্মাণ কৌশল ও স্থাপত্য-রীতি উন্নত শিল্প প্রতিভার পরিচয় বহন করে। অশোক তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিবার জন্য অনেকগুলি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে **লৌরিয়াননন্দনগড়** ও **সারনাথ** স্তম্ভ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারনাথ স্তম্ভের চারিটি সিংহ মূর্তি ও ধর্মচক্র অসাধারণ শিল্প সুষমামণ্ডিত সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া অশোক অনেক গুহাগাত্রেও তাঁহার বাণী উৎকীর্ণ করেন। মৌর্য যুগে খোদিত গুহাগুলি ঐ যুগের উৎকৃষ্ট শিল্প-রীতির নিদর্শন। এ যুগের অলঙ্কারগুলিও নিপুণ শিল্প ও কারিগরি দক্ষতার পরিচয় দেয়।

মৌর্য শিল্পকলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুষাণ ও সাতবাহন সাম্রাজ্য

(The Kushana and Satvahana Empires)

কুষাণ সাম্রাজ্য (The Kushana Empire) :

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হইয়া যায়। দেশের অভ্যন্তরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বিদেশ হইতে একাধিক জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া দেশের বিভিন্ন অংশে নূতন নূতন রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে বহ্লীক, শক, পহ্লব ও কুষাণগণই ছিল প্রধান। অক্সাস নদী ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত বহ্লীক দেশের গ্রীকগণ অশোকের পরবর্তী মৌর্য সম্রাটগণের দুর্বলতার সুযোগে ভারত আক্রমণ করে। পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতে গ্রীকরাজ্য স্থাপিত হয়। এই দেশে রাজ্যস্থাপন করিয়া ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকগণ ভারতীয় হইয়া যায়। গ্রীকরাজা মিনান্দার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য বিদেশীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। গ্রীকগণ ভারতে প্রবেশ করিলে পার্থীয় বা পহ্লবগণ ব্যাকট্রিয়া অধিকার করিয়া লয়। গ্রীকদের পর শকরা ভারতে প্রবেশ করে। শকদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ার শির নদীর তীর। শকদের সহিত পহ্লবদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শকগণ সিন্ধু ও পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করিয়া একাধিক স্বাধীন রাজ্য গঠন করে। শকদের

বহ্লীক, শক ও পহ্লব আক্রমণ

পর ভারতে প্রবেশ করে পহ্লব বা পার্থীয়গণ। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল ছিল ইহাদের আদি বাসভূমি। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে পহ্লবগণ শকদের নিকট হইতে গান্ধারের একাংশ দখল করিয়া লয়। পরে উহারা উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করে। গ্রীক, শক ও পহ্লবদের পর ভারতে প্রবেশ করে কুষাণগণ। ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃস্থাপনে কুষাণগণ অনেকখানি সাফল্যলাভ করিয়াছিল।

কুষাণজাতি, আদি বাসভূমি ও ভারতে আগমন

চীনের কান-সু প্রদেশ ছিল কুষাণদের আদি বাসস্থান। ইহারা ইউ-চি উপজাতির শাখা।[১] আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৬৫ অব্দে হিয়ুংনু উপজাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়া ইউ-চি উপজাতি মধ্য এশিয়ার অক্সাস বা আমুদরিয়ার উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। এখানে ইউ-চি উপজাতি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়। ইহার একটি শাখার নাম কুই শুয়াং বা কুষাণ। কুষাণ দলপতি কুজল কদফিস পাঁচটি শাখাকে নিজ অধীনে আনিয়া রাজা উপাধি নেন। তিনি কাবুল উপত্যকা, কাশ্মীর ও গান্ধার জয় করিয়া ভারতে কুষাণ রাজত্বের সূচনা করেন। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমদিকে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে কুজল কদফিস শৈব ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হন।

কুজল কদফিস ও বিম কদফিস

তাঁহার মৃত্যুর পর কুষাণ রাজ্যের রাজা হন বিম কদফিস। প্রথম শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। পহ্লবদের পরাস্ত করিয়া তিনি কান্দাহার ও নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা দখল করিয়া লন। পাঞ্জাব হইতে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। বিম কদফিসের মুদ্রায় 'মহেশ্বর' উপাধি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় তিনি শৈব ছিলেন। তাঁহার সময়ে চীন, পশ্চিম এশিয়া ও রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেখা দেয়।

সময়কাল

কণিষ্ক ঃ বিম কদফিসের পর কণিষ্ক কুষাণদের রাজা হন। কুষাণ বংশের তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণের তারিখ লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং নূতন সম্বত প্রচলন করেন। পরবর্তীকালে শকক্ষত্রপরা কণিষ্কের সম্বত ব্যবহার করিবার ফলে ইহা শকাব্দ নামে পরিচিতি লাভ করে। অধিকাংশ পণ্ডিত ৭৮ খ্রীষ্টাব্দকে কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণের বৎসর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

কণিষ্কের রাজ্যসীমা

হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। তাঁহার শাসনকালে কুষাণ সাম্রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ব্যাকট্রিয়া, কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ প্রভৃতি স্থানসহ মধ্য এশিয়ার এক

১ ইউ-চি উপজাতি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়। শাখাগুলি হইল হিউ-সি, শুয়াং-সি, কুই-শুয়াং বা কুষাণ, হি-টুন এবং কাউ-ফু।

বিস্তৃত অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ভারতের মধ্যে কাশ্মীর, গান্ধার, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও রাজপুতনা তাঁহার শাসনাধীনে আসে। পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপরা তাঁহার অধীনস্থ ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। পূর্ব তুর্কীস্তানের আধিপত্য লইয়া চীন সম্রাট হো-তির সহিত কণিষ্কের সংঘর্ষ হয়। চীনা সেনাপতি প্যান চাওয়ের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয় সম্ভবতঃ তাহার জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় নাই। উত্তরে অক্সাস নদী হইতে মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমে সিন্ধু ও পাঞ্জাব হইতে মগধ পর্যন্ত অঞ্চলের উপর কণিষ্কের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শুধু বিজেতা বা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কণিষ্ক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ নন। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎসাহদাতা হিসাবে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কণিষ্ক নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং মহাযান মতের অনুরাগী হন। এই মতে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি পূজা স্বীকৃত। তাঁহার সময়ে এই ধর্মমত ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।



কণিষ্কের মূর্তি

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠ-
পোষকতা

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও কণিষ্ক অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কাশ্মীরে এক বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি বা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মহাযান ধর্মমতের মূল নীতিগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। কণিষ্কের অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে নানাস্থানে প্রচারিত হয়। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ও চীনদেশে তিনি ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। চীন হইতে জাপান ও কোরিয়ায় এই ধর্মমত বিস্তারলাভ করে। দেশের অভ্যন্তরেও মহাযান ধর্মমত প্রচারের জন্য কণিষ্ক চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজধানী পেশোয়ারে তিনি এক বিশাল চৈত্য বা বিহার নির্মাণ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ সংঘ স্থাপন করিয়া তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রসারে সহায়তা করেন। বিজেতা হিসাবে নয়, বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ও সংগঠক হিসাবে কণিষ্ক ইতিহাসে অমরতা লাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'দ্বিতীয় অশোক' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

শুধু বৌদ্ধধর্ম নয়, কণিষ্ক শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যও যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তিনি নিজে বহু চৈত্য, স্তূপ ও সংঘ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইগুলি

উন্নত স্থাপত্য শিল্প-রীতির নিদর্শন সন্দেহ নাই। তাঁহার সময়ে গান্ধার শিল্প রীতি, মথুরা ও অমরাবতীর (অন্ধ্রপ্রদেশ) নিজস্ব রীতি ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতিতে সহায়ক হয়। গান্ধার শিল্প-রীতি ভারতীয় ও গ্রীক রীতির এক অপূর্ব মিশ্রণ। কুঞ্চিত কেশ, পেশীবহুল দেহ ও সৌষ্ঠবপূর্ণ অবয়ব এই রীতির বৈশিষ্ট্য। গৌতম বুদ্ধের বহু মূর্তি এই রীতিতে নির্মিত হয়। মথুরা শৈলীতে মানুষের অবয়ব বা প্রতিকৃতি নির্মিত হয়। কণিষ্কের সময়ে ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। কবি, নাট্যকার ও দার্শনিক **অশ্বঘোষ,** দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক **নাগার্জুন,** পণ্ডিত **পার্শ্ব** ও **মাতৃচেত,** চিকিৎসক **চরক** ও **সুশ্রুত** তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। অশ্বঘোষের **'বুদ্ধচরিত'** ও দার্শনিক গ্রন্থ **'বজ্রসূচী'** নাগার্জুনের **প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র** ও চরকের **'সংহিতা'** কণিষ্কের শাসনকালকে ভারত ইতিহাসে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

কণিষ্কের সময়ে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি

ভারতের সহিত বহির্বিশ্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঃ

কুষাণগণ মধ্য এশিয়া হইতে শুরু করিয়া সুদূর মালব পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বৃহত্তর এশিয়ার সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিম এশিয়ার রোমান সাম্রাজ্যের সহিত স্থল ও জল পথে ভারতের বাণিজ্য চলিত। গুজরাট ও সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলির মাধ্যমে লোহিত সাগরে ভারতীয় পণ্য পাঠানো হইত। আর স্থলপথে চীন হইতে রেশম মধ্য এশিয়ার পথ ধরিয়া রোমান সাম্রাজ্যে চালান যাইত। ইহা রেশমরাস্তা নামে পরিচিতি লাভ করে। ভারত মসলিন, হীরা, হাতির দাঁতের দ্রব্য ও মসলা রপ্তানী করিত। রোমান সাম্রাজ্যে এইসব পণ্য রপ্তানীর জন্য সেইস্থান হইতে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা ভারতে আসিত। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির লেখাতে ইহার উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কুষাণগণ রোম সম্রাট হাড্রিয়ান ও এ্যাণ্টোনিনাসের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বৌদ্ধপণ্ডিত কাশ্যপ-মাতঙ্গ এই সময় চীনে যান। কাশগড়, খোটান, চীন, জাপান ও কোরিয়ায় এই সময় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। বাণিজ্য ও ধর্মের মাধ্যমে এশিয়া ও ইউরোপের এক বিস্তৃত অঞ্চলের সহিত এই যুগে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে কুষাণযুগ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। পার্শ্ব, বসুমিত্র, মাতৃচেত ও কাশ্যপ-মাতঙ্গ ধর্মের সংগঠক ও প্রচারক হিসাবে কৃতকার্য হন। সাহিত্যে **অশ্বঘোষ,** দর্শনে **নাগার্জুন,** ভেষজ বিজ্ঞানে **চরক** ও **সুশ্রুত** কালজয়ী অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। ব্যাকরণবিদ্ পতঞ্জলি ও দার্শনিক যাজ্ঞবল্ক্য কুষাণ যুগের জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বহুকাল যাবত ভারতীয় শিল্পের বিকাশে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। পেশোয়ারে কণিষ্কের চৈত্য ও সঙ্ঘারাম, দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য তোরণ ও স্তূপ, বিভিন্ন ভঙ্গির বুদ্ধমূর্তি, মথুরায় প্রাপ্ত

সংস্কৃতিতে কুষাণযুগের অবদান

কণিষ্কের মস্তকবিহীন মূর্তি কুষাণযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতির পরিচয় দেয়। এই যুগে সাহিত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞান চর্চার ভাষা ছিল সংস্কৃত। স্বাভাবিক-ভাবে এই যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল।

শেষ কুষাণ রাজাগণ

কণিষ্কের পরে কুষাণ সাম্রাজ্য দ্রুত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ইহার অবসান ঘটে। বশিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক ও বাসুদেব কণিষ্কের পর একে একে রাজা হন। বাসুদেব ছিলেন কুষাণ বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা। তাঁহার মৃত্যুর পর নাগ, মালব ও শক প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা ক্ষত্রপগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইহার ফলে কুষাণ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

সাতবাহন সাম্রাজ্য (The Satvahana empire):

সাতবাহন বংশ

মৌর্য শাসনের অবসান এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের অন্তর্বর্তী সময়ে ভারতে দুইটি রাজনৈতিক শক্তি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা হইল **কুষাণ** ও **সাতবাহনগণ**। সাতবাহনগণ ছিল অন্ধ্রদেশের লোক এবং অন্ধ্র জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত, অধিকাংশ পণ্ডিত এই রকম অভিমত পোষণ করেন। শুঙ্গ ও কণ্ব শাসনের অবসান ঘটাইয়া সাতবাহনগণ বর্তমান অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৩০ অব্দ হইতে খ্রীষ্টীয় ২২০ অব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ সাড়ে চারিশত বৎসরকাল সাতবাহনগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। উত্তর ও সুদূর দক্ষিণ ভারতের মধ্যে অবস্থিত সাতবাহন সাম্রাজ্য এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাব ও সংস্কৃতির বিনিময় মাধ্যম হিসাবে কাজ করিত।

সাতবাহন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা—সিমুক

সাতবাহন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **সিমুক**। পুরাণ অনুসারে তিনি কণ্ব ও শুঙ্গ শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। তবে সাতবাহন রাজ্যের বিস্তার করিয়া যিনি এই বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন তিনি হইলেন **প্রথম সাতকর্ণি**। তিনি ক্ষুদ্র সাতবাহন রাজ্যকে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। **প্রথম সাতকর্ণি** শক্তিশালী অম্ভিয় পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং 'দক্ষিণাপথপতি' রূপে পরিচিত হন। সমগ্র দাক্ষিণাত্য না হইলেও, উত্তর দাক্ষিণাত্য যে তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি নিজের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি

প্রথম সাতকর্ণির পরে শক আক্রমণের ধাক্কায় মহারাষ্ট্র অঞ্চলে কিছুকালের জন্য সাতবাহন শক্তি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। **গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি** সাতবাহন রাজ্যের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তিনি রাজত্ব করেন। নাসিক প্রশস্তিতে তাঁহাকে 'সাতবাহন-কুল-যশ' প্রতিষ্ঠাপক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া তিনি 'শক, যবন, পহ্লব নিসূদন' অর্থাৎ ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক ও পহ্লবদের

ধ্বংসকারী বলিয়া পরিচিত হন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, দক্ষিণ কোশল, কাথিয়াবাড়, বিদর্ভ (বেরার) তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। নাসিক প্রশস্তিতে তাঁহাকে বিন্ধ্য হইতে ত্রিবাঙ্কুর পাহাড়[১] এবং পূর্বঘাট হইতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। শুধু যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য স্থাপনে নয়, শাসনকার্যেও গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বৌদ্ধদের প্রতি উদার-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির মৃত্যুর পর সাতবাহন সাম্রাজ্যে অবনতি দেখা দেয়। তাঁহার পুত্র **বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী** গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠানে বা পৈথানে রাজত্ব করিতেন। সমগ্র কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চল ও মহারাষ্ট্র তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। তবে তাঁহার সময়ে পশ্চিম ভারতে শকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শকদের বাধাদানের ক্ষমতা সাতবাহন রাজাদের ছিল না। সাতবাহন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন **যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি**। তাঁহার পরে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্রমাগত যুদ্ধ, শকদের সম্প্রসারণ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত সাম্রাজ্য

(The Gupta Empire)

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত (খ্রীঃ পূঃ ১৮৭ অব্দ হইতে ৩২০ খ্রীঃ পর্যন্ত) পাঁচশত বৎসর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। এই পাঁচশত বৎসর সময়কালে বিদেশী বহ্লীক, শক, পহ্লব ও কুষাণগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে কুষাণগণই কিছুকালের জন্য খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে উত্তর ভারতে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ঐ একই সময়ে দক্ষিণ ভারতে সাতবাহনগণ খ্রীঃ পূঃ ২৩০ হইতে ২২০ অব্দ মধ্যে আংশিক রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে সাফল্যলাভ করিয়াছিল। ইহাদের পতনের পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়। ইহাদের মধ্যে উত্তরের নাগ, পশ্চিমের শক ও দক্ষিণের বকাটক রাজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে এই রাজনৈতিক অনৈক্যের অবসান ঘটাইয়া গুপ্তবংশ সারা ভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রাক-গুপ্ত যুগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

(১) মলয় পর্বত।

গুপ্ত রাজাদের বংশ পরিচয় ও আদিবাসস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে তাঁহাদের উত্তর ভারতের জাঠ বা বৈশ্যগোষ্ঠী উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন। অপর এক দলের মতে গুপ্ত রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে গুপ্ত রাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের আদিবাসস্থান ছিল বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত মালদা জেলা। চীনা পরিব্রাজক ই-সিং-এর রচনা হইতে পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অপর একটি মত অনুযায়ী গুপ্তরাজাদের আদি বাসস্থান হইল উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, বিশেষত এলাহাবাদ অঞ্চল। এই অঞ্চলে তাঁহাদের অধিকাংশ লেখ ও মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। গুপ্তবংশের প্রথম দুইজন শাসক হইলেন শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ গুপ্ত। ইঁহারা আনুমানিক ২৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩২০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উপাধি ছিল 'মহারাজা'। প্রথমদিককার গুপ্তরাজারা বাংলাদেশের একাংশ ও দক্ষিণ বিহার অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ঘটোৎকচ গুপ্তের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া গুপ্তবংশের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি বৈশালীর লিচ্ছবীবংশের রাজকন্যা কুমার দেবীকে বিবাহ করিয়া নিজ বংশের গৌরব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে বিহারের লৌহখনিগুলি তাঁহার অধীনে চলিয়া আসে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সমগ্র বিহার, সমতট বা পূর্ববঙ্গ বাদে সমগ্র বঙ্গদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা ও এলাহাবাদ অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে তাঁহার পরবর্তী উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া যান। অনেকের মতে তিনি ৩২০ খ্রীঃ গুপ্তাব্দ বা গুপ্তসম্বত প্রচলন করেন এবং দিল্লীর চন্দ্ররাজের লৌহ স্তম্ভটি তাঁহারই রাজত্বকালে নির্মিত হয়।

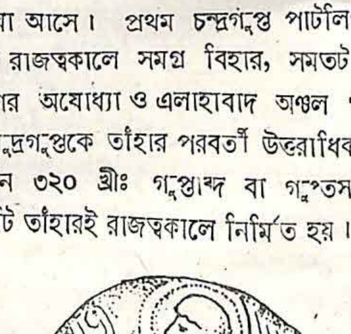
গুপ্ত রাজাদের বংশ পরিচয় ও আদি বাসস্থান

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ - ৩৫০ খ্রী.

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার মনোনীত পুত্র সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসেন। তিনিই গুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি ছিলেন লিচ্ছবী কন্যা কুমার দেবীর পুত্র এবং লিচ্ছবীদের দৌহিত্র। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল গুপ্তবংশের অধীনে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন। সারা ভারতবর্ষে নিজ অধিকার স্থাপন করিয়া সমুদ্রগুপ্ত 'একরাট' বা সার্বভৌম উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, রণনিপুণ সেনাপতি ও দিগ্বিজয়ী বীর। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে

সমুদ্রগুপ্ত ৩৫০-৩৮০ খ্রী



সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মূর্তি

দুইটি ভিন্ন নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। আর্যাবর্তে বিজিত রাজ্যগুলিকে তিনি সরাসরি তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে বিজিত রাজ্যগুলিকে পরাজিত শত্রুকে প্রত্যর্পণ করা হয়। ইহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া কর দিত। সেই যুগে রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে সুদূর দাক্ষিণাত্য সুষ্ঠুভাবে শাসন করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। সেইজন্য তিনি দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে এইরূপ উদার-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

সাম্রাজ্য বিস্তারের দুইটি ভিন্ন নীতি

সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণের 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'[১] হইতে তাঁহার রাজ্যজয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আর্যাবর্তে সমুদ্রগুপ্ত 'সর্বরাজছেত্তার' ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের রাজগণ রুদ্রদেব, নাগদত্ত, মতিল, অচ্যুত, গণপতি, নাগসেন, চন্দ্রবর্মন, নন্দী ও বলবর্মন তাঁহার নিকট পরাজিত হন। এই রাজারা সকলেই ছিলেন বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের। ইঁহাদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের নাগ রাজারা ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। সমুদ্রগুপ্ত ইঁহাদের পরাস্ত করিয়া রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করেন। ইহা ছাড়া দিল্লী ও পাঞ্জাবের কোটা রাজ্য এবং মধ্য ভারতের আটবিক বা অরণ্যরাজ্যগুলিও তিনি জয় করিয়াছিলেন। উত্তর ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। এইখানে বারজন রাজাকে তিনি পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, কোটুরের স্বামীদত্ত, কাঞ্চির বিষ্ণুগোপ ও বেঙ্গির হস্তিবর্মন। এই অঞ্চলের রাজা উগ্রসেন, কুবের ও ধনঞ্জয়ও তাঁহার হস্তে পরাস্ত হন। দক্ষিণের রাজ্যগুলির সম্পদ অধিকার সমুদ্রগুপ্তের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই অঞ্চলের সম্পদ ও রাজাদের আনুগত্য লাভ করিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। পরাজিত রাজাদের রাজ্যগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত জয় করিতে পারেন নাই। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর তিনি অভিযান চালাইয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলে বকাটক বংশীয় রাজারা এবং উত্তরে শক ক্ষত্রপরা রাজত্ব করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত ইঁহাদের ধ্বংস করিতে পারেন নাই।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রাজ্যজয়

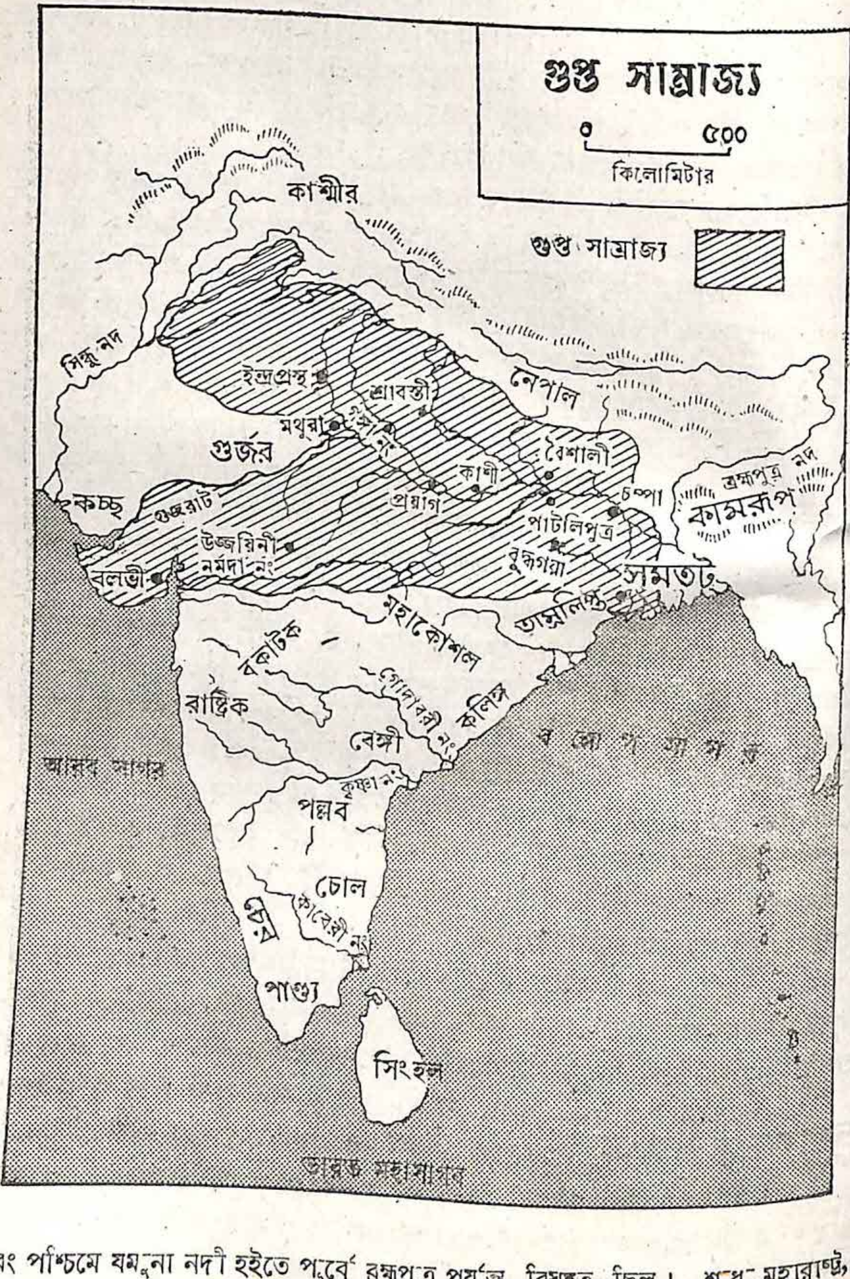
সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযান পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজাদের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। সমতট (পূর্ববঙ্গ), দাভক (আসাম বা ঢাকা), কামরূপ, নেপাল প্রভৃতি স্থানের রাজাগণ বিনাযুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। এই রাজ্যগুলি আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা পায়। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মালব, অর্জুনায়ণ, যৌধেয়, মদ্রক, আভির প্রভৃতি নয়টি উপজাতীয় রাজ্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের আশ্রয়লাভ করে। কুষাণ সামন্ত রাজারাও সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সিংহল, মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি সমুদ্রপারের রাজ্যগুলির সহিত সমুদ্রগুপ্তের সম্পর্ক

অন্যান্য রাজাদের আনুগত্য লাভ

---

(১) অশোকের স্তম্ভের উপর এইটি খোদিত।

স্থাপিত হইয়াছিল। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার অনুমতি লইয়া বুদ্ধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মাদ্রাজ



এবং পশ্চিমে যমুনা নদী হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শুধু মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও পশ্চিম পাঞ্জাব তাঁহার সাম্রাজ্যের বাহিরে ছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারে

সমুদ্রগুপ্তের অসাধারণ সাফল্য ও বীরত্বের জন্য ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁহাকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়াছেন। সাম্রাজ্য বিস্তার সমাপ্ত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি 'রাজচক্রবর্তী' বা সার্বভৌম সম্রাট হন। সমুদ্রগুপ্তকে সাম্রাজ্যবাদী নেপোলিয়নের সহিত তুলনা অনেকে সঙ্গত মনে করেন না।[১] নেপোলিয়ন ইউরোপের স্বাধীন রাজ্যগুলি জয় করিয়া ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতির মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং দুইজনের কীর্তি তুলনীয় বা এক নয়। কেহ কেহ মনে করেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপজাতীয় রাজ্যগুলিকে বিনষ্ট করিয়া সমুদ্রগুপ্ত এই দেশে হূণ আক্রমণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।[২] এই মতও গ্রহণ করা যায় না। সমুদ্রগুপ্ত ইঁহাদের ধ্বংস করেন নাই। ইহারা স্বেচ্ছায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

রাজ্যসীমা

পণ্ডিতদের মত খণ্ডন

সমুদ্রগুপ্ত শুধু দিগ্বিজয়ী বীর বা দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন বহু মানবিক গুণের আধার। হরিষেণের 'প্রশস্তি' হইতে আমরা তাঁহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জানিতে পারি। 'মৃদুহৃদয়' সমুদ্রগুপ্তের মন সবসময় অনুকম্পায় পূর্ণ থাকিত। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। শাস্ত্র ও কাব্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি নিজে কবি ছিলেন। বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা তাঁহার সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় বহন করে। শিল্পশ্রীমণ্ডিত তাঁহার সুবর্ণ মুদ্রাগুলি গুপ্তযুগের গৌরব। সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তাঁহার সমান অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। সারা দেশে সুশাসন ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমুদ্রগুপ্ত অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। বিদ্বান, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি কম নয়। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মৌর্য সম্রাট অশোকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অশোকের আদর্শ ছিল 'ধার্মিক ধর্মরাজত্ব' আর সমুদ্রগুপ্তের আদর্শ ছিল 'বিজয় ও ধর্মরক্ষা' অর্থাৎ রাজ্যজয় ও ধর্মরক্ষা। এই মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও দুজনকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা যায়। দুজনেই ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের ধারক ছিলেন। সম্ভবতঃ ৩৮০ খ্রীঃ সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়।

সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসেন। তিনি সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি অনুসরণ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পূর্ণ করেন। তিনি তাঁহার পিতামহ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মধ্য ভারতের নাগ ও কদম্ব বংশীয় রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজ কন্যা প্রভাবতীকে তিনি মহারাষ্ট্রের বকাটক (Vakataka) রাজ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩৮০-৪১৫ খ্রী.

(১) ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এইরূপ তুলনার বিরোধিতা করিয়াছেন।

(২) ডঃ রোমিলাথাপার এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

রুদ্রসেনের সহিত বিবাহ দেন। এই তিনটি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁহার পক্ষে পশ্চিম ভারতের শকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা সহজ হয়। তিনি মালব, গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের শক রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া তাঁহাদের পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে পশ্চিম ভারত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলি গুপ্তদের অধীনে আসায় পশ্চিম এশিয়ার রোমান সাম্রাজ্যের সহিত গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। শকদের পরাস্ত করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কেহ কেহ কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য বলিয়া মনে করেন। তিনি ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্য-গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজসভায় নয়জন আসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন যাঁহারা 'নবরত্ন' নামে খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে কালিদাস, বরাহমিহির, আর্যভট্ট ও দিগনাগাচার্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

তিনি উজ্জয়িনী নগরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বহির্ভারতের হিন্দু উপনিবেশগুলির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি প্রায় দশ বৎসরকাল (৪০১-৪১০ খ্রীঃ) এই দেশে অবস্থান করিয়া চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন।[১]

ফা-হিয়েনের বিবরণ ঃ ফা-হিয়েন গুপ্ত রাজাদের শাসনব্যবস্থার ভুয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। গুপ্ত রাজারা দেশে এক উদার শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছিলেন। ফা-হিয়েন লিখিয়াছেন গুপ্ত রাজাদের অধীনে মধ্যদেশের মানুষ ছিল তখন 'অসংখ্য ও সুখী' অর্থাৎ এই অঞ্চলে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিত এবং লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছিল। জনগণের দেশের সর্বত্র যাতায়াতের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাহারা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে পারিত। তাহাদের বাড়িঘরের বিবরণ সরকারী দপ্তরে নথিভুক্ত করিতে হইত না।

শাসনব্যবস্থা

গুপ্ত রাজাদের দণ্ডবিধির উদারতায় ফা-হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন। দেশে চুরি, ডাকাতি ও জঘন্য অপরাধের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অধিকাংশ অপরাধের জন্য শুধু অর্থদন্ড দেওয়া হইত। রাজদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের জন্য হাত-পা কাটিয়া ফেলার প্রথা ছিল। যাহারা জমি চাষ করিত তাহারা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব দিত। সরকারী কর্মচারীরা নগদ অর্থে বেতন পাইতেন। রাজকর্মচারীরা ছিলেন শাসনকার্যে দক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ। পাটলিপুত্র নগরীর মৌর্য প্রাসাদ দেখিয়া ফা-হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধান্য ছিল। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র নগরে ও মথুরায় বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিয়াছিলেন। গুপ্ত রাজারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমান উদার ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ করিতেন। দেশের অধিকাংশ লোক

---

১ ফা-হিয়েনের গ্রন্থের নাম ফো-কুয়ো-কি (Fo-Kouo-Ki).

ছিল নিরামিষভোজী ও অহিংসাপন্থী। মদ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন দেশের বেশীর ভাগ লোক গ্রহণ করিত না। চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নজাতীয় লোকেরা শহরের বাহিরে বাস করিত ও মাংস খাইত।

গুপ্তযুগে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। দেশে চুরি, ডাকাতি ছিল না। লোকে রাত্রিকালে দরজা-জানালা খোলা রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইত। সাম্রাজ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা বেশ ভাল ছিল। বড় বড় রাজপথের ধারে পান্থশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্রে একটি বিশাল দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিয়াছিলেন। জনসাধারণ ছিল সৎ। তাহারা সমৃদ্ধ ও সন্তোষপূর্ণ জীবন যাপন করিত।

জনগণের সমৃদ্ধি ও সন্তোষ

পরবর্তী গুপ্তরাজগণ: দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর প্রথম কুমারগুপ্ত অনুমানিক ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে বসেন। তিনি 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে নর্মদা অঞ্চলের পুষ্যমিত্র জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও সীমা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৪৫৫ খ্রীঃ তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ পরাক্রমশালী সম্রাট। তাঁহার রাজত্বকালে দুর্ধর্ষ হূণ জাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত হূণদের পরাস্ত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। এইজন্য তিনি ইতিহাসে 'ভারতের রক্ষাকর্তা' রূপে চিহ্নিত হইয়াছেন।[১] তিনি দক্ষিণে বকাটকদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরবসাগর এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে আনুমানিক ৪৬৭ খ্রীঃ হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটিতে থাকে। ৫৫১ খ্রীঃ নাগাদ পতন সম্পূর্ণ হইয়া যায়। স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী সাম্রাজ্যের শাসকগণ ছিলেন অযোগ্য ও দুর্বল। দুর্বল গুপ্তরাজাদের সময়ে হূণরা বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে থাকে। হূণ আক্রমণের সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে আরও দুর্বল করিয়া ফেলেন। কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের সময়ে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ: গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি চতুর্দশ শতকের সুলতানী ও অষ্টাদশ শতকের মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলির অনুরূপ। এই তিনটি সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, রাজ পরিবারে কলহ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও উচ্চ-রাজকর্মচারীদের স্বাধীনতা ঘোষণা পতনের কারণ

(১) বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

হয়। (১) সম্রাট কুমারগুপ্তের সময়ে পুষ্যমিত্র জাতি প্রথম গুপ্ত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন ঠিকই তবে এই বিদ্রোহের মনোভাব সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়ে। বলভী, মৈত্রক, বাংলার শাসকগণ ও মধ্য ভারতের মৌখরিগণ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইয়া যান। (২) স্কন্দগুপ্তের সময় হইতে হূণজাতি বারবার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে থাকে। তিনি উহাদের দমন করিতে পারিলেও পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণ পারেন নাই। হূণনেতা তোরমান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে হূণরা প্রথমে পাঞ্জাব ও মালব দখল করিয়া লয় এবং ক্রমাগত গুপ্ত সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানিয়া উহাকে দুর্বল করিয়া ফেলে। ৩) মালবের প্রাদেশিক শাসনকর্তা যশোধর্মনকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী করা হয়। হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া যশোধর্মন নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। পরে গুপ্ত সম্রাটদের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া যান। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য প্রাদেশিক শাসকগণ স্বাধীন হন। (৪) গুপ্ত শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহার চরিত্র। গুপ্ত রাজাদের এককেন্দ্রিক শাসন পরবর্তীকালে আধা-সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়। আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাদেশিক শাসকগণ প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। হূণ আক্রমণের পর কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে একে একে সকলেই স্বাধীন হইয়া যায়। (৫) সম্রাট কুমারগপ্তের পর হইতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে থাকে। কুমারগুপ্তের পরবর্তী শাসকগণের সময়ে যে হীনমানের মুদ্রা চালু হয় তাহা হইতে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। (৬) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত শৌর্য, বীর্য ও রাজনৈতিক দক্ষতায় যে সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন পরবর্তীকালের অযোগ্য বংশধররা তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটগণের অযোগ্যতা, অক্ষমতা ও অপদার্থতা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। (৭) এই অপদার্থ ও অযোগ্য রাজপুত্ররা সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন এবং সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেন। সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ইহা এক সাধারণ নিয়ম। (৮) শেষদিকের গুপ্ত সম্রাটগণ বৌদ্ধধর্ম, সন্ন্যাস ও দর্শনের দিকে বড় বেশী ঝুঁকিয়া পড়েন। ফলে ইঁহারা যুদ্ধ-বিমুখ হইয়া উঠেন। যুদ্ধবিমুখ সম্রাটগণ আর যাহাই হউক সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। (৯) এইভাবে বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন পতনোন্মুখ তখন উচ্চ রাজকর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে অতিরিক্ত ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। মুঘল অভিজাতশ্রেণীকে মুঘল সাম্রাজ্যে পতনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী করা যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজপুরুষরা সেই একই অপরাধে অপরাধী ছিলেন।

গুপ্ত সভ্যতার বৈশিষ্ট্য (Distinctive features of the Gupta culture) ঃ ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগ বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ যুগে বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছিল। ধর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রেও অভাবনীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। গুপ্তরাজগণ দেশে জনকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা

স্থাপন করিয়া সৃজনী শক্তির বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই-সব যোগাযোগের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর বৈদেশিক সংস্কৃতির বিশেষত গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির প্রভাব পড়িয়াছিল। গুপ্তযুগে ভারতের পরিণত সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই যোগাযোগের ফলে নিঃসন্দেহে পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ গুপ্তযুগকে হিন্দু রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগ শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে অসাধারণ উন্নতির জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এইসব ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষের জন্য গুপ্তযুগকে পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।[১]

সাহিত্য ও দর্শন

গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটিয়াছিল। এই যুগে মহাকবি কালিদাস তাঁহার অমর কাব্য ও নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রঘুবংশম্, কুমারসম্ভবম্, মেঘদূতম্ কাব্য ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় আছে। এইগুলি কালজয়ী শাশ্বত সাহিত্যরূপে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। পণ্ডিতদের ধারণা ভারবী, শূদ্রক ও বিশাখদত্ত এই যুগে তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নিজে ছিলেন প্রতিভাবান কবি। কাব্য সৃষ্টির জন্য তিনি 'কবিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নয়জন অসাধারণ গুণী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহারা একত্রে 'নবরত্ন' রূপে পরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যে অসাধারণ অবদানের জন্য দণ্ডিন খ্যাতিলাভ করেন। দর্শনচর্চার উন্নতির জন্য গুপ্তযুগ বিশেষ প্রসিদ্ধ। বসুবন্ধু, অসঙ্গ, কুমারজীব ও দিগ্‌নাগ তাঁহাদের দর্শন গ্রন্থগুলি এই যুগে রচনা করিয়াছিলেন। ভারতীয় দর্শনের ছয়টি শাখার চর্চা গুপ্তযুগে পরিণত রূপলাভ করে।

গুপ্ত সম্রাটগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দিতেন। নালন্দা ও তক্ষশীলায় যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেইখানে ভারতীয় ও বিদেশী ছাত্ররা অধ্যয়ন করিত। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রচর্চার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তাহা ছাড়া সাহিত্য, ন্যায়, ব্যাকরণ, ছন্দ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও গণিত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত।

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

গুপ্তযুগ বিজ্ঞানচর্চা ও উন্নতির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির গণিত, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ অবদান রাখেন। আর্যভট্ট প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের অভিধান রচয়িতা অমরসিংহ ও ভেষজ বিজ্ঞানী ধন্বন্তরী গুপ্তযুগের লোক ছিলেন। এইযুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতি দেখা যায়। ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান পারস্য, আরব ও গ্রীসদেশে আদর পায়।

গুপ্ত সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এইযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়। গুপ্ত সম্রাটগণ রাজধানী নির্মাণ ছাড়াও বহু দেবদেবীর মন্দির ও বৌদ্ধ

(১) 'The Gupta Age is in the Annals of classical India almost what the Periclean Age is in the history of Greece.' —H. C. Raychaudhuri

মঠ নির্মাণ করেন। বৌদ্ধ ও জৈনদের জন্য অজন্তা ও ইলোরার বিখ্যাত গুহাগুলি এই যুগে নির্মিত হয়। গুপ্তযুগের মন্দির স্থাপত্য, অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্রগুলি এই যুগের স্থাপত্য ও চিত্রকলার উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। গুপ্তযুগের শিল্প সুষমামণ্ডিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলি উচ্চ শিল্প ভাবনার পরিচয় বহন করে। ভিতরগাঁও ও দেওগড়ের মন্দির, ভারহুত ও সারনাথের ভাস্কর্য খাঁটি গুপ্ত শিল্প-রীতির পরিচায়ক। এই যুগে অঙ্কিত মানুষ, বৃক্ষ, লতা ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতিগুলি অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। গুপ্তসম্রাটগণ সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুরাগী ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মূর্তি তাঁহার সঙ্গীত অনুরাগের পরিচয় বহন করে।

শিল্প ও সঙ্গীত



অবলোকিতেশ্বর (অজন্তা) গুপ্তযুগ

গুপ্ত সম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের আনুকূল্যে এই যুগে হিন্দুধর্মের নবজাগরণ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের সমর্থনের জন্য বৌদ্ধ যুগের পরে হিন্দুধর্ম ভারতীয় সমাজে আবার প্রতিষ্ঠা পায়। তবে গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। যাগযজ্ঞ বহুল আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের পরিবর্তে লৌকিক হিন্দুধর্ম প্রাধান্য পায়। লৌকিক হিন্দু দেব-দেবী বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী ও দুর্গা এবং ভক্তিধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মনু, নারদ ও কাত্যায়ন রচিত হিন্দুস্মৃতিশাস্ত্রগুলি এই যুগে সঙ্কলিত হয়। গুপ্ত রাজারা হিন্দুধর্মের অনুরাগী ছিলেন ঠিকই তবে সমানভাবে তাঁহারা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদারতা প্রদর্শন করিতেন। গুপ্ত সম্রাটগণ বৌদ্ধ মঠ ও বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতেন।

হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগ ও সহিষ্ণুতা

সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতির জন্য গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের 'সুবর্ণ যুগ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গুপ্তযুগে সাধারণভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অভিজাত সম্প্রদায় বিলাসব্যসনে জীবন কাটাইত। কালিদাসের কাব্যে এ বিলাস-বৈভবের বর্ণনা আছে। অনেকের মতে সংস্কৃত ভাষা আশ্রয়ী গুপ্তযুগের এই সভ্যতা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের অধিকাংশ মানুষ এ সভ্যতার অংশীদার ছিল না। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় গুপ্তযুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ইহা যথার্থই 'সুবর্ণ যুগ' আখ্যা পাইতে পারে।

সুবর্ণ যুগ

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ**—(ক) ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে ষোড়শ মহাজনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল ? (খ) ষোড়শ মহাজন পদের মধ্যে কোন্ চারিটি রাজ্য শক্তিশালী হইয়াছিল ? (গ) যে চারিটি রাজবংশের অধীনে মগধের সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে তাহাদের নাম কর। (ঘ) বিম্বিসার কে ছিলেন ? (ঙ) বিম্বিসার প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম কি ? (চ) মগধের রাজধানীর নাম কি ? (ছ) শৈশুনাগ বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজার নাম কি ? (জ) নন্দবংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন ? (ঝ) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ঞ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন ? (ট) অর্থশাস্ত্রের লেখক কে ? (ঠ) অশোক কত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন ? (ড) কোন্ পারস্য সম্রাট প্রথম ভারত আক্রমণ করেন ? (ঢ) আলেকজাণ্ডার কত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারত আক্রমণ করেন ? (ণ) কুষাণদের আদিবাসভূমি কোথায় ? (ত) কুষাণরা কোন্ সময়ে ভারতে প্রবেশ করে ? কণিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ? (থ) কণিষ্ক প্রচলিত সম্বত শকাব্দ নামে পরিচিত কেন ? (দ) 'দ্বিতীয় অশোক' কাহাকে বলা হয় ? (ধ) সুশ্রুত ও চরক কে ছিলেন ? (ন) নাগার্জুন কাহার সমসাময়িক ? (প) সাতবাহন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ফ) সাতবাহনগণ কোন্ সময়ে রাজত্ব করেন ? (ব) কোন্ সাতবাহন রাজা শকদের পরাস্ত করিয়া গৌরব অর্জন করেন ? (ভ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ম) গুপ্তদের আদিবাসস্থান কোথায় ? (য) আর্যভট্ট কে ছিলেন ? (র) ধন্বন্তরী কোন্ যুগের লোক ? (ল) অমর সিংহ কি জন্য বিখ্যাত ? (ব) পহ্লব কাহারা ? ইহারা কখন ভারতে আসে ? (শ) কুষাণদের প্রথম রাজা কে ? (ষ) ভারতে কুষাণ রাজত্বের সূচনা করেন কে ? (স) বকাটকগণ কোথায় রাজত্ব করিত ? (হ) ভারতের রক্ষাকর্তা কাহাকে বলা হয় ? (ড়) গুপ্তযুগের তিনজন দার্শনিকের নাম কর। (ঢ়) গুপ্ত সম্রাটগণ কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ? (য়) অশ্বঘোষ কে ছিলেন ?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**—(ক) মগধের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কি বিশেষ সুবিধা ছিল ? (খ) মহাপদ্মনন্দকে 'ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা' বলা হয় কেন ? (গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ পরিচয় সম্পর্কে কি জানা যায় ? (ঘ) অশোকের সাম্রাজ্য সীমা সম্পর্কে কি জান ? (ঙ) বিশ্ব ইতিহাসে সম্রাট অশোকের স্থান নির্ণয় কর। (চ) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ? (ছ) মৌর্য শিল্পকলা সম্পর্কে কি জান ? (জ) মৌর্যযুগে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের কিরূপ সম্পর্ক ছিল ? (ঝ) কুষাণ কাহারা ? কণিষ্কের রাজ্যসীমা সম্পর্কে কি জান ? (ঞ) কুষাণযুগে বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের কিরূপ সম্পর্ক ছিল ? (ট) সাতবাহনদের শ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি সম্পর্কে কি জান ? (ঠ) সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলা হয় কেন ? (ড) ফা-হিয়েন কখন ভারতে আসেন ? ভারত সম্পর্কে তিনি কি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন ?

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর ঃ**—(ক) রাজা বিম্বিসার হইতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পর্যন্ত মগধের উত্থানের পরিচয় দাও (খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব বিচার কর। (গ) চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ঘ) অশোকের ধর্মের মূল কথা কি ? ইহা প্রচারের জন্য তিনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (ঙ) আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের বিবরণ দাও। ইহার ফলাফল আলোচনা কর (চ) মৌর্যযুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় দাও। (ছ) কুষাণযুগের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর একটি প্রবন্ধ লিখ। (জ) সমুদ্রগপ্তের সাম্রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (ঝ) গুপ্তযুগকে সুবর্ণযুগ বলা হয় কেন ? (ঞ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর।

৪। **টীকা লিখ ঃ**—(ক) ব্রাকট্রিয় গ্রীকগণ (খ) গান্ধার শিল্প (গ) কালিদাস (ঘ) বরাহমিহির (ঙ) আর্যভট্ট (চ) মৌর্য শিল্প-রীতি (ছ) সেলুকাস নিকাটর (জ) মিনান্দার।

৫। **ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ কর ঃ**— (ক) ললিত পাটন (খ) তক্ষশীলা (গ) গিরনার (ঘ) পুষ্কলাবতী (ঙ) সিন্ধপুর (চ) সাঁচি (ছ) বিরাট (জ) কপিলাবস্তু (ঝ) কালসি (ঞ) বকাটক (ট) মহাকোশল (ঠ) বলভী (ড) বৈশালী (ঢ) পল্লব (ণ) চোল, চের ও পাণ্ড্যরাজ্য।

৬। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**—(ক) খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তরে আফগানিস্তান হইতে দক্ষিণে — নদী পর্যন্ত মোট — ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এগুলিকে — বলা হয়। (খ) পরবর্তীকালে — নামক চারিটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হইয়া উঠে। (গ) — বংশীয় রাজা বিম্বিসার মগধের সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন। (ঘ) শৈশুনাগবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —। (ঙ) সুদূর দক্ষিণের — রাজ্যগুলি অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না। (চ) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে — প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক বা গণরাজ্য ছিল। (ছ) সাতবাহন রাজারা — ধর্মের পৃষ্ঠকোষকতা করেন।

৭। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও ঃ**—(ক) রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ / মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। (খ) বিম্বিসার / বিন্দুসারের পুত্র ছিলেন সম্রাট অশোক। (গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বৌদ্ধ / জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। (ঘ) কুষাণ রাজা কণিষ্ক মহাযান / হীনযান মতের অনুরাগী ছিলেন। (ঙ) বিম কদ্‌ফিস শৈব / বৌদ্ধ ছিলেন। (চ) প্রথম সাতকর্ণি / গৌতমী পুত্র সাতকর্ণি সাতবাহন / পল্লবদের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। (ছ) গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত / দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত / বিক্রমাদিত্য। (জ) কালিদাসের কাব্য ও নাটকে গুপ্ত যুগের সাধারণ মানুষ / অভিজাতদের জীবন যাত্রার পরিচয় আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

উত্তর ভারত

রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম (Struggle for Domination):

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ হূণ জাতি মধ্য এশিয়া হইতে ভারতে প্রবেশ করে। গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত তাহাদের পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হূণনেতা তোরামান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে হূণরা পুনরায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে। মালব অঞ্চলে এই হূণ শক্তিকে বাধা দেন গুপ্তদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন রাজা যশোধর্মন। মালবের দশপুর বা মান্দাসোরে তাঁহার রাজধানী ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতে তিনটি শক্তি নিজেদের সংহত করিতে সক্ষম হয়। ইহারা হইল কনৌজ বা উত্তর প্রদেশের মৌখরিগণ, থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশ এবং বাংলাদেশে রাজা শশাঙ্ক। মালবে দেবগুপ্ত ও দাক্ষিণাত্যে চালুক্য বংশও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধন ও কনৌজরাজ গ্রহবর্মা উভয়েই হূণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধন কনৌজরাজ গ্রহবর্মার সহিত নিজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দেন। থানেশ্বর ও কনৌজের মধ্যে মিত্রতায় ভীত হইয়া মালবরাজ দেবগুপ্ত বাংলার রাজা শশাঙ্কের সহিত মিত্রতা করিয়া কনৌজ আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মা নিহত হন এবং রানী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতির সাহায্যে অগ্রসর হইলে গৌড়রাজ শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হন। থানেশ্বর ও কনৌজের এই ঘোর দুর্দিনে রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন।

হূণ আক্রমণ ও যশোধর্মন

উত্তর ভারতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব

শশাঙ্ক (৬০৬—৬৩৭ খ্রীঃ): সপ্তম শতকের প্রথম দিকে শশাঙ্ক বাংলায় এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শশাঙ্ক সম্ভবতঃ শেষদিকের গুপ্ত রাজাদের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। শশাঙ্কের নেতৃত্বে বাংলা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এইজন্য বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁহার রাজধানী।

গৌড়ের উত্থান

শশাঙ্কের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গুপ্ত রাজাদের অধীনে সামন্ত রাজা হিসাবে জীবন শুরু করিয়া ৬০৬ খ্রীঃ নাগাদ তিনি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া শশাঙ্ক একে একে বিহার ও উৎকল দখল করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উৎকল লইয়া তাঁহার রাজ্য গড়িয়া উঠে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কনৌজের মৌখরিগণ এবং থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ উত্তর ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়।

জীবন ও রাজ্যজয়

মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার সহিত থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। থানেশ্বর ও কনৌজের শত্রু ছিলেন মালবরাজ দেবগুপ্ত। শশাঙ্ক মগধ দখল করিলে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার সহিত তাঁহার বিরোধ দেখা দেয়। তিনি থানেশ্বর ও কনৌজের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

মালবরাজ দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করিয়া রাজা গ্রহবর্মাকে হত্যা করেন। থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন কনৌজের সাহায্যে অগ্রসর হইলে শশাঙ্ক তাঁহাকে হত্যা করেন। ইতিমধ্যে শশাঙ্ক কামরূপ জয়ে অগ্রসর হইলে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা থানেশ্বরের পক্ষে যোগ দেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিবার জন্য শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা তাঁহার পক্ষে যোগ দেন। শশাঙ্ক থানেশ্বর-কনৌজ ও কামরূপের মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজ রাজ্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন হর্ষবর্ধন তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। ৬৩৭ খ্রীঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন গৌড় দখল করেন। এই রাজ্যের একাংশ তিনি মিত্র ভাস্করবর্মাকে উপহার দেন।

থানেশ্বর, কনৌজ ও কামরূপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

শশাঙ্ক নিঃসন্দেহে সপ্তম শতকের প্রথমদিকে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। একজন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা হিসাবে জীবন শুরু করিয়া বাংলার নেতৃত্বে তিনি সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা করিয়া যান। তাঁহার অনুসৃত পথ ধরিয়া পরবর্তীকালে পালরাজারা উত্তর ভারত অধিকার করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সামরিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কূটনীতিতেও দক্ষ ছিলেন। ডঃ বি. সি. সেনের মতে, বাংলার ইতিহাসের 'ব্যর্থতার যুগে' শশাঙ্কই ছিলেন একমাত্র সার্থক রাজা। বাংলার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার পথ তিনি সুগম করিয়া যান। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ লিখিয়াছেন যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা করেন। তবে তিনিও স্বীকার করিয়াছেন শশাঙ্কের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি শশাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, বাণভট্ট বা হিউয়েন সাঙের মত লেখকের আনুকূল্য লাভ করিলে শশাঙ্কও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হর্ষের ন্যায় ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে দেখা দিতেন।

শশাঙ্কের কৃতিত্ব

হর্ষবর্ধন ঃ হর্ষবর্ধনের সিংহাসনলাভ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হইয়া যায়। হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে এই ঐক্য পুনঃস্থাপন করিতে সমর্থ হন। তিনি ভগিনী রাজ্যশ্রীর রাজ্য কনৌজ অধিকার করিয়া তাঁহার রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। ঐ সময় হইতে কনৌজ ভারতে সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়। অষ্টম ও নবম শতকে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণ সাম্রাজ্য লাভের আশায় কনৌজ অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৭ খ্রী.

থানেশ্বরের শাসনক্ষমতা লাভ করিয়া হর্ষবর্ধন নিজেকে রাজপুত্র 'শিলাদিত্য' বলিয়া পরিচয় দিতেন, রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নাই, ৬১২ খ্রীঃ কনৌজ অধিকার করিবার পর তিনি 'মহারাজা' উপাধি নেন। থানেশ্বর ও কনৌজ যুক্ত হইবার ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এক শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। রাজ্যগ্রহণ করিবার পর হর্ষের সামনে দুইটি সমস্যা দেখা দেয়—ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার এবং ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে শাস্তিদান। রাজ্যশ্রী ইতিমধ্যে বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন উপজাতিদের সহায়তায় ভগিনীকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন। শশাঙ্ককে শাস্তিদানের জন্য তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা ও মালবরাজ মাধবগুপ্তের সহিত

থানেশ্বর ও কনৌজ যুক্তরাজ্য



হর্ষবর্ধন

মিত্রতা স্থাপন করেন। তবে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার মিলিত শক্তি গৌড়রাজ শশাঙ্ককে পরাস্ত করিতে পারে নাই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে হর্ষবর্ধন গৌড় দখল করেন।

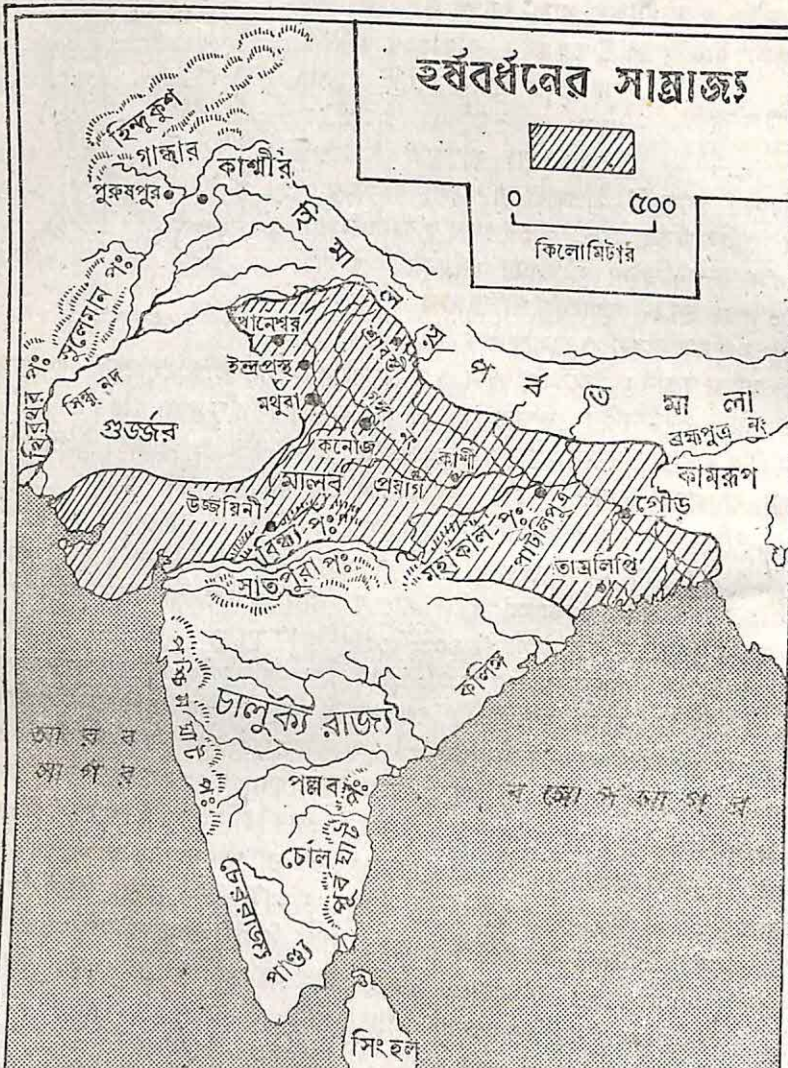
হর্ষবর্ধন ছিলেন দক্ষ রাষ্ট্রনেতা, কূটকৌশলী, সাহসী বীর ও সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা। সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে ছিল ষাট হাজার হস্তী ও এক লক্ষ অশ্বারোহী। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও হিউয়েন সাঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় হর্ষবর্ধন পঞ্চভারত (Five Indies) জয় করিয়াছিলেন। এই 'পঞ্চভারত' হইল পাঞ্জাব, কনৌজ, বঙ্গ, দ্বারভাঙ্গা ও উৎকল। রাজ্যগ্রহণের পর প্রথম ছয় বৎসর (৬০৬—৬১২ খ্রীঃ) হর্ষবর্ধন ভারতের চতুর্দিকে রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সমকালীন অন্যান্য তথ্য হইতে জানা যায় তিনি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর উড়িষ্যা ও গঞ্জাম জেলার একাংশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি গুজরাটের বলভীরাজ্যের রাজা ধ্রুবসেনকে পরাস্ত করিয়া ঐ রাজ্য দখল করেন। পরে ধ্রুবসেনের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় কনৌজ ও বলভীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়। পরে তিনি মগধ, সিন্ধুদেশ, তুষার শৈল বা নেপাল ও কাশ্মীর জয় করেন। সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের সমস্ত রাজ্য হর্ষবর্ধনের অধিকারভুক্ত হয়। উত্তর ভারত জয় সম্পূর্ণ করিয়া হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারত জয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সময় দাক্ষিণাত্যে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশী। নর্মদাতীরে পুলকেশীর সহিত সংঘর্ষে হর্ষবর্ধন পরাজিত হন। ইহার পর তিনি দক্ষিণ ভারত জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয়

হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ঐতিহাসিক কে. এম পানিক্কর ও অন্যান্যরা তাঁহাকে 'সকলোত্তরপথনাথ' বা সমগ্র উত্তর ভারতের সম্রাট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট ও চীনাপর্যটক হিউয়েন সাঙ্ উভয়েই তাঁহার সাম্রাজ্যসীমা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। আসলে হর্ষবর্ধন পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মগধ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও গঞ্জাম জেলার উপর অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। সমগ্র উত্তর ভারত হর্ষবর্ধনের

রাজ্যসীমা

সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। কাশ্মীর, নেপাল ও সিন্ধুদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল না বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্মদা এবং পূর্বে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা হইতে পশ্চিমে গুজরাটের বলভীরাজ্য ছিল



হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যসীমা। জলন্ধরের উদিতা, পূর্বমালবের মাধবগুপ্ত ও কামরূপের ভাস্করবর্মা তাঁহার মিত্ররাজা ছিলেন।

হর্ষবর্ধন সারা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সারা বৎসর রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া তিনি প্রজাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতেন। কনৌজ নগরী ছিল অতি সুরক্ষিত। জনসাধারণ সুখ-শান্তিতে বসবাস করিত। রাজধানীতে অনেক ধনী ও সংস্কৃতিবান পরিবারের বাস ছিল। হর্ষবর্ধন নিজে বৌদ্ধ-ধর্মের অনুরাগী হইলেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বুদ্ধ ছাড়া শিব ও সূর্যের উপাসনা করিতেন। সম্রাট ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজে 'নাগনন্দা', 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'রত্নাবলী' নাটক রচনা করেন। বাণভট্ট, হরিদত্ত, জয়সেন, দিবাকর, ময়ূর প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন দেশে প্রাণী হত্যা বন্ধ করিয়া দেন। সারা দেশে বিশ্রামাগার ও মঠ নির্মাণ করিয়া তিনি পথিক ও সন্ন্যাসীদের উপকার করেন। তিনি চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সম্মানে কনৌজে এক ধর্মসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর তিনি প্রয়াগে 'মহামোক্ষ পরিষদ' বা দানমেলার অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত সম্পদ দান করিয়া তিনি নিঃস্ব হইতেন।

হর্ষবর্ধনের অন্যান্য গুণাবলী

বিজেতা ও শাসক হিসাবে হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একজন মহান সম্রাটের মর্যাদা পাইয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি মহামতি অশোকের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁহার করুণা, দান ও সহিষ্ণুতা মৌর্য আদর্শের অনুগামী বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ তাঁহাকে 'প্রাচীন ভারতের আকবর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহান মুঘল সম্রাটের ধর্মসমন্বয় ও জনকল্যাণের আদর্শ তাঁহার মধ্যে সমন্বিত রূপ লাভ করিয়াছিল।

তাঁহার চরিত্রের মূল্যায়ন

হিউয়েন সাঙের বিবরণঃ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীনদেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁহার সময়ে চীনদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ্ ভারত ভ্রমণে আসেন। হিউয়েন সাঙ্ প্রায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ পনের বৎসরকাল ধরিয়া (৬৩০—৬৪৫ খ্রীঃ) এই দেশের জীবন, রাষ্ট্র ও ধর্মের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ভারত সম্পর্কিত তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থ সি-উ-কি (Siyuki) বেশ তথ্যপূর্ণ।[১] হিউয়েন সাঙের গ্রন্থ হইতে জানা যায় সে যুগে ভারতে দুইটি প্রধান ধর্ম হইল হিন্দু ও বৌদ্ধ। সারা ভারতে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল। কাশ্মীর, বুদ্ধগয়া ও কনৌজ প্রভৃতি স্থানে তিনি বহু বৌদ্ধ মঠ ও বিহার দেখিয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকেরা সংস্কৃত ভাষার চর্চা করিত। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। মধ্যদেশের লোকেরা ছিল সংস্কৃতিবান ও সুসভ্য। দেশে চোর ডাকাতের উপদ্রব থাকায় দণ্ডবিধি কঠোর করা হইয়াছিল। শাস্তি হিসাবে অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। পাটনার নিকট নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল সেই যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। হিউয়েন সাঙ্ এখানে অধ্যক্ষ

দেশের অবস্থা

(১) 'পশ্চিমী দেশগুলির স্মৃতি'।

শীলভদ্রের নিকট দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই যুগে চীন, জাপান, কোরিয়া, জাভা, সুমাত্রা ও সিংহল হইতে বহু ছাত্র নালন্দায় পড়িতে আসিত।

হিউয়েন সাঙ্ বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরকে ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখান হইতে সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত বাণিজ্য চলিত। হিউয়েন সাঙ্ দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পুলকেশী ও হর্ষবর্ধন ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ রাজা। হিউয়েন সাঙের সম্মানার্থে হর্ষবর্ধন কনৌজে এক ধর্মসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি মহাযান ধর্মমত ব্যাখ্যা করেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগে ধর্মমেলার অনুষ্ঠান হইত। সেখানে রাজা দান-ধ্যান করিতেন। শিব, সূর্য ও বুদ্ধের উপাসনা হইত।


হিউয়েন সাঙ্

হিউয়েন সাঙ্ তাঁহার রচনায় এদেশের জীবনযাত্রার উপর আলোকপাত করিয়াছেন। ভারতবাসী সহজ, সরল, সৎ জীবন যাপন করিত। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অশন-বসন ছিল অত্যন্ত সাধারণ। দুধ, ঘি চিনি, চাউল, সরিষার তৈল তাহাদের খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য পাইত। মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন খুব কম লোকে গ্রহণ করিত। ভারতীয়রা পবিত্রতা ও সততার উপর খুব জোর দিত। ধান, গম, সরিষা প্রভৃতি শস্য এবং আম, আপেল, বেদানা, তরমুজ, আঙ্গুর, কমলালেবু প্রভৃতি ফল এদেশে উৎপন্ন হইত।

জীবনযাত্রা

জমির উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজকর্মচারীগণ বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ দখল করিতেন। এই প্রথা হইতে এদেশে সামন্ত প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

রাষ্ট্রকূট-পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্ব ঃ হর্ষবর্ধনের সময় কনৌজ ভারতের রাজনৈতিক আধিপত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ভারতীয় রাজগণের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে কনৌজ অধিকার করিতে পারিলেই সার্বভৌম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃতি মিলিবে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর (৬৪৭ খ্রীঃ) উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হইয়া যায়। যশোবর্মন কিছুকাল কনৌজে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তবে কনৌজের পূর্ব গৌরব আর ছিল না। ভারতের তিন প্রান্তে তিনটি নূতন রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয়। দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটদের অধীনে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে রাজা দন্তিদুর্গ

ত্রিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

চালুক্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য অধিকার করেন। তাঁহার নেতৃত্বে রাষ্ট্রকূটশক্তি অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। দন্তিদুর্গের বংশধররা কনৌজ জয় করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। ঐ সময়ে বাংলার পালবংশের রাজা ধর্মপাল (৭৭০—৮১০ খ্রীঃ) মগধ ও বিহার জয় করিয়া উত্তর ভারতের কনৌজ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। অপরদিকে রাজপুতনার গুর্জর-প্রতিহার বংশের রাজারা উত্তর ভারতের স্নায়ুকেন্দ্র কনৌজ অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হন। প্রতিহার বংশের রাজারা উত্তর-পশ্চিমে আরবদের প্রতিহত করেন এবং মধ্যদেশে উজ্জয়িনী পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিহার বংশীয় রাজা বৎসরাজ কনৌজ অধিকার করিলে রাষ্ট্রকূট-পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্ব বা ত্রিপাক্ষিক প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া যায়। প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল (৭৫০—৯৫০ খ্রীঃ)।

কনৌজ লইয়া সংঘর্ষ

প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজ কনৌজের তদানীন্তন রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাস্ত করিয়া কনৌজ দখল করেন। পরাজিত ইন্দ্রায়ুধকে তিনি নিজের অধীনস্থ রাজা হিসাবে কনৌজে স্থাপন করেন। ঠিক এই সময়ে বাংলার পরাক্রান্ত রাজা ধর্মপাল কনৌজ আক্রমণ করিয়া বৎসরাজের হস্তে পরাস্ত হন। প্রতিহার-পাল সংঘর্ষের সুযোগে কনৌজ দখল করিবার জন্য রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব অগ্রসর হন এবং বৎসরাজকে পরাজিত করেন। প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট যুদ্ধের পর ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যান। ধর্মপাল এই সুযোগে কনৌজ অধিকার করিয়া নিজ প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট পিতার নীতি অনুসরণ করিয়া পুনরায় কনৌজ আক্রমণ করেন। ধর্মপালকে পরাস্ত করিয়া তিনি কনৌজ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার পর কনৌজ হয় প্রতিহার রাজ্যের রাজধানী।

দ্বিতীয় নাগভট্টের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ আক্রমণ করিয়া প্রতিহাররাজকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধজয়ের পর রাষ্ট্রকূটরাজ দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যান। প্রতিহাররাজ পুনরায় কনৌজ দখল করিয়া সেখানে তাঁহার রাজধানী পুনঃস্থাপন করেন। কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিহারবংশ পরবর্তীকালে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল। প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ বা মিহির ভোজ দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের একটি বড় অংশ দখল করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

কনৌজ-প্রতিহার সাম্রাজ্য

দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণকে পরাস্ত করিয়া তিনি মালব ও গুজরাট অধিকার করেন। পাঞ্জাব ও রাজপুতনা তাঁহার সাম্রাজ্যাধীনে ছিল। প্রতিহার বংশের অধীনে কনৌজ আবার রাজনৈতিক আধিপত্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

পালরাজগণ (The Palas)ঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর (৬৩৭ খ্রীঃ) পর একশত বৎসরের অধিককাল সময় বাংলাদেশে অরাজকতা চলে। ঐ সময় বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ভদ্র, খড়্গ প্রভৃতি বংশীয় রাজারা দেশের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করিতেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না। বাংলার ইতিহাসের এই পর্বকে (৬৩৭—৭৫০ খ্রীঃ)

'মাৎস্যন্যায়' বলা যাইতে পারে। বড় মাছ ছোট মাছকে যেমন খাইয়া ফেলে তেমনি ঐ যুগে ধনী গরীবকে, শক্তিশালী লোকেরা দুর্বলকে গ্রাস করিত। এই অরাজকতার অবসান ঘটাইবার জন্য বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দেশের লোকের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষত্রিয় বংশীয় গোপালকে রাজা নির্বাচন করেন। গোপাল ছিলেন বাংলার পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অরাজকতার অবসান ঘটাইয়া তিনি দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনেন।

বাংলায় অরাজকতা—মাৎস্যন্যায় ও পাল-বংশের প্রতিষ্ঠা

গোপালের পর তাঁহার পুত্র ধর্মপাল বাংলার রাজা হন। তিনি ছিলেন পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। ধর্মপাল ক্ষুদ্র বাংলা রাজ্যকে প্রসারিত করিয়া ইহাকে সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করেন। তিনি মগধ ও বিহার জয় করিয়াছিলেন। কনৌজ দখল করিবার জন্য তিনি প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনৌজরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পরাস্ত করিয়া নিজ মনোনীত রাজা চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। কনৌজ অধিকার করিবার পর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মদ্র, গন্ধার, অবন্তী ও কুরু রাজ্যের রাজারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। বঙ্গোপসাগর হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। ধর্মপালের উপাধি হয় 'পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ'। গুজরাতী কবি তাঁহাকে 'উত্তরাপথস্বামী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১] আজীবন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিলেও ধর্মপাল ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মের অনুরাগী। তবে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা ছিল। ব্রাহ্মণ গর্গ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। মগধের বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিহার তাঁহার আমলে নির্মিত হয়।

ধর্মপাল, ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ

ধর্মপালের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করিয়াছেন যে ধর্মপাল বাংলাকে যে সাম্রাজ্য ও সামরিক গৌরব দান করেন তাহা আর কোন বাংলার শাসক পারেন নাই। কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রয়োগে বাংলার এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে তিনি উত্তর ভারতের এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। উত্তরে প্রতিহার ও দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটদের সহিত লড়াই করিয়া তাঁহাকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই দুই শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সারা জীবন যুদ্ধ করিতে হয়। পরাক্রমশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ধর্মপাল শশাঙ্কের বাংলা সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নকে সফল করিয়াছিলেন। কনৌজে এক আড়ম্বর-পূর্ণ রাজসভা করিয়া ধর্মপাল তাঁহার রাজনৈতিক আধিপত্য ঘোষণা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলা উত্তর ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তিতে পরিণত হয়।

ধর্মপালের পর তাঁহার পুত্র দেবপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি পাল সাম্রাজ্যের সীমা আরও প্রসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য উত্তর ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তিনি কলিঙ্গ ও আসাম জয়

(১) সোদধালা—'উদয়সুন্দরীকথা'।

করিয়াছিলেন। প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। তিনি প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ এবং রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষকে পরাজিত করেন। উত্তরে হূণ ও উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ রাজ্য তিনি জয় করিয়াছিলেন। হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বতমালা এবং আসাম হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। পিতার ন্যায় দেবপাল শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের সময় (৮৫০—৯০৮ খ্রীঃ) এই সাম্রাজ্যের উপর ক্রমাগত বৈদেশিক আক্রমণ ঘটিতে থাকে। উত্তরে প্রতিহারগণ এবং দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটগণ পাল সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানেন। ইহাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা পরবর্তী পাল রাজাদের ছিল না। রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় (৯০৮—৯৮৮ খ্রীঃ) চান্দেল্ল, কম্বোজ ও কলচুরীদের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

দেবপাল, ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ

এই দুঃসময়ে পালবংশের হৃতগৌরব ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করেন প্রথম মহীপাল (৯৮৮—১০৩৮ খ্রীঃ)। তিনি বাংলা ও বিহারের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করিয়া পালরাজ্য পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ রাজেন্দ্র বাংলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। মহীপালের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর চোলবাহিনী দেশে ফিরিয়া যায়। বাংলাদেশে চোল প্রভুত্ব স্থাপিত হয় নাই। মহীপালের পর নয়পাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও দ্বিতীয় মহীপাল যথাক্রমে রাজত্ব করেন (১০৩৮—১০৭৫ খ্রীঃ)। দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে উত্তরবঙ্গে দিব্যর নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ ঘটে। মহীপালের অপশাসন এজন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। এই বিদ্রোহে মহীপাল নিহত হন।

পালরাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার

পালবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন রামপাল। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' পালরাজা রামপালের রাজত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান কীর্তি হইল কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন এবং উত্তরবঙ্গের কৈবর্তরাজ ভীমের ধ্বংসসাধন। তিনি উত্তরবঙ্গের রামবাটিতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। একে একে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র অঞ্চল তিনি নিজ শাসনাধীনে আনেন। কামরূপরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া রামপাল ঐ দেশ দখল করেন। তিনি উড়িষ্যার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজ প্রার্থীকে সিংহাসনে বসান। তাঁহার প্রধান শত্রু দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বাংলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের আনুকূল্যে বাংলায় সেনরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। উত্তর ভারতের গহড়বলীয় ও উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজগণ পাল সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানেন। রামপালের দুর্বল বংশধর কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপালের সময় (১১২০—১১৫৫ খ্রীঃ) এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

রামপাল

পালসাম্রাজ্যের পতন

সেনরাজগণ (The Senas): সেনবংশের প্রথম রাজা ছিলেন সামন্ত সেন।

বাংলায় চোল বা চালুক্য আক্রমণের সময় কর্ণাটক হইতে তিনি বাংলায় আসেন এবং পশ্চিমবঙ্গে পাল রাজাদের অধীনে সামন্ত রাজা হন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে পালবংশের পতন দেখা দিলে তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। হেমন্ত সেন সম্ভবতঃ স্বাধীন রাজা ছিলেন।

সেনবংশের প্রতিষ্ঠা

সেনবংশে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয় সেন। বাংলা তখন রাজনৈতিক দিক হইতে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ, গোড় বা উত্তরবঙ্গ এবং বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ। রাঢ় অঞ্চলের একজন ক্ষুদ্র নরপতি হিসাবে বিজয় সেন জীবন শুরু করিয়াছিলেন। পরে একে একে তিনি গোড় ও বঙ্গ দখল করিয়া লন। মিথিলার রাজা নান্যদেব এবং গোড়ের মদনপাল তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। পূর্ব-বঙ্গের শাসক বর্মন পরিবারের ভোজবর্মনকে পরাস্ত করিয়া বিজয় সেন বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ দখল করেন। বাংলা বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া তিনি একে একে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম, কলিঙ্গ ও উত্তর বিহার দখল করিয়াছিলেন। পাল রাজত্বের পর সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেন আবার বাংলার গোরব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। তাঁহার সময়ে দেশে শান্তি ছিল। উমাপতি ধরের 'দেওপাড়া প্রশস্তিতে' বিজয় সেনের রাজত্বকালের বর্ণনা আছে।

বিজয়সেন ঃ ১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ

বিজয়সেনের পর তাঁহার পুত্র বল্লালসেন সেনবংশের রাজা হন। তিনি দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সমাজ-সংস্কার কার্যাদির জন্য বিখ্যাত। সম্ভবতঃ বল্লালসেনের সময়ে মিথিলা ও মগধ বিজিত হয়। তিনি বাংলা ও উত্তর বিহারের উপর রাজত্ব করিতেন। রাজা বল্লালসেন ছিলেন পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ দুইখানি তাঁহার রচনা। তিনি হিন্দু সমাজের সংস্কার করিয়া কুলীন ব্যবস্থার পত্তন করিয়াছিলেন।

বল্লালসেন ১১৫৮-৭৮ খ্রীঃ

লক্ষ্মণসেন ছিলেন এই বংশের শেষ রাজা। তিনি নূতন কোন অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তবে উত্তর প্রদেশের গহড়বলীয় রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তিনি নিজ রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। উত্তর বিহার তাঁহার অধিকারে ছিল। নদীয়া ছিল তাঁহার রাজধানী। তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে অধীনস্থ সামন্ত রাজারা বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হয়। পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহের ফলে তাঁহার রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে (১২০২ খ্রীঃ) মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খল্‌জী রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করিলে লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে পলাইয়া যান। সমগ্র বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান অধিকারে চলিয়া যায়। পূর্ববঙ্গে সেন রাজাদের শাসন আরও কিছুকাল টিকিয়া ছিল বটে কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। সম্ভবতঃ ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন মারা যান। পিতার মত তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ধর্মে ছিলেন তিনি বৈষ্ণব।

লক্ষ্মণসেন ঃ ১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ

মুসলমান আক্রমণ ও সেনবংশের পতন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্য

বাদামীর চালুক্যরাজগণ (The Chalukyas of Badami) ঃ

খ্রীষ্টীয় ষষ্ট শতকের মধ্যভাগ হইতে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে পরাক্রমশালী চালুক্য বংশের রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল বর্তমান কর্ণাটকের বিজাপুর জেলার বাদামী বা বাতাপী নামক স্থানে। রাজধানীর নামানুযায়ী তাঁহারা বাদামীর চালুক্য নামে পরিচিত হন। এই বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ চালুক্যরা ছিলেন রাজপুতনার গুর্জর জাতির শাখা। আবার অনেকে তাঁহাদের স্থানীয় কানাড়ী ভাষী ক্ষত্রিয় পরিবার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে চালুক্য জয়সিংহ রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া এই বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তবে এই রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী। তিনি রাজধানীতে দুর্গ স্থাপন করিয়া ইহাকে সুরক্ষিত করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি 'মহারাজা' উপাধি নেন। চালুক্য বংশের পরবর্তী রাজা প্রথম কীর্তিবর্মন ও মঙ্গলেশ রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাদামী রাজ্যের চতুর্দিকে রাজ্য বিস্তার করেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্য কঙ্কনের মৌর্য, উত্তর কানাড়া বা বৈজয়ন্তীর কদম্ব, উত্তর মহারাষ্ট্রে বেলারি জেলার নল ও মালবের কলচুরীদের তাঁহারা পরাস্ত করিয়াছিলেন। কীর্তিবর্মন উত্তরে মগধ ও বঙ্গে অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দক্ষিণে চোল ও পাণ্ড্য রাজাদের রাজ্য আক্রমণ করা হয়। এই সমস্ত রাজ্যজয়ের ফলে চালুক্য সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে।

বংশ পরিচয়

চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা, প্রথম পুলকেশী ৩৩৫-৫৬৬

চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। তিনি যখন সিংহাসনে বসেন তখন চালুক্য বংশের ঘোর দুর্দিন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ছিল গৃহযুদ্ধ, বিদ্রোহ ও অরাজকতা আর বাহিরে বৈদেশিক আক্রমণ। পুলকেশী অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করিয়া দেশে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন। 'আইহোল শিলালিপিতে' পুলকেশীর যুদ্ধ জয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উত্তরে নর্মদা হইতে দক্ষিণ দিকে কাবেরী নদীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত ভুভাগ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। গঙ্গা, কদম্ব ও মৌর্য রাজাদের রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। গুজরাট ও মালব তিনি জয় করিয়াছিলেন। উত্তরে কনৌজের হর্ষবর্ধন তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই ছিলেন পরাক্রমশালী এবং ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। হর্ষবর্ধন দক্ষিণে অগ্রসর হইলে নর্মদা তীরে পুলকেশীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। পুলকেশী এই যুদ্ধে জয়ী হন। সম্ভবতঃ এই যুদ্ধের পর পুলকেশী কোশল ও কলিঙ্গ জয় করেন। পূর্ব দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের একাংশ জয় করিয়া তিনি নিজ ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনকে সেখানে প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত

দ্বিতীয় পুলকেশী ঃ ৬১০-৬৪২

করিয়াছিলেন। বিষ্ণুবর্ধনের বংশ পরবর্তীকালে বেঙ্গির চালুক্য বা পূর্ব চালুক্য বংশ নামে খ্যাত হয়। দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী অতিক্রম করিয়া পুলকেশী পল্লবদের রাজ্য আক্রমণ করেন। সুদূর দক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য ও কেরালা রাজ্যের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। পুলকেশী শুধু চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নন। শৌর্যে, বীর্যে ও সাংগঠনিক দক্ষতায় তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম। হিউয়েন সাঙ্ তাঁহার রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি চালুক্যরাজের প্রশংসা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বের শেষদিকে কাঞ্চীর পল্লব রাজাদের আক্রমণে চালুক্য সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। চালুক্য সম্রাট প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫—৬৮১) পল্লব রাজাদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া এই বংশের গৌরব ও সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের পর চারজন চালুক্য-রাজা বিনয়াদিত্য (৬৮১—৬৯৬), বিজয়াদিত্য (৬৯৬-৭৩৩), দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৩-৭৪৪) ও দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে চালুক্য সাম্রাজ্যের ক্রমশঃ অধঃপতন হয়। দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন ছিলেন এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, সুশাসনের অভাব এবং পল্লবদের ক্রমাগত আক্রমণে চালুক্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

শেষ চালুক্য সম্রাটগণ ও সাম্রাজ্যের পতন

রাষ্ট্রকূটগণ (The Rastrakutas):

অষ্টম শতকের মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে চালুক্য শক্তির পতনের পর তাহাদের অধীনস্থ রাষ্ট্রকূট বংশীয় প্রাদেশিক শাসক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এইভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রকূট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। রাষ্ট্রকূট বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক মত প্রচলিত আছে। অনেকের মতে রাষ্ট্রকূটরা ছিলেন স্থানীয় যাদব বংশের লোক। আবার কেহ কেহ মনে করেন তাঁহারা ছিলেন মহারাষ্ট্রের ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান। এই দ্বিতীয় মতই অধিকাংশ পণ্ডিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দন্তিদুর্গ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ৭৫০ হইতে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিয়াছিল। দন্তিদুর্গের পর প্রথম কৃষ্ণ (৭৫৮—৭৭৩), দ্বিতীয় গোবিন্দ (৭৭৩-৭৮০) ও ধ্রুব (৭৮০-৭৯৩) একে একে এই বংশের রাজা হন। ইঁহাদের আমলে রাষ্ট্রকূট শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমদিককার রাষ্ট্রকূট রাজারা বাদামী বা পশ্চিম চালুক্য ও বেঙ্গি বা পূর্ব চালুক্য রাজ্যের অবসান ঘটান। মহীশূরের গঙ্গা রাজ্য ও দক্ষিণ কঙ্কন প্রদেশ রাষ্ট্রকূটদের দখলে আসে।

রাষ্ট্রকূট শাসনের প্রতিষ্ঠা—বংশ পরিচয়

রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের অধীনে এই বংশ সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়। উত্তর ভারতে কনৌজ লইয়া ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রকূট শক্তি অল্পকালের জন্য সাফল্যলাভ করিয়াছিল। ধ্রুব প্রতিহাররাজ বৎসকে পরাস্ত করিয়া কনৌজ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। বাংলার পাল রাজা ধর্মপালও তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। তবে ধ্রুব উত্তর ভারতে তাঁহার অধিকার ও আধিপত্য স্থায়ী করিতে

ধ্রুব : ৭৮০-৭৯৩ খ্রীঃ

পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেন। উত্তরে প্রতিহার রাজ নাগভট্টকে তিনি পরাস্ত করিয়াছিলেন। রাজা ধর্মপাল এবং কনৌজে তাঁহার আশ্রিত রাজা চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূট রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এইসময়ে রাষ্ট্রকূটদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের রাজারা সংঘবদ্ধ হন। গোবিন্দ গঙ্গা, পল্লব, পাণ্ড্য ও কেরালা রাজ্যের সংঘ ধ্বংস করিয়া দেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করে। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত গোবিন্দের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কখনও পরাজয় বরণ করেন নাই।

তৃতীয় গোবিন্দ
৭৯৩-৮১৪ খ্রীঃ

তৃতীয় গোবিন্দের পর রাষ্ট্রকূট শক্তির উন্নতি ব্যাহত হয়। গোবিন্দের পুত্র অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে (৮১৪-৮৭৭) প্রাদেশিক শাসকগণ, বেঙ্গির চালুক্য ও মহীশূরের গঙ্গা রাজারা স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করেন। প্রতিহার বংশের রাজা ভোজ গুজরাট দখলের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৮৭৮-৯১৪) উত্তরে প্রতিহার ও দক্ষিণে চালুক্য আক্রমণ প্রতিহত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় প্রতিহাররাজ ভোজ মালব ও গুজরাট ছিনাইয়া লন। তবে দ্বিতীয় কৃষ্ণ বেঙ্গির চালুক্যরাজ ভীমকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের আমলে (৯১৪-৯২২) সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘটনা হইল প্রতিহাররাজ মহীপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও কনৌজ অধিকার।

পরবর্তী রাষ্ট্রকূট
রাজগণ

রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ। তিনি ছিলেন বীর ও কুশলী সেনানায়ক। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূট শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। তৃতীয় কৃষ্ণ দক্ষিণে পল্লব ও চোলদের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পাণ্ড্য ও কেরালা রাজ্য তাঁহার অধীনতা মানিয়া লয়। সুদূর সিংহলের রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। উত্তরে প্রতিহারদের সহিত তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সম্ভবতঃ মালব অঞ্চলে তাহাদের কয়েকটি প্রদেশ তিনি দখল করিয়া লইয়াছিলেন। কৃষ্ণের বংশধরদের অধীনে এই বংশের দ্রুত পতন ঘটিতে থাকে। রাষ্ট্রকূটদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা চালুক্য-বংশীয় দ্বিতীয় তৈলপ (Tailapa) ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ রাষ্ট্রকূট রাজা করকাকে (Karka) পরাস্ত করিয়া চালুক্য রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ণাটকের একেবারে উত্তরে অবস্থিত রাজধানীর নামানুযায়ী এই চালুক্য বংশ কল্যাণের চালুক্য নামে খ্যাত।

তৃতীয় কৃষ্ণঃ ৯৩৭-৯৬৭
খ্রীঃ রাষ্ট্রকূটদের পতন

কল্যাণের চালুক্যগণ—৯৭৩-১১৯০ঃ

কল্যাণের চালুক্যগণ কর্ণাটক অঞ্চলে দুইশত বৎসরের অধিককাল রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করিয়াছিলেন। চালুক্য শক্তির উত্থানের পর হইতে ইহা উত্তর ও দক্ষিণে দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়। উত্তরে মালব অঞ্চলে পরমারগণ (Paramaras)

এবং দক্ষিণে তাঞ্জোরের চোলগণ ছিলেন চালুক্যদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। চালুক্যরাজ আহবমল্ল চোল রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজ বংশের অধিকার ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য। তিনি চোল, বেঙ্গি ও হৈসল রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজ অধিকার বজায় রাখিয়াছিলেন। উত্তরে গুজরাট ও মালব অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার জন্য পশ্চিম ভারতে আরব আক্রমণ প্রতিহত হয়। কবি বিলহণ 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে' তাঁহার ব্যক্তিত্বের বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের দীর্ঘ রাজত্বকালে দেশে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। তিনি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি নূতন 'বিক্রমসম্বত' প্রচলন করেন। বিক্রমাদিত্যের রাজসভা কাব্য, সাহিত্য ও স্মৃতি চর্চার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বরের সময় হইতে কল্যাণের চালুক্য বংশের পতন শুরু হয়। ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ চালুক্য রাজ্য দেবগিরি, বরঙ্গল ও দারসমুদ্র এই তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কল্যাণের চালুক্যদের পতন হয়।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ঃ ১০৭৬-১১২৮ খ্রীঃ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
দক্ষিণ ভারত

পল্লব রাজগণ (The Pallavas) ঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ হইতে নবম শতকের মধ্যে পল্লব রাজবংশ দক্ষিণ ভারতে এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই যুগ তাঁহাদের অবদানে বিশেষ সমৃদ্ধ। উত্তরে কৃষ্ণা, দক্ষিণে কাবেরী, পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে কর্ণাটক ছিল তাঁহাদের রাজ্যসীমা। পল্লবদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুরম। অনেকের মতে দক্ষিণ ভারতের পল্লবগণ ছিলেন বিদেশী পহ্লব বা পারসিকদের বংশধর। বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক তাঁহাদের সাতবাহন রাজাদের অধীনে কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মধ্যবর্তী তোণ্ডমণ্ডলের ব্রাহ্মণ সামন্ত রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাতবাহন রাজত্বের অবসানের পর তাঁহারা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তবে ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সিংহবিষ্ণুর সিংহাসন আরোহণের পূর্বে পল্লবদের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বংশ পরিচয় ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সিংহবিষ্ণু ছিলেন প্রকৃতপক্ষে পল্লব রাজ্য ও গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার রাজত্বকালে পল্লবদের অধীনে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গৌরবময় যুগের শুরু হয়। তিনি 'চোলমণ্ডলম' জয় করিয়া নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। দুর্ধর্ষ কলভ্র (Kalabhras) জাতিকে পরাস্ত করিয়া কাবেরী পর্যন্ত তিনি রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। দক্ষিণের

সিংহবিষ্ণু ঃ ৫৭৫-৬০০ খ্রীঃ

তামিল দেশগুলি চোল, চের, পাণ্ড্য ও সিংহল তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। 'কিরাতার্জুনীয়ম' নাটকের লেখক ভারবি তাঁহার সভাকবি ছিলেন। সিংহবিষ্ণুর পরে তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মন পল্লবদের রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে একশত বৎসরের অধিককাল স্থায়ী চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। চালুক্যগণ পল্লবদের মিত্ররাজ্য কদম্বদের আক্রমণ করিলে এই শত্রুতার শুরু হয়। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজ্য আক্রমণ করিয়া উত্তরের বেঙ্গি প্রদেশ অধিকার করেন। পুলকেশীর ভ্রাতা বিষ্ণুবর্ধন বেঙ্গি প্রদেশের শাসনকর্তা হিসাবে পূর্ব চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রবর্মন চালুক্য আক্রমণ হইতে পল্লব রাজ্যের অন্যান্য অংশ রক্ষা করিতে সমর্থ হন। রাজা মহেন্দ্রবর্মনের সময়ে পল্লব রাজ্যে স্থাপত্য, শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি ঘটে।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ঃ
৬০০-৬৩০ খ্রীঃ

মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহবর্মনের সময়েও (৬৩০—৬৬৮ খ্রীঃ) পল্লব-চালুক্য দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। নরসিংহবর্মনের সময়ে পল্লব শক্তি উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। পর পর তিনটি যুদ্ধে তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। চালুক্য রাজধানী বাতাপি[১] দখল করিয়া নরসিংহবর্মন 'বাতাপিকোণ্ডন' বা বাতাপি বিজেতা উপাধি নেন। দক্ষিণে চোল, চের, কালভ্র ও পাণ্ড্যদের বিরুদ্ধে তিনি সামরিক অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। নৌবাহিনী পাঠাইয়া তিনি নিজ মনোনীত প্রার্থী মনোবর্মনকে সিংহলের সিংহাসনে স্থাপন করেন। নরসিংহবর্মন তাঁহার পিতার মত স্থাপত্য শিল্পের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অনেকগুলি মন্দির ও রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ্ কাঞ্চী পরিদর্শন করেন। তিনি পল্লব রাজধানী কাঞ্চীর প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা ছিল সেইযুগে দক্ষিণ ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধানকেন্দ্র।

প্রথম নরসিংহবর্মন
৬৩০-৬৬৮ খ্রীঃ

নরসিংহবর্মনের পর দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন পল্লবদের রাজা হন এবং মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের (৬৭০—৬৯৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালে চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পরমেশ্বর-বর্মন এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হন। পরবর্তী পল্লবরাজগণ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন (৬৯৫-৭২২) এবং দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন (৭২২-৭৩০) চালুক্য বংশের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যান। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য এই সময় পল্লব রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করিয়াছিলেন। পল্লব বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন দ্বিতীয় নন্দীবর্মন (৭৩০-৭৯৫ খ্রীঃ)। তাঁহার রাজত্বকালে উত্তরে রাষ্ট্রকূটগণ এবং দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজারা পল্লব রাজ্যের উপর ক্রমাগত

শেষ পল্লবরাজগণ

(১) চালুক্য রাজধানী বাদামী বা বাতাপি উভয় নামেই পরিচিত।

আক্রমণ চালাইতে থাকেন। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, চালুক্য রাজাদের দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রকূট ও পাণ্ড্য আক্রমণে পল্লব রাজত্বের অবসান হয়।

চোল রাজগণ (The Cholas) : দক্ষিণ ভারতের রাজবংশগুলির মধ্যে চোল বংশ সবচেয়ে প্রাচীন। অশোকের শিলালিপি, সিংহলী ইতিবৃত্ত 'মহাবংশ' ও মহাভারতে চোল রাজবংশের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে এই রাজবংশ দক্ষিণ ভারতে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। দ্বাদশ শতকের শেষপর্যন্ত চোল রাজাদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঞ্জোর ছিল চোল রাজাদের রাজধানী। দক্ষিণ ভারতে পল্লব আধিপত্যের অবসানের পর চোল প্রভুত্বের সূচনা হয়। প্রথম পরন্তক (৯০৭—৯৪৬ খ্রীঃ) ছিলেন চোল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রতিবেশী পাণ্ড্য রাজাকে পরাস্ত করেন এবং সিংহলে অভিযান পাঠান। তাঁহার পুত্র রাজাদিত্য রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ কর্তৃক পরাস্ত হন।

বংশপরিচয় ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা

চোলরাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন প্রথম রাজরাজ। তিনি ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি ও দিগ্বিজয়ী বীর। সামরিক প্রতিভাবলে তিনি দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। রাজত্বের প্রথমদিকে রাজরাজ পাণ্ড্য, চের ও পূর্ব চালুক্যদের বেঙ্গিরাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। পূর্ব কর্ণাটকের একাংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পশ্চিমে মালাবার উপকূল পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। কল্যাণের চালুক্যবংশীয় রাজা সত্যাশ্রয় তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। উত্তরে কলিঙ্গ জয় করিয়া রাজরাজ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সমুদ্রপথে অভিযান পাঠাইয়া তিনি সিংহল, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরে উড়িষ্যা হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা এবং পশ্চিমে মালাবার উপকূল হইতে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত চোল সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করে। প্রথম রাজরাজ শুধু দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক। তিনি দেশের সমস্ত জমি জরীপ করাইয়া উর্বরতা অনুসারে রাজস্ব ধার্য করিয়া দেন। 'সভা' ও 'সমিতির' মাধ্যমে তিনি গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন। শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক রাজরাজ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জনগণ সুখে ও সমৃদ্ধিতে বাস করিত। 'মহান রাজরাজ' উপাধি তাঁহার যোগ্য সম্মান।

প্রথম রাজরাজ : ৯৮৫-১০১৩ খ্রীঃ

মহামতি অশোক বা আকবরের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। চোল সম্রাট রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র তাঁহার পিতার ন্যায় যোগ্য ছিলেন। রাজেন্দ্র পিতার ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতি, দিগ্বিজয়ী বীর ও সুশাসক ছিলেন। তিনি উত্তরে কল্যাণের চালুক্য-বংশীয় রাজ্য, গন্ডোয়ানা রাজ্য ও উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। গুজরাট ও বাংলাদেশে তিনি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। দক্ষিণের পান্ড্য, চের ও কেরালা রাজ্যে তাঁহার সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করিয়াছিল। রাজ্যবিজয়ে তাঁহার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হইল সমুদ্রপারে চোল সাম্রাজ্যের

রাজেন্দ্র চোল : ১০১৩-১০৪৪ খ্রীঃ

অধিকার প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মদেশ, সিংহল, জাভা, মালয় ও সুমাত্রায় তিনি অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। এই সমস্ত দেশের রাজারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপেও সামরিক অভিযান পাঠান। অসাধারণ সামরিক ও রাজনৈতিক কৃতিত্বের জন্য রাজেন্দ্র 'উত্তম চোল' নামে খ্যাতিলাভ করেন। রাজেন্দ্র নিজে শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে অন্যান্য ধর্মের প্রতি তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল।

রাজেন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র প্রথম রাজাধিরাজ চোল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি উত্তরে পশ্চিমী চালুক্য ও দক্ষিণে পাণ্ড্য ও চের রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সিংহলেও সামরিক অভিযান পাঠান। সামরিক অভিযান সম্পূর্ণ করিয়া রাজাধিরাজ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহার মাধ্যমে তিনি তাঁহার সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী চালুক্যরাজের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। রাজাধিরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রাজেন্দ্রদেব চোলদের রাজা হন। রাজেন্দ্রদেব ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বিরাজেন্দ্র বা বীরকেশরী পশ্চিমী চালুক্যদের পরাস্ত করিতে সক্ষম হন। ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর চোল সাম্রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। পাণ্ড্য সামন্ত রাজারা চোলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই দুঃসময়ে পূর্ব চালুক্য বংশীয় রাজপুত্র প্রথম কোলতুঙ্গ চোল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। কোলতুঙ্গ দক্ষিণে পাণ্ড্যদের ও পশ্চিমে মালাবার উপকূলের সামন্ত রাজাদের পরাস্ত করিয়া সাম্রাজ্যের ঐক্য ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হন। সম্ভবতঃ তিনি কল্যাণের চালুক্যরাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আনুমানিক ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর চোল সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। পশ্চিমে হৈসল ও দক্ষিণে পাণ্ড্যদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার ক্ষমতা পরবর্তীকালের দুর্বল চোল রাজাদের ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের বিদ্রোহ ও পারিবারিক কলহ চোল সাম্রাজ্যের পতনকে নিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছিল।

শেষ চোলরাজগণ

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ—**(ক) কোন্ সময়ে ভারতে হূণ আক্রমণ ঘটে? (খ) দুইজন হূণ নেতার নাম কর? (গ) 'শিলাদিত্য' উপাধি কে ধারণ করিয়াছিলেন? (ঘ) রাজ্যশ্রী কে ছিলেন? (ঙ) মৌখরিগণ কোথায় রাজত্ব করিতেন? (চ) শশাঙ্ক কোথায় রাজত্ব করিতেন? (ছ) শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি? (জ) শশাঙ্কের সমসাময়িক কামরূপ রাজ্যের নাম কি? (ঝ) হিউয়েন সাঙ্ কখন ভারতে আসেন? (ঞ) 'মহামোক্ষপরিষদ' কি? (ট) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত? (ঠ) চালুক্যদের রাজধানী কোথায় ছিল? (ড) চালুক্যরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঢ) রাষ্ট্রকূটরা কোথায় রাজত্ব করিত? (ণ) পল্লবদের রাজধানী কোথায় ছিল? (ত) তাঞ্জোরে কাহাদের রাজধানী ছিল? (থ) পল্লব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা

কে ছিলেন ? (দ) হর্ষবর্ধন কোন্ বংশের লোক ছিলেন ? (ধ) বাংলার পালবংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ? (ন) রামপাল কে ছিলেন ? (প) 'রামচরিতের' রচয়িতা কে ? (ফ) সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ব) বল্লালসেনের রচিত দুইখানি গ্রন্থের নাম কর ? (ভ) তুর্কীরা যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করেন তখন এখানে কে রাজত্ব করিতেন ? (ম) কোন্ মুসলমান সেনাপতি বাংলাদেশ জয় করেন ?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**—(ক) গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের কার্যাবলীর বর্ণনা দাও। (খ) হর্ষবর্ধনের কৃতিত্বের পরিচয় দাও। (গ) হিউয়েন সাঙ্ এদেশের কিরূপ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন ? (ঘ) ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল ? (ঙ) সেনরাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজার রাজত্বকালের পরিচয় দাও। (চ) চালুক্যগণ কোথায় রাজত্ব করিতেন ? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার পরিচয় দাও। (ছ) রাষ্ট্রকূটদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ? তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর ঃ**—(ক) শাসক ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হর্ষবর্ধনের পরিচয় দাও। (খ) বাংলার পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ? তাঁহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (গ) ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে পল্লবদিগের অবদান আলোচনা কর। (ঘ) শ্রেষ্ঠ চোলরাজা রাজরাজ ও রাজেন্দ্রের সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিচয় দাও।

৪। **টীকা লিখ ঃ**—(ক) যশোধর্মন (খ) স্কন্দগুপ্ত (গ) দেবপাল (ঘ) বীটপাল ও ধীমান (ঙ) গ্রহবর্মা (চ) ভাস্করবর্মা (ছ) পাহাড়পুর।

৫। **ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ কর ঃ**— (ক) চালুক্য রাজ্য (খ প্রয়াগ (গ) থানেশ্বর (ঘ) কনৌজ (ঙ) ইন্দ্রপ্রস্থ (চ) তাম্রলিপ্ত (ছ) শ্রাবস্তী (জ) কলিঙ্গ (ঝ) কানরূপ।

৬। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**—(ক) থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন — কর্তৃক নিহত হন। (খ) মালবরাজ — ছিলেন গৌড়রাজ শশাঙ্কের বন্ধু। (গ) হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও —কর্তৃত্ব লাভ করেন। (ঘ) সম্রাট হর্ষবর্ধন চালুক্য রাজা — নিকট পরাস্ত হন। (ঙ) হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক — ভারতবর্ষে আসেন। (চ) রাষ্ট্রকূট — ও প্রতিহারদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। (ছ) পালরাজারা — ধর্মাবলম্বী ছিলেন। (জ) সেন রাজা বল্লালসেন দেশে — প্রথা প্রচলন করেন। (ঝ) পল্লবরাজা — ছিলেন পল্লব রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। (ঞ) চোলরাজা — বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। (ট) কল্যাণের চালুক্যদের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন —। (ঠ) বিলহণ রচিত — কল্যাণের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ — রাজত্বকালের পরিচয় পাওয়া যায়। (ড) প্রথম পরন্তক ছিলেন — সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

৭। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও ঃ**—(ক) মালব অঞ্চলে হূণ শক্তিকে বাধা দেন যশোধর্মন / যশোবর্মন। (খ) প্রভাকরবর্ধন থানেশ্বরের / কনৌজের রাজা ছিলেন। (গ) হর্ষচরিতের রচয়িতা শ্রীহর্ষ / বাণভট্ট। (ঘ) চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ছিলেন মহাযান / হীনয়ান বাদী।

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

(Social, economic and cultural life from the 7th to the 12th century A. D.)

উত্তর ভারত

খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতের সমাজজীবনের ভিত্তি ছিল চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম। বৈদিক যুগের বৃত্তিভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা ক্রমশঃ সমাজে চারিটি পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের লইয়া গঠিত সমাজে বর্ণ পরিবর্তন ঘটিত না। তবে নূতন নূতন বৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। এগুলি হইল শিল্পী, কারিগর, তন্তুবায়, মৎস্যজীবী, শিকারী প্রভৃতি। চতুরাশ্রমের নিয়ম-রীতি সমাজে পালন করা হইত। বাংলাদেশের সমাজ-বিন্যাসে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে বর্ণ বা জাতি মোট দুইটি—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।

সমাজ

হিন্দু সমাজের অপর দুইটি বর্ণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। উত্তর ভারতের সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য দেখা যায়। এই যুগে সমাজে ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা ও প্রাধান্য দুইই কম। বিদেশী আগন্তুকরা হূণ, শক, পহ্লবগণ নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিত। রাজপুত জাতিগুলির মধ্যে অনেক বিদেশীরা মিশিয়া যায়। এই পর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি হওয়ায় সমাজে বৈশ্যদের প্রাধান্য কমিয়া যায়। সমাজে বৈশ্যদের পরেই ছিল শূদ্রদের স্থান। পূর্ব ভারতের সমাজে শূদ্রদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকলেই শূদ্র। শূদ্রদের নীচে ছিল অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ জাতি ও আদিবাসী। ইহারা হইল পুক্কশ, পুলিন্দ, খস, থর, কম্বোজ, যবন, শবর, চণ্ডাল, চর্মকার প্রভৃতি। চণ্ডালরা সাধারণতঃ গ্রাম ও নগরের বাহিরে বাস করিত। যবন ও চণ্ডালরা অস্পৃশ্য ও অশুদ্ধ জাতি বলিয়া গণ্য হইত। সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যে চীনা লেখকদের রচনায় এবং আলবিরুণীর গ্রন্থে অস্পৃশ্য ও অশুদ্ধ জাতির উল্লেখ আছে। সমকালীন লেখ ও লিপিগুলিতে উৎকীর্ণ তথ্য হইতে জানা যায় যে রাজাদের অন্যতম কর্তব্য ছিল সমাজে চতুর্বর্ণকে রক্ষা এবং সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখা। উত্তর ভারতের সমাজে বৌদ্ধদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। পালযুগে রাজারা বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। পূর্ববর্তী যুগের সহিত তুলনায় এই যুগে সমাজে কঠোর বর্ণ-ভিত্তিক বৃত্তি বিভাগ ছিল না। এই যুগে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের লোকেদের সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করিতে দেখা যায়। ক্ষত্রিয়রা অনেকে বাণিজ্য করিত। বৈশ্য ও শূদ্ররা রাজ্যস্থাপন করিয়া রাজত্ব করিত। সমকালীন দেশী ও বিদেশী সাক্ষ্য হইতে জানা যায় দেশে দাসপ্রথা ছিল। বেগার শ্রমিক প্রথাও একেবারে অজানা ছিল না।

পরিবার ছিল এযুগে সমাজের ভিত্তি। পরিবারের প্রধান বা কর্তা পরিবারের সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। সাধারণতঃ একপত্নী গ্রহণই নিয়ম ছিল। তবে অভিজাতরা একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতেন। সবর্ণ বিবাহ ছিল প্রচলিত নিয়ম। তবে অসবর্ণ বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইত। সমাজে বৈধব্য ও সহমরণ ব্যবস্থা চালু ছিল। সেনযুগে বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন হয় এবং জাতিভেদ প্রথা কঠোর হয়। শিকার, পাশা, দাবা খেলা ও নৃত্যগীতে মানুষের অবসর সময় কাটিত। পূজা ও পার্বনে জনসাধারণ আনন্দ করিত। এই যুগে সমাজে নারীজাতির অবস্থায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর মহিলারা প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেন। সমকালীন সাহিত্য হইতে জানা যায় যে রানীমাতারা নাবালক শিশুপুত্রের অভিভাবিকা হিসাবে রাজ্যশাসন করিতেন। কাশ্মীর, উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশে রানীমাতারা দেশশাসন করিয়াছিলেন। দক্ষিণের কানাড়ী-ভাষী অঞ্চলগুলিতে মহিলারা প্রাদেশিক গভর্ণর বা গ্রাম-প্রধান হিসাবেও কাজ করিতেন। দেশে পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল না। মহিলারা প্রকাশ্যে রাজসভায় আসন গ্রহণ করিতেন। উচ্চশ্রেণীর মহিলারা শিক্ষা লাভ করিতেন এবং এই যুগের সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন।

অর্থনীতি এযুগে উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক জীবন ছিল মূলতঃ কৃষিনির্ভর। জমি রাজা বা রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজা জমি ছাড়াও খনি, বন, বাণিজ্যকেন্দ্র ইত্যাদি হইতে কর আদায় করিতেন। উত্তর ভারতের পাল, সেন, চান্দেল্ল ও গঙ্গাবংশীয় রাজারা রাজকর্মচারী, ব্রাহ্মণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জমি দান করিতেন। ব্যাপক ভূমিদান ব্যবস্থার ফলে দেশে ধীরে ধীরে সামন্তব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। রাষ্ট্র ও কৃষকের মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব হয়। বলাবাহুল্য দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ইহা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

কৃষি কৃষি ছিল অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা। এই যুগের শেষদিকে কৃষকদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে। সমসাময়িক তথ্য হইতে এইরকম ধারণা করা যায়। কৃষির তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই অথচ লোকসংখ্যা ও করভার দুইই বাড়িয়াছিল।

শিল্প এযুগে শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কার্পাসবস্ত্র প্রধান। দেশে রেশম ও রেশমবস্ত্র উৎপন্ন হইত। অন্যান্য কারুশিল্পও নেহাত কম ছিল না। মাটি, লৌহ, চর্ম ও কাঠের নানাদ্রব্য তৈয়ারী হইত। সোনা ও রূপার অলঙ্কার ও তৈজসপত্র নির্মাণে কারিগররা নিযুক্ত ছিল। মিনহাজ-উস-সিরাজ লিখিয়াছেন[১] যে, রাজা লক্ষ্মণসেন সোনা-রূপার বাসনে আহার করিতেন। এইযুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ক্রমাবনতি দেখা দেয়। পশ্চিমে বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর

(১) মিনহাজ-উস-সিরাজ—'তবাকৎ ই-নাসিরী'।

পরে বাংলার তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবনতি ঘটে। এই বন্দর মারফত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত বাণিজ্য চলিত। বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতির প্রমাণ হইল দেশে সোনা-রূপার মুদ্রার অভাব। পালযুগে শুধু রূপার মুদ্রা চালু ছিল। কোন সোনার মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। মিনহাজ লিখিয়াছেন সেনযুগে দেশে রূপার মুদ্রা ছিল না। কড়িই ছিল লেনদেনের মাধ্যম। কৃষিভিত্তিক এই যুগের অর্থনীতি ছিল মূলতঃ গ্রামকেন্দ্রিক। এই পর্বের শেষদিকে সারা উত্তর ভারতে নূতন নূতন নগর গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই নগরগুলি ছিল তীর্থস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র, রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। কাশী, বিক্রমশীলা, মগধ ও তাম্রলিপ্ত এইরূপ নগরের নিদর্শন।

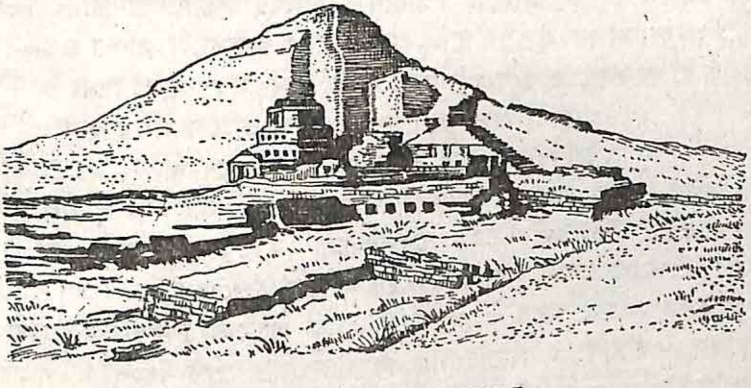
বাণিজ্য

এই যুগে উত্তর ভারতে প্রচলিত তিনটি প্রধান ধর্ম হইল হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন। হিন্দুদের জীবনে বৈদিকধর্ম ও সংস্কার আরও বিস্তৃত ও দৃঢ় হয়। স্মৃতিগ্রন্থগুলি এই যুগে রচিত হইয়াছিল। পূর্ব ভারতে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়। সারা ভারতে হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব ও শৈবদের সংখ্যা ও প্রভাব দুইই বাড়িতে থাকে। পূর্ব ভারতে শক্তি উপাসনা জনপ্রিয় হয়। এই অঞ্চলে মাতৃমূর্তি পূজা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে থাকে। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তবে তাঁহারা যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যে নানা মত ও শাখার উদ্ভব হয়। লৌকিক আচার আচরণকে আত্মসাৎ করিবার ফলে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান প্রভৃতি মতের প্রচলন ঘটে। জৈনগণ হিন্দুদের দেবদেবীকে গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্মের একটি শাখায় পরিণত হন।

উত্তর ভারতের সংস্কৃতি : ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প

ধর্ম

পাল ও সেন রাজারা ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। সেনবংশীয়

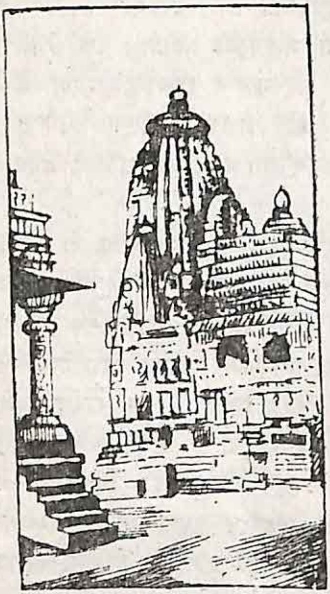


নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ

রাজা বল্লালসেন ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ও লেখক। পাল রাজাদের আমলে বিক্রমশীলা, নালন্দা, ওদন্তপুরী ও সোমপুর ছিল বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চা ও

শিক্ষার কেন্দ্র। মহাপণ্ডিত শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, রাহুলভদ্র, শান্তিপাদ, মহাস্থবিরবুদ্ধি জ্ঞানপাদ প্রভৃতি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিব্বতে গিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্তী দেশ চীন, তিব্বত ও নেপাল হইতে ছাত্ররা এই সমস্ত শিক্ষালয়ে পড়িতে আসিত। এই যুগে সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত ও প্রাকৃত। বাংলায় চর্যাপদগুলি এই সময়ে রচিত হয়। পালযুগে রামচরিতকার সন্ধ্যাকর নন্দী, ধর্ম ও স্মৃতি শাস্ত্রের পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট, চিকিৎসা-শাস্ত্রে চক্রপাণি ও স্মৃতিশাস্ত্রে জীমূতবাহন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। সেনযুগেও সাহিত্যচর্চা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ অব্যাহত ছিল। রাজা বল্লালসেন চারিখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এযুগে কবি জয়দেব তাঁহার সুবিখ্যাত 'গীতগোবিন্দম্' রচনা করেন। এই গ্রন্থের ভাব, ব্যঞ্জনা, ভাষা ও ছন্দ লক্ষ লক্ষ মানুষকে বহুকাল ধরিয়া আনন্দ দান করিতেছে। সেনযুগে ধোয়ী, হলায়ুধ, শরণ ও উমাপতিধর কাব্য রচনা করিয়া রসিকজনকে আনন্দ দেন।

শিক্ষা ও সাহিত্য



খাজুরাহোর মহাদেব মন্দির

এযুগে উত্তর ভারতের একটি নিজস্ব শিল্প-রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার পাল ও সেনরাজগণ, মধ্য-ভারতের চান্দেল্লগণ ও উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজগণ শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। উড়িষ্যার অনবদ্য মন্দির ও মূর্তিগুলি, মধ্যভারতের খাজুরাহো মন্দির ও রাজস্থানের দিলওয়ারা মন্দির এযুগের স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সূক্ষ্ম শিখর ও মন্দির-গাত্রে অলঙ্করণ ও নক্সার কাজ উত্তর ভারতের মন্দির স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাল রাজাদের নির্মিত অনেক বিহার ও স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। পাল রাজাদের সময়ে নির্মিত পাহাড়পুরের মন্দিরের মূর্তিগুলি, কোনারকের সূর্যমন্দিরের মূর্তি, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ ও রাজারানী মন্দিরের ভাস্কর্য এবং খাজুরাহোর মহাদেব মন্দিরের মূর্তি শিল্প রসিকদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া থাকে। বলাবাহুল্য, ধর্ম এযুগের শিল্পচর্চায় প্রেরণা দান করিয়াছিল। ধীমান ও বীটপাল ছিলেন পালযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। পালযুগের চিত্রকলায় ভাব ও কল্পনার বিস্তার ও গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। গুপ্তযুগের শিল্প-ঐতিহ্য এযুগের শিল্প-রীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

শিল্প

দক্ষিণ ভারত ঃ

নর্মদা নদী ও বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ হইতে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল দক্ষিণ ভারত। প্রাচীনকালে এই স্থানে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা দ্রাবিড় সভ্যতা নামে পরিচিত। উত্তর ভারতের সভ্যতার সহিত অনেক বিষয়ে এই সভ্যতার বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মৌর্যযুগ হইতে উত্তর ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই অঞ্চলে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে থাকে। সাতবাহন রাজাদের সময় (খ্রীঃ পূঃ ৭৩—২১৮ খ্রীঃ) উত্তর ভারতের আর্যসভ্যতা দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ভারতের অনুকরণে সমাজে চারিবর্ণের—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—উদ্ভব হয়। পুরাণ ও শিলালেখ হইতে জানা যায় আদর্শ বর্ণবিভাগ ছাড়াও সমাজ বৃত্তির ভিত্তিতে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন মহারথী, মহাভোজ ও মহাসেনাধিপতি। ইঁহারা ছিলেন সমাজে সর্বোচ্চ শ্রেণী এবং সমস্ত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন অমাত্য, মহামাত্র, ভাণ্ডগরিক প্রভৃতি রাজকর্মচারী এবং নৈগম (বণিক), স্বার্থবহ (বণিকগোষ্ঠীর প্রধান) প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের নাগরিকরা। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন লেখক, বৈদ্য, কৃষক ও স্বর্ণকার। চতুর্থ শ্রেণীতে ছিলেন সূত্রধর, মালাকার, কর্মকার ও মৎসজীবী। কৃষক ও বণিকদের লইয়া গঠিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে ছিল অনেকগুলি 'কুল' ও 'গৃহ' বা গোষ্ঠী। ইহাদের প্রধানকে কুলপতি বা গৃহপতি বলা হইত। গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের উপর ইঁহারা কর্তৃত্ব করিতেন। উত্তর ভারতের মত দক্ষিণ ভারতে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বাল্য বিবাহ ও সহমরণ সমাজে প্রশংসা পাইত। এযুগে স্ত্রীলোকেরা সমাজে ক্রমশঃ সম্মানের স্থান গ্রহণ করিতে থাকেন। শিল্পকলা, শিক্ষা ও সঙ্গীতে নারীদের পারদর্শিতা দেখা যায়। উত্তর ভারতের মত রাষ্ট্র ও সমাজে ব্রাহ্মণরা ছিলেন প্রতিপত্তিশালী। ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর সকলেই মাছ ও মাংস গ্রহণ করিত।

সমাজ

উত্তর ভারতের মত দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কৃষি-নির্ভর ও গ্রাম-কেন্দ্রিক। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ছিল অর্থনৈতিক জীবনের তিনটি প্রধান অঙ্গ। দেশের সমস্ত জমি রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইত। তিনি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিষ্কর ভূমি দান করিতেন। চোল রাজারা দেশের জমি জরীপ করাইয়া উৎপন্ন ফসলের একাংশ রাজস্ব ধার্য করিয়া দেন। জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী রাজস্ব ধার্য করা হইত। দক্ষিণ ভারতের সহিত পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি এবং সিংহল, ব্রহ্মদেশ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য চলিত। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দক্ষিণ ভারতে ধনী বণিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইঁহারা বিভিন্ন সঙ্ঘের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এযুগে দক্ষিণ ভারতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও বেশ লাভজনক ছিল। ইহার ফলে সমাজে বণিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ

অর্থনীতি

ভারতের শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প ও বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার ও তৈজসপত্র নির্মাণ শিল্প ছিল প্রধান। শিল্পী ও কারিগরদের নিজস্ব সংঘ ছিল। এই সংঘগুলি ছিল স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠান। দক্ষিণ-ভারতের চোল রাজাদের সময়কার প্রাপ্ত তথ্য হইতে জানা যায় ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের আয় ও জীবন যাত্রায় বিস্তর ফারাক ছিল। একটি উচ্চশ্রেণীর পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল ষোল টাকা। আর নিম্নশ্রেণীর পরিবারগুলির মাসিক গড় আয় দাঁড়াইত আট টাকা। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে মাসিক আয় অনুপাতে ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আর্থ-সামাজিক কাঠামোর দুই প্রান্তে অবস্থান করিতেন।

উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতে চালুক্য, রাষ্ট্রকুট, পল্লব ও চোল রাজাদের অধীনে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পের অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজারা হিন্দু ছিলেন। ইঁহারা প্রধানত বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা করিতেন। অনেকে ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তবে ইহাঁরা সকলেই ধর্মের ব্যাপারে ছিলেন সহনশীল ও উদার-নীতির পক্ষপাতী। ইঁহাদের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের ধর্মীয় জীবন যাপন করিতেন। রাজারা বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের জন্য স্তূপ ও গুহা নির্মাণ করিয়া দেন। দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্মের নবজাগরণে কুমারিলভট্ট, শংকরাচার্য, রামানুজ ও বাসবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শংকরাচার্য ছিলেন অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। ব্রহ্ম এক ও সত্য—জগৎ মিথ্যা—এই অদ্বৈতবাদ তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। রামানুজ ছিলেন বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তিবাদের প্রচারক। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'শ্রীসম্প্রদায়' নামে পরিচিত।

সংস্কৃতি—ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প

এযুগে দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হইত। স্থানীয় তামিল, কানাড়ী ও তেলেগু ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হয়। উচ্চতর ভাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা ছিল সংস্কৃত। পল্লব রাজধানী কাঞ্চী ও চোল রাজধানী তাঞ্জোর সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র ছিল। কুমারিলভট্ট, শংকরাচার্য ও রামানুজ সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের দর্শন ও ধর্মমত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ ভাস্করাচার্য, মহাকবি ভারবি, কাব্যদর্শনের লেখক দণ্ডী, কবি বিলহন ও স্মৃতিকার বিজ্ঞানেশ্বর দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য ও বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখেন। রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষ ছিলেন একজন কবি। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। মধ্যপ্রদেশের ধর রাজ্যের রাজা ভোজ এবং কল্যাণের রাজা তৃতীয় সোমেশ্বর সাহিত্যিক ও পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। জিনসেন, মহাবীরাচার্য, শক্তায়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রাষ্ট্রকূট রাজাদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন।

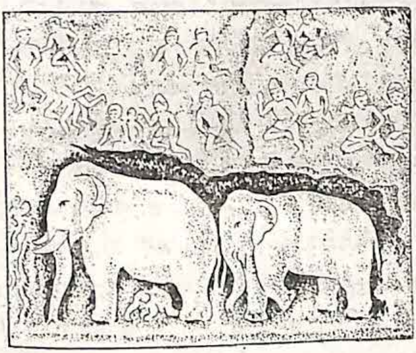
সাহিত্য ও বিজ্ঞান

চালুক্য, রাষ্ট্রকুট, পল্লব ও চোল রাজাদের অধীনে দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পের সুবর্ণ যুগের শুরু হয়। চালুক্য রাজাদের অধীনে অজন্তার গুহাচিত্র ও এ্যালিফ্যাণ্টার গুহামন্দির নির্মিত হয়। অনেকগুলি শিব ও বিষ্ণু মন্দির তাঁহাদের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকুটদের সময়ে ইলোরার সুবিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির

প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্প রসিকদের মতে এই মন্দিরের শিল্পকাজ অসাধারণ ও বিস্ময়কর। পাহাড় কাটিয়া মন্দির নির্মাণের রীতি পল্লব রাজগণ চালু করিয়াছিলেন। পল্লব রাজাদের আমলে নির্মিত মহাবলীপুরমের সপ্তরথ মন্দির ও কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির পল্লব শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চোল রাজারা বিশাল আকৃতির মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। সমস্ত মন্দির নক্সাদ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

শিল্প

চোল রাজরাজের রাজরাজেশ্বর মন্দির, গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম নগরী, প্রাসাদ ও মন্দির চোল শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দুইটি। ধাপে ধাপে পাথর কাটিয়া রথের আকারে



পর্বতগাত্রে খোদিত ভাস্কর্য (মহাবলীপুরম)



নটরাজ

মন্দির নির্মাণ। আর মন্দির গাত্রে পুরাণ বা মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে চিত্র খোদাই ও নানা ধরনের নক্সার কাজ। এখানকার মন্দিরে স্তম্ভের প্রাধান্য, উত্তর ভারতের মন্দিরে স্তম্ভ নাই। চোল আমলে নির্মিত নৃত্যরত শিবের নটরাজ মূর্তি ভাব, ভঙ্গী ও ব্যঞ্জনায় বিশ্বের শিল্প রসিকদের প্রশংসা কুড়াইয়াছে। শিল্প জাতীয় মানসিকতার প্রতিফলন। বলা বাহুল্য, ভারতের উন্নত, সূক্ষ্ম ও সুষমামণ্ডিত শিল্প ভারতবাসীর পরিশীলিত মন, রুচি ও শিল্প বোধের পরিচয় বহন করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বহির্বিশ্বের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

(Commercial and cultural contacts with the outside world)

সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের সহিত তাহার প্রতিবেশী দেশগুলির বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। প্রাগৈতিহাসিক হরপ্পা সভ্যতার যুগে পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ার সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় ও আর্যগণ বিদেশ হইতে এখানে আসেন। সুতরাং বলা যায় ভারত কখনও বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে নাই। ঐতিহাসিককালে বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। ভারতের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দেশগুলির সহিত সম্পর্ক আরও গভীর হয়। প্রাচীনকালে পশ্চিমে ব্যাবিলন, সিরিয়া, মিশর ও ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস' (Periplus of the Erythraean sea) গ্রন্থে এই বাণিজ্য, ভারতীয় বন্দরসমূহ ও বাণিজ্যপণ্যের উল্লেখ আছে। এদেশ হইতে মণিমুক্তা, মূল্যবান পাথর, সুগন্ধি দ্রব্য, মসলা ও মস্‌লিন বস্ত্র প্রভৃতি পশ্চিমের দেশগুলিতে পাঠানো হইত। পশ্চিমের দেশগুলিতে এই সমস্ত পণ্যের বেশ ভাল চাহিদা ছিল। রোমান লেখক প্লিনি এই বাণিজ্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্যের ফলে প্রচুর রোমান স্বর্ণমুদ্রা ভারতে আসিত। প্লিনির মতে রোমান সাম্রাজ্যের সহিত বাণিজ্যের ফলে ভারত লাভবান হইত। প্লিনি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে রোম-ভারত বাণিজ্যের ফলে প্রতি বৎসর দশ লক্ষাধিক রোমান স্বর্ণমুদ্রা ভারতে চলিয়া যাইত। ভারত হইতে অন্ততঃ সাতবার রোমান সম্রাটগণের নিকট দূত পাঠানো হইয়াছিল। দুই পথে এই বাণিজ্য চলিত। আরব ও লোহিত সাগর হইয়া মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর এবং সেখান হইতে জল ও স্থল পথে ইউরোপ। আবার স্থলপথে পারস্য, ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যদিয়া এশিয়া মাইনর ও ইউরোপে পণ্য রপ্তানি চলিত। সিরিয়া ভারত-ইউরোপ বাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আরবদের উত্থানের পর ভারতের সহিত পশ্চিমী দেশগুলির বাণিজ্য আরব বণিকদের হাতে চলিয়া যায়।

পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপ

বাণিজ্য

বাণিজ্যের পথ ধরিয়া ধর্ম, সভ্যতা সংস্কৃতির বিস্তার হয়। এই পথ ধরিয়াই পশ্চিমদেশে ভারতীয় ধর্মের প্রচার ঘটে। বাণিজ্য পথ ধরিয়াই সম্রাট অশোক পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ধর্ম প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। অনুমান করা যাইতে পারে এই সমস্ত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। অশোকের

অনেক পরে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখা যায়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পশ্চিম এশিয়ার অনেক দেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচলন ছিল। পশ্চিমের দেশগুলিতে ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য অজানা ছিল না। পশ্চিমী সভ্যতাও ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রোমান ও গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞান, শিল্প ও মুদ্রা ব্যবস্থা এই দেশের মানুষের আয়ত্ত হয়। আরব বণিকগণ ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত পরিচিত হন এবং ভারতীয় পণ্যের সহিত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পশ্চিমে লইয়া যান। ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র এইভাবে ইউরোপে রপ্তানী হয়।

ধর্মের মাধ্যমে যোগাযোগ

মধ্য এশিয়ায় ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক অপেক্ষা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল অধিক শক্তিশালী। কাস্পিয়ান সাগর হইতে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের অর্ধ-সভ্য যাযাবর জাতিগুলি কুষাণযুগে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয় লয়। খোটান ও কাশগড় অঞ্চলে অরেল স্টাইনের (Stein) খননকার্যের ফলে ভারতীয় সভ্যতার অজস্র নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠ, বুদ্ধ ও দেবদেবীর মূর্তি ও ভারতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। স্টাইন লিখিয়াছেন যে আবিষ্কৃত নগরের মধ্যদিয়া যাইবার সময় তাঁহার মনে হইত তিনি পাঞ্জাবের কোন শহরের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ্ এই পথ ধরিয়া ভারতে যাতায়াত করিয়াছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করেন। মধ্য এশিয়া হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। জল ও স্থল পথে চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বুদ্ধের মূর্তি সংগ্রহের জন্য ভারতে আসিতেন। অনেকে নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃত ও পালিভাষা শেখেন। অনেক ভারতীয় পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারক আমন্ত্রিত হইয়া চীনদেশে গিয়াছিলেন। ইঁহারা অনেকে বৌদ্ধশাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতীয় সঙ্গীত, চিকিৎসাশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্র চীনদেশে সমাদর পায়। ধর্ম সম্পর্ক ছাড়াও চীনদেশের সহিত ভারতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সমুদ্রপথে চীনদেশের সহিত নিয়মিত বাণিজ্য চলিত। চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়ায় এবং কোরিয়া হইতে জাপানে প্রচারিত হয়। এই দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্ম আজও জীবন ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে বহাল রহিয়াছে।

মধ্য এশিয়া

তিব্বতের সহিত ভারতের সম্পর্ক খুব প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তিব্বতরাজ স্রং-সান-গাম্পো (Srong-tsan Gampo) মহাযান বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রচার করেন। এই সময় হইতে তিব্বতের সহিত ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। তিব্বতী বৌদ্ধগণ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র-চর্চার জন্য ভারতে আসেন। পালরাজারা বৌদ্ধধর্ম সংস্কার ও প্রচারের জন্য প্রখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে পাঠান। পাল সাম্রাজ্য ও তিব্বতের মধ্যে

তিব্বত

খুব ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। বৌদ্ধধর্মের অনেক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। 'তঞ্জুর' ও 'কঞ্জুর' ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয় উপদ্বীপ ইন্দোচীন, সুমাত্রা, বোর্নিও, জাভা ও বলীদ্বীপ সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত। এই অঞ্চল মসলা ও খনিজ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। ভারতের পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলি হইতে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়া ভারতের পণ্যবাহী জাহাজগুলি এই অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে আসিত। 'পেরিপ্লাস', বৌদ্ধজাতক ও টলেমির লেখায় সুবর্ণভূমির সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। বাণিজ্যের পথ ধরিয়া সুবর্ণভূমিতে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া — সুবর্ণভূমি

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে এই অঞ্চলে যেসব রাজাদের নাম পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই ভারতীয়। ইঁহাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি সবই ভারতীয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া (কাম্পুচিয়া), আনাম (ভিয়েতনাম) ও বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা, জাভা, বলী ও বোর্নিওতে এরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত দেশের রাজারা ধর্মে ছিলেন শৈব ও বৈষ্ণব, তবে বৌদ্ধধর্ম একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। এ অঞ্চলের স্থানীয় সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে এক নূতন সংস্কৃতির জন্ম হয়। তবে এই মিশ্র সংস্কৃতিতে ভারতীয় ধর্ম, ঐতিহ্য, ভাষা, শিল্প, আচার-আচরণ রীতি-নীতির প্রভাব অত্যন্ত প্রকট।

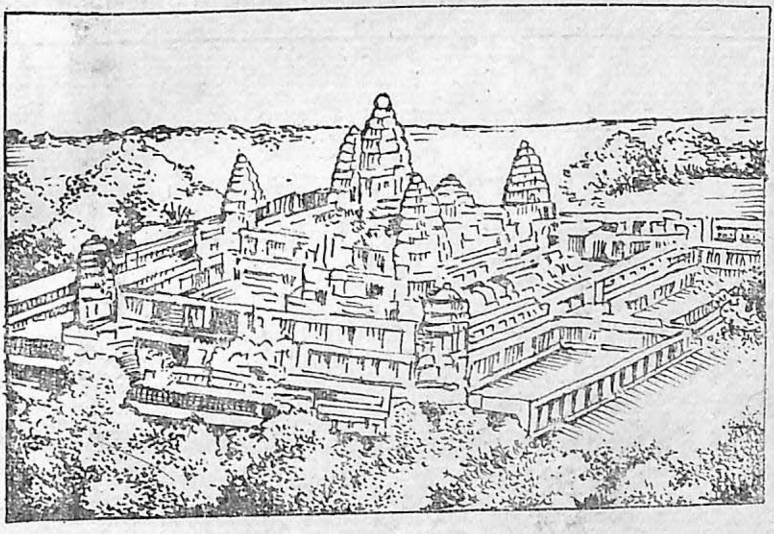
চীনা লেখকদের রচনা এবং এই অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলি হইতে জানা যায় ইন্দোচীনে এই রকম দুইটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।[১] ইহারা হইল চম্পা ও কম্বোজ। দ্বিতীয় শতকে প্রতিষ্ঠিত চম্পা রাজ্যটি ছিল বর্তমান ভিয়েতনামে। বর্মন উপাধিধারী এই রাজ্যের রাজারা ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী। কম্বোজ ও মোঙ্গল আক্রমণ হইতে বর্মন রাজারা নিজেদের দেশকে রক্ষা করেন। জয় পরমেশ্বর বর্মদেব ঈশ্বরমূর্তি, রুদ্রবর্মন, হরিবর্মন, মহারাজাধিরাজ শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মন প্রভৃতি ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। দীর্ঘ তেরশত বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিবার পর পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে আনামী ও মোঙ্গলদের আক্রমণে এই রাজ্যের পতন ঘটে।

চম্পা ও কম্বোজ রাজ্য

চম্পা রাজ্যে অনেক সুন্দর নগরী, হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধ মঠ ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে এই অঞ্চলের অপর হিন্দুরাজ্য কম্বোজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যের চীনা নাম ফু-নান। কিংবদন্তী অনুযায়ী কৌণ্ডিণ্য নামে এক ব্যক্তি এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্তমান কাম্পুচিয়ার দক্ষিণে ইহা অবস্থিত ছিল। এখানকার রাজারা চীনদেশ ও ভারতে দূত পাঠান। কম্বোজের শক্তিশালী রাজারা প্রতিবেশী দেশগুলি দখল করিয়া এক বিশাল রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। কাম্পুচিয়া ছাড়া কোচিন-চীন (ভিয়েতনামের দক্ষিণ অংশ), লাওস, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপের কিছু অংশ কম্বোজের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(১) ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়া লইয়া ইন্দোচীন গঠিত।

প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম জয়বর্মন, যশোবর্মন ও দ্বিতীয় সূর্যবর্মন ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। পঞ্চদশ শতকে চম্পার মত আনামী ও থাইদের আক্রমণে এ রাজ্যের পতন ঘটে। কম্বোজের রাজারা ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। এই



আঙ্করভাট মন্দির (কাম্পুচিয়া)

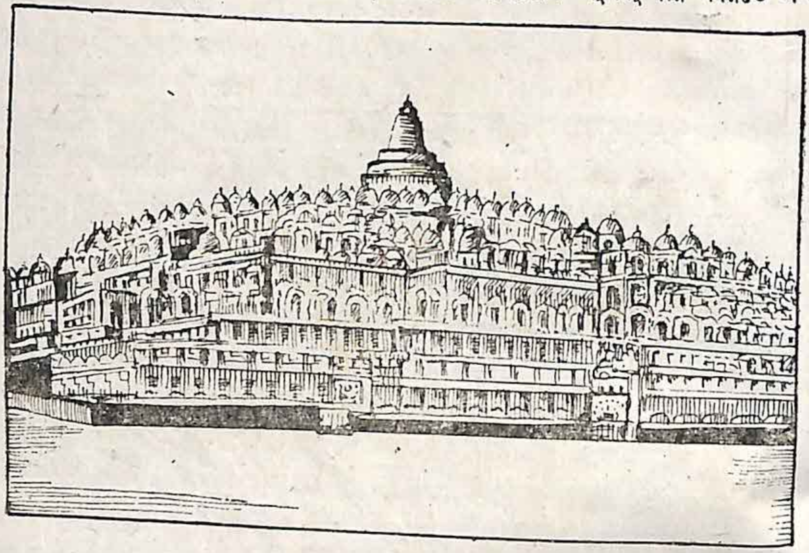
বংশের রাজা সূর্যবর্মন আঙ্করভাট নামে এক বিশাল বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেন। রাজা সপ্তম জয়বর্মন আঙ্করথম নগরী ও মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে বিশ্বের রসিকজনের স্বীকৃতি পাইয়াছে।

অষ্টম শতকে মালয় উপদ্বীপ ও বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ লইয়া শৈলেন্দ্র বংশের অধীনে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। শৈলেন্দ্র রাজাদের প্রভূত অর্থ ও নৌবল ছিল। আরব বণিকগণ তাহাদের রাজ্যে ব্যবসা করিত। আরব বণিকদের বিবরণী হইতে শৈলেন্দ্র রাজাদের অর্থ, নৌবল ও ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের প্রথমদিকে আরব বণিক ইবন রসতে (Rosteh) লিখিয়াছেন যে শৈলেন্দ্রবংশীয় 'মহারাজা অপেক্ষা ধনী বা পরাক্রমশালী রাজা দেখা যায় না'। (No other king is richer and more powerful than he, and none has more revenue)। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের উপাধি ছিল 'মহারাজা'। এই রাজারা ধর্মে ছিলেন মহাযানবাদী বৌদ্ধ। ভারত ও চীনদেশের রাজারা শৈলেন্দ্র রাজাদের শ্রদ্ধা করিতেন।

শৈলেন্দ্র, মাজাপাহিত, মালাক্কা ও বলীরাজ্য

পাল রাজাদের সময়ে শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। পাল রাজা দেবপাল এই মঠের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। বাংলার বৌদ্ধপণ্ডিত কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র রাজাদের রাজগুরু ছিলেন। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা ছিলেন শিল্প ও সংস্কৃতির

পৃষ্ঠপোষক। তাঁহাদের সময়ে জাভার বিখ্যাত বরবুদুর স্তূপ ও তারা-মন্দির নির্মিত হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে চোল রাজা প্রথম রাজেন্দ্র শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার একাংশ অধিকার করেন। ইহার পর প্রায় একশত বৎসরকাল ধরিয়া শৈলেন্দ্র-চোল সংঘর্ষ চলিয়াছিল। শৈলেন্দ্রগণ নিজেদের রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম



বরবুদুর স্তূপ জাভা)

হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা সিংহলে সামরিক অভিযান পাঠান। ইহা এই বংশের পতন ডাকিয়া আনে। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজা বিজয় কর্তৃক পূর্ব জাভায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য সমগ্র মালয় উপদ্বীপ ও বর্তমান ইন্দোনেশিয়া দখল করিয়া লয়। এই রাজ্য 'শ্রীবিজয়' রাজ্য নামে পরিচিত হয়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল মাজাপাহিত। পঞ্চদশ শতকে জাভার এক হিন্দু রাজা মালাক্কায় এক নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা একটি শক্তিশালী রাজ্য ও বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা ইসলামধর্ম গ্রহণ করিবার ফলে সমগ্র অঞ্চলে ইসলামধর্ম প্রসার লাভ করে। শুধু বলীদ্বীপে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি টিকিয়া থাকে। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামের আবির্ভাবের পরও সমগ্র অঞ্চলে হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি শিল্পের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। অসংখ্য মন্দির ও স্তূপ, সংস্কৃত পুঁথি, সংস্কৃত-লেখ, রামায়ণ ও মহভারতের জনপ্রিয়তা ও জীবনযাত্রায় হিন্দুপ্রভাব ভারতের সহিত এই অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় বহন করে। সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশে সম্রাট অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে দক্ষিণ ব্রহ্মে শ্রীক্ষেত্র নামে এক হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সমগ্র দেশে হীনযান বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শ্যামদেশের জীবনযাত্রায়, ধর্ম ও শিল্পে ভারতীয় প্রভাব আজও সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ**—(ক) বাংলাদেশে কয়টি বর্ণ ছিল? (খ) পাল যুগের রাজারা কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন? (গ) কয়েকটি নূতন উপজাতির নাম কর। (ঘ) খাজুরাহো কোথায়? (ঙ) পাহাড়পুর কিজন্য বিখ্যাত? (চ) কোণারক কোন দেবতার মন্দির? (ছ) উত্তর ভারতের মন্দির শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? (জ) ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের নাম কি? (ঝ) চম্পা রাজ্য কোথায় ছিল? (ঞ) কম্বোজের অবস্থান নির্ণয় কর। (ট) দক্ষিণ ভারতের মন্দির শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? (ঠ) অরেল স্টাইন কে?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**—(ক) সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল? (খ) সমাজে বৈশ্যদের প্রাধান্য কমিবার কারণ কি? (গ) এই যুগে প্রধান ধর্মগুলি কি কি? ইহাদের মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল? (ঘ) উত্তর ভারতের স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দাও। (ঙ) দক্ষিণ ভারতের সামাজিক অবস্থার পরিচয় দাও। (চ) চোল ও পল্লব শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (ছ) মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পরিচয় দাও।

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর ঃ**—(ক) সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও। (খ) এই যুগে দক্ষিণ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? (গ) উত্তর ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ। (ঘ) দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় দাও। (ঙ) সুবর্ণভূমিতে স্থাপিত হিন্দু রাজ্যগুলির পরিচয় দাও।

৪। **টীকা লিখ ঃ**—(ক) কুমারিলভট্ট (খ) শংকরাচার্য (গ) রামানুজ (ঘ) ভারবি (ঙ) দণ্ডী (চ) ভাস্করাচার্য (ছ) বিলহণ (জ) নটরাজ মূর্তি (ঝ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (ঞ) অতীশ দীপঙ্কর (ট) তঞ্জুর ও কঞ্জুর (ঠ) আঙ্করভাট (ড) বরবুদুর (ঢ) মাজাপাহিত (ণ) কুমার ঘোষ।

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**—(ক) সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের প্রধান তিনটি ধর্ম হইল —। (খ) এই পর্বে পূর্ব ভারতে — উপাসনা জনপ্রিয় হয়। (গ) সেন যুগে — ছিল লেন-দেনের মাধ্যম। (ঘ) ধোয়ী, হলায়ুধ, শরণ, উমাপতিধর —যুগের লোক ছিলেন। (ঙ) চক্রপাণি জীমূতবাহন, ভবদেব ভট্ট — যুগের লোক ছিলেন। (চ) বাংলার চর্যাপদগুলি — যুগে রচিত হয়। (ছ) শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন — ধর্মাবলম্বী। (জ) কম্বোজ ও চম্পা ছিল — রাজ্য। (ঝ) দক্ষিণ ভারতের সমাজে নারীরা — স্থান গ্রহণ করে। (ঞ) শংকরাচার্য — প্রতিষ্ঠা করেন। (ট) রামানুজ ছিলেন — প্রচারক। (ঠ) দক্ষিণ ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা ছিল —। (ড) ভাস্করাচর্য ভারবি, দণ্ডী প্রভৃতি — রাজাদের আনুকূল্য লাভ করেন। (ঢ) আরব বণিকগণ শৈলেন্দ্র রাজাদের — ও — প্রশংসা করিয়াছেন।

৬। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও ঃ**—(ক) বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে / চীনে গিয়াছিলেন। (খ) তিব্বতী মহাযানবাদী / হীনযানবাদী ছিলেন। (গ) মধ্য এশিয়ায় মার্শাল / অরেল স্টাইনের খননকার্যের ফলে ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের ভারত

মধ্যযুগের নামকরণ ঃ ইতিহাস পাঠের সুবিধার জন্য পণ্ডিতগণ ভারতের ইতিহাসকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করিয়া থাকেন—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। ভারত ইতিহাসে এই তিন যুগে তিন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুদের, মধ্যযুগে মুসলমানদের ও আধুনিককালে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী বৃটিশ শাসকদের। এই জন্য কেহ কেহ ভারত ইতিহাসের প্রাচীনকালকে হিন্দু, মধ্যযুগকে মুসলিম ও আধুনিক যুগকে বৃটিশ যুগ বলিয়া অভিহিত করেন। ভারত ইতিহাসের এই তিন যুগকে এভাবে নামাঙ্কিত করায় অসুবিধা আছে। প্রাচীন যুগে ভারতের সমস্ত মানুষ হিন্দু ছিলেন না। এই যুগে এমন পর্ব আছে যে সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হিন্দুধর্ম অপেক্ষা অধিক। সুতরাং সমগ্র প্রাচীন যুগকে হিন্দুযুগ আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। তেমনি মধ্যযুগের ভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিলেও সারা দেশে অসংখ্য হিন্দু নরপতি রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের অনেকে ছিলেন স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন। মুঘল রাজত্বের শেষদিকেও এদেশে শাসকগোষ্ঠী ও রাজন্যবর্গের এক বড় অংশ ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হিন্দু। শাসনব্যবস্থার উচ্চস্তরে, সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনে হিন্দু অভিজাতদের একাংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজস্ব বিভাগে হিন্দুকর্মচারীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মধ্যযুগীয় ভারতের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পে হিন্দুদের প্রভাব অনস্বীকার্য। মধ্যযুগের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প সবই মিলিত হিন্দু-মুসলমানের অবদান। এইজন্য ভারতের মধ্যযুগকে শুধু মুসলিম যুগ আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। ইহার প্রকৃত পরিচয় ভারতের মধ্যযুগ। আবার আধুনিককালে মুষ্টিমেয় ইংরেজ শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন বলিয়া ভারত ইতিহাসের এই পর্বকে বৃটিশ যুগ আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তু জনগণ, মুষ্টিমেয় শাসকসম্প্রদায় নয়। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগীয় সমাজে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট হইতে থাকে। নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাবধারার প্রভাবে এদেশে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়। সুতরাং সেইদিক হইতে বিচার করিয়া এই যুগকে আধুনিক যুগ আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত।

'মুসলিম ভারত' নয়, 'মধ্যযুগের ভারত'

সুলতানী যুগে ভারত ইতিহাসের উপাদান (Types of sources for the Sultanate period) ঃ

সুলতান শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক ভারত বিজয় (১১৯২) হইতে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের ভারত অধিকার পর্যন্ত সময়কালকে সুলতানী যুগ বলা হয়। প্রাচীন যুগের তুলনায় এই যুগের ভারত ইতিহাসের ভিত্তি অনেক মজবুত। ইহার প্রধান

কারণ হইল মুসলিম সুলতান ও বিদ্বান ব্যক্তিদের ইতিহাসবোধ ও লিখিত ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ। নিজেদের সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার প্রবল ইচ্ছা ও উৎসাহ ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলে আমরা এই যুগের লিখিত ইতিহাস পাই। সুলতানী যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে চারিভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) **দরবারী ইতিহাস**, (২) **সরকারী দলিল ও আত্মজীবনী**, (৩) **বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী** ও (৪) **শিল্প নিদর্শন, লেখ ও মুদ্রা**।

(১) সুলতানী যুগের ইতিহাসের মূল উপাদান হইল দরবারী ইতিহাস। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্বান ব্যক্তিরা ইতিহাস লিখিয়াছেন। এই ইতিহাসগুলি হইতে তথ্য লইয়া আধুনিককালে সুলতানী যুগের ইতিহাস লেখা হইয়াছে। হাসান নিজামী 'তাজ-উল-মাসীরে' মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের বিবরণ দিয়াছেন। ফকরুদ্দিন মুবারকের 'তারিখ-ই-ফকরুদ্দিন মুবারকশাহী' গ্রন্থ হইতে সুলতান কুতবুদ্দিনের সময়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। এযুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল মিনহাজ-উস সিরাজের 'তবাকৎ-ই-নাসিরী'। সুলতানী যুগের প্রথম দিককার ইতিহাস এই গ্রন্থে ধরা পড়িয়াছে। 'হিন্দুস্তানের তোতাপাখী' কবি আমীর খসরুর 'তারিখ-ই-আলাই' আলাউদ্দিন খলজীর বিজয় কাহিনী। তাঁহার 'তুলঘক নামা' গ্রন্থে তুঘলক বংশের শেষ পর্বের ইতিহাস আছে। জিয়াউদ্দিন বরণীর 'তারিখ-ই-ফিরুজ-শাহী'তে খলজী ও তুঘলক বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শামস-ই-সিরাজ আফিফের 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' এযুগের অপর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে আফিফ বরণীর মত প্রতিভাশালী ছিলেন না।

(২) সুলতানী যুগের ইতিহাসের অপর উল্লেখযোগ্য উপাদান হইল সরকারী দলিল ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলি। সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক 'ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী' নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আমলের রাজ্যশাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকগুলি সরকারী নির্দেশেরও ইহাতে উল্লেখ আছে। সুলতান মাহমুদ ও তৈমুর লঙের আত্মজীবনী হইতে ভারত ইতিহাসের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। রাজপুত চারণ কবিদের কাব্য ও গাঁথা (চাঁদবরদাই রচিত 'পৃথবীরাজ রসো' এরূপ একখানি ইতিহাসাশ্রিত কাব্য) ও আফগান ইতিহাস হইতে সুলতানী যুগের অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

(৩) সুলতানী যুগের ইতিহাসের তৃতীয় প্রধান উপাদান হইল বিদেশী পর্যটকদের রচিত বিবরণী। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে আফ্রিকাবাসী পর্যটক ইবন বতুতা ভারতে আসেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'রিহালা' হইতে তুঘলক বংশের ইতিহাসের অনেকখানি জানা যায়। ইবন বতুতা ছাড়া আবদুর রজ্জাক, মার্কোপোলো, নিকোলোকন্তি, পায়েস প্রভৃতি বিদেশী পর্যটনকারীরা সুলতানী যুগে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের রচনা হইতে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। চীনাপর্যটক মাহুয়ানের রচনা হইতে আমরা সুলতানী যুগে বাংলার পরিচয় পাই।

(৪) সুলতানী যুগের শিল্প, মুদ্রা ও লেখগুলি হইতে এযুগের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা হয়। সুলতানদের নির্মিত প্রাসাদ, মসজিদ ও স্মৃতিসৌধগুলি তাহাদের সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় বহন করে। সুলতানী যুগের মুদ্রা ও লেখগুলি হইতে আমরা সুলতানদের রাজত্বকাল, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক জীবনের পরিচয় পাই।

মুসলমানদের ভারতে আগমন ও আরবদের সিন্ধুবিজয় (Advent of Islam in India—Arab conquest of Sind) :

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ইসলামের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইসলামধর্মের প্রবর্তক পয়গম্বর হজরত মহম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরবদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ ও আরবজাতির মনে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করিতে সক্ষম হয়। নবচেতনা ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ আরবজাতি পয়গম্বর মহম্মদের মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রীঃ) দিগ্বিজয়ে বাহির হয়। মাত্র একশত বৎসরের মধ্যে খলিফাদের নেতৃত্বে নববলে বলীয়ান আরবজাতি এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করে। ইরাক, সিরিয়া, ইরান, উত্তর-আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের একাংশ আরবদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। প্রাচীনকাল হইতে আরবদের সহিত ভারতীয়দের যোগাযোগ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। সেই যুগে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি ও ভারতের ধনসম্পদের কাহিনী আরবদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। নূতন ধর্মমতের মহিমা প্রচার ও ধন যশ লাভের সম্ভাবনা আরবদের ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করিয়াছিল। অষ্টম শতকের প্রথমদিকে ইরাকের আরব গভর্ণর হাজ্জাজ সিন্ধুদেশ জয় করিবার জন্য খলিফার অনুমোদন লাভ করেন। তিনি নিজ জামাতা মুহম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে সিন্ধুদেশে অভিযান প্রেরণ করেন। সেই সময় সিন্ধুদেশে দাহির নামে এক ব্রাহ্মণ রাজত্ব করিতেন। মুহম্মদ বিন কাশিম রাজা দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সিন্ধুদেশ অধিকার করেন। পরের বৎসর কাশিম মুলতান অধিকার করেন। সিন্ধু ও মুলতান লইয়া ভারতে প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। সিন্ধু ও মুলতান অধিকৃত হইলেও পরবর্তী তিনশত বৎসরে আরবগণ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। উত্তর ভারতে প্রতিহারগণ এবং দাক্ষিণাত্যে চালুক্যগণ তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়।

সিন্ধুজয় : ৭১২ খ্রীঃ

রাজনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় মুহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধুজয় ভারত ইতিহাসে তেমন গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিনশত বৎসর যাবত আরবশাসন সিন্ধু ও মুলতানে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইহার কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে নাই। তবে সংস্কৃতির ইতিহাসে সিন্ধু বিজয়ের মূল্য নেহাত কম নয়। সিন্ধুদেশে আরব ও হিন্দুরা বহু বৎসর যাবত শান্তি ও সম্প্রীতিতে জীবন যাপন করে। ফলে উভয়ের মধ্যে ভাব-বিনিময় সহজ হয়। আরবগণ ভারতীয়দের

সিন্ধুজয়ের প্রভাব

নিকট হইতে প্রশাসন, ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে নূতন জ্ঞান অর্জন করে। আরবদের মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। হ্যাভেলের মতে, আরবদের সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, দর্শন ও ধর্মচিন্তায় ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। ইসলামের আবির্ভাবের পর প্রথমদিকে গ্রীসদেশ নয়, ভারতই ছিল তাহাদের শিক্ষাদাতা।

মুসলমান শাসনের সূত্রপাত (Beginning of Muslim Rule) :

একাদশ শতকের শুরুতে মুসলমানদের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে এদেশে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। সারা ভারতবর্ষ ছোট বড় অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে ঐক্য তো ছিলই না, বরং একে অপরের রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকিত। একথা স্বীকার করিতে হইবে ভারতীয় রাজাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ মুসলমানদের ভারত বিজয়ের কাজকে অনেকখানি সহজ করিয়া দেয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু ও মুলতান ছিল মুসলমান রাজ্য। এই অঞ্চলে পাঞ্জাব ও পূর্ব আফগানিস্তানের সন্নিহিত অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল হিন্দু শাহীরাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ওয়াইহান্দ বা উদ্‌ভাণ্ডপুর এবং রাজা ছিলেন শাহীবংশীয় জয়পাল। কাশ্মীরে শাহীবংশীয় রাজাদের আত্মীয়রা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। উত্তর ভারতের কনৌজে প্রতিহারবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। প্রতিহারগণ তেমন শক্তিশালী ছিলেন না। দুর্বল প্রতিহাররাজ রাজ্যপালের বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত শক্তি ছিল না। পূর্ব ভারতে বাংলা বিহার জুড়িয়া ছিল পালরাজাদের রাজ্য। পালদের গৌরব রবি তখন অস্তগামী। তাহাদের বংশধর প্রথম মহীপালকে খুব শক্তিশালী রাজা বলা যায় না। পশ্চিম ভারতে সোলাঙ্কী বংশীয় রাজপুত রাজারা রাজত্ব করিতেন। বুন্দেলখণ্ডে চান্দেল্লগণ এবং মালবে পরমারগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। দক্ষিণ ভারতে চালুক্য ও চোলগণ ছিলেন শক্তিশালী রাজ্যের অধীশ্বর।

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অবস্থা

খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগে আলপ্তগীন নামক এক তুর্কী শাসক আফগানিস্তানের উত্তরে গজনীকে কেন্দ্র করিয়া এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। দশম শতকের শেষদিকে এ রাজ্যের সুলতান সবুক্তিগীনের সময়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি গজনীরাজ্যভুক্ত হয়। সবুক্তিগীন পূর্ব আফগানিস্তানে রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হইলে পাঞ্জাবের শাহী রাজাদের সহিত গজনীর বিরোধ শুরু হয়। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পর গজনীর সুলতান হন তাঁর পুত্র বিখ্যাত মাহমুদ। ১০০১ হইতে ১০২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ মোট সতেরবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন।[1] উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও রণনিপুণ সেনাপতি মাহমুদ ভারতে প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য প্রথমে পাঞ্জাবে শাহী রাজ্যটি আক্রমণ

গজনীরাজ্য ও সুলতান মাহমুদ ৯৯৭-১০৩০ খ্রীঃ

(১) অন্যমতে বারবার।

করেন। একাদশ শতকের প্রথম পঁচিশ বৎসর তিনি ক্রমাগত শাহী রাজাদের আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করেন। ইতিমধ্যে তিনি একে একে মুলতান, থানেশ্বর, কাশ্মীর ও মথুরা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করেন। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ কনৌজ অধিকার করিয়া প্রতিহার বংশের পরিসমাপ্তি ঘটান। গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জরের রাজপুত রাজারা বিনাযুদ্ধে তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করেন। ১০২৫ খ্রীঃ মাহমুদ গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। গুজরাটের সোলাঙ্কী বংশীয় রাজা ভীমদেব তাঁহার নিকট পরাস্ত হন।

মাহমুদের ভারত আক্রমণের ফলাফল ঃ

সুলতান মাহমুদের ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোন ইচ্ছা ছিল না। ধন ও যশ লোভে তিনি বারংবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। কোন ভারতীয় রাজার নিকট তিনি পরাজিত হন নাই। জয়পালের পুত্র আনন্দপালের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ ভারতীয় রাজাদের তিনি পরাস্ত করেন। পাঞ্জাবের শাহী রাজা আনন্দপাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের রাজাদের সাহায্যে বিশাল প্রতিরোধ গড়িয়াও আক্রমণকারী মাহমুদকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। ভারত লুণ্ঠন করিয়া মাহমুদ প্রচুর ধনরত্ন স্বদেশে লইয়া যান। ইহার আর্থিক মূল্য বেশ কয়েক কোটি টাকা। এক সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করিয়া তিনি দুই কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্ন পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন শুধু লুণ্ঠন নয়, ভারতে বিধর্মীদের পরাস্ত করিয়া ইসলাম ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করা তাঁহার ভারত আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মুসলমানদের ধর্মগুরু বাগদাদের খলিফা আল-কাদির-বিল্লার আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। মাহমুদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন তাঁহার ভারত আক্রমণের ফলে এদেশের রাজনীতিতে কোন স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে নাই। তিনি আফগানিস্তান, পাঞ্জাব ও মুলতান তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলের রাজারা তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যুর পর (১০৩০ খ্রীঃ) পুনরায় স্বাধীন হইয়া যান। তবে এই কথা ঠিক মাহমুদের বারংবার সফল আক্রমণ ভারতীয় রাজাদের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া দেয়। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক ভারত বিজয় ও মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের পরোক্ষ ফল বলা যাইতে পারে।

সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণ রাজনৈতিক দিক হইতে ব্যর্থ হইলেও সাংস্কৃতিক দিক হইতে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। আক্রমণকারী মাহমুদ নিজে ছিলেন শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী। শাহনামার কবি ফিরদৌসী, আনসারী, উৎবী প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। আলবিরুণী মাহমুদের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা 'তাহকিক-ই-হিন্দ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলবিরুণীর গ্রন্থ হইতে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া

আলবিরুণী ও ভারত

যায়। আলবিরুণী ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত ও সংস্কারমুক্ত মানুষ। তিনি এদেশে অবস্থানকালে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সংস্কৃতচর্চা করেন। তাঁহার মতে হিন্দুদের প্রধান ত্রুটি হইল তাহারা পৃথিবীর অপরাপর জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বসবাস করে। অধীনস্থ নিম্ন জাতিগুলির (ম্লেচ্ছ) সহিত তাহারা যোগাযোগ রাখে না। এই সময় ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যগুলি পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। এদেশের প্রধান রাজ্য হইল কাশ্মীর, সিন্ধু, মালব ও কনৌজ। অলবিরুণী ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন দেখিয়াছিলেন। ভারতীয়দের অল্প বয়সে বিবাহ হইত এবং দেশে বৈধব্য ব্যবস্থা চালু ছিল। বিধবাদের পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার ছিল না। সমাজে নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত কুপ্রথা চালু থাকা সত্ত্বেও আলবিরুণী মন্তব্য করিয়াছেন যে হিন্দুদের সামাজিক আচার-আচরণ সততা ও পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শপথ ও সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা বিচার-কার্য সমাধা হইত। অপহৃত সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী চোরের শাস্তি হইত। সাধারণতঃ দেশে লঘু দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অঙ্গচ্ছেদ চলিত। আইনের চোখে সকলে সমান বলিয়া গণ্য হইত না। ব্রাহ্মণদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নিয়ম ছিল না। রাজা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ কর হিসাবে গ্রহণ করিতেন। শ্রমিক, কারিগর ও বণিক তাহাদের আয়ের একাংশ রাজাকে কর হিসাবে দিত। ব্রাহ্মণেরা কোন কর দিত না। দেশে মূর্তি পূজার প্রথা ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বহু দেবদেবীর পূজা করিত। সারা দেশে ছিল অসংখ্য মন্দির। উচ্চশ্রেণীর মানুষ একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করিত।

রাজনৈতিক

সামাজিক

ধর্মীয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠা

(Foundation of the Delhi Sultanate)

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনী সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। গজনী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ঘুরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া যান। তুর্কী জাতির অপর এক দুর্ধর্ষ শাখার আক্রমণে গজনী সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে ঘুরের শাসক গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ ১১৭৩ খ্রীঃ গজনী দখল করিয়া লন। গজনীর শাসক খসরু শাহ পাঞ্জাবে পলায়ন করেন। গিয়াস-উদ্দিন তাঁহার নিজ ভ্রাতা শিহাবুদ্দিন মুইজুদ্দিন মহম্মদকে গজনীর প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত করেন। উত্তর আফগানিস্তানে নূতন ঘুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুইজুদ্দিন বা মহম্মদ ঘুরী ১১৭৫ খ্রীঃ হইতে প্রথমে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করিতে থাকেন। গুজরাট আক্রমণ করিয়া তিনি ভারতে মুসলিম রাজ্য মুলতান দখল করিয়া লন।

গজনী সাম্রাজ্যের পতন ও ঘুর সাম্রাজ্যের উত্থান

ব্যর্থ হন, তবে পেশোয়ার দখল করিয়া নিজ অধিকারভুক্ত করেন। জম্মুর হিন্দু রাজার সহায়তায় মহম্মদ ঘুরী গজনীর শেষ সুলতান খসরু মালিককে পরাস্ত করিয়া পাঞ্জাব দখল করেন। ইহার পর ভারত আক্রমণের পথ পরিষ্কার হইয়া যায়।

সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের পরবর্তী দেড়শত বৎসরে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক চিত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে বিহারে পালবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। বাংলায় ছিল সেনবংশ। উভয় রাজশক্তিই ছিল দুর্বল। বুন্দেলখণ্ডে চান্দেল্লগণ এবং কনৌজে গহড়বলীয়গণ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। কনৌজের জয়চন্দ্র ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। তিনি বেশীর ভাগ সময় কাশীতে থাকিতেন। দিল্লী ও আজমীরে চৌহানবংশীয় রাজপুত রাজা পৃথিবীরাজ রাজত্ব করিতেন। রাজপুত চারণ কবিদের রচনা হইতে জানা যায় জয়চন্দ্র পৃথিবীরাজের মধ্যে বিরোধ ছিল। গুজরাটে সোলাঙ্কী ও দক্ষিণ ভারতে চালুক্য ও চোলগণ রাজত্ব করিতেন।

দ্বাদশ শতকের শেষদিকে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ঃ

১১৯০ খ্রীঃ মহম্মদ ঘুরী পাঞ্জাব হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। পরের বৎসর অর্থাৎ ১১৯১ খ্রীঃ থানেশ্বরের নিকট তরাইন নামক স্থানে মহম্মদ ঘুরী ও দিল্লীর চৌহান রাজা পৃথিবীরাজের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ঘুরী পরাস্ত হইয়া গজনীতে ফিরিয়া যান। হতোদ্যম না হইয়া ঘুরী পরের বৎসর পুনরায় ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ) পৃথিবীরাজকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তিনি দিল্লী ও আজমীর দখল করেন। উত্তর ভারতে মুসলমান শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১১৯৪ খ্রীঃ ঘুরী পুনরায় ভারতে আসেন এবং কনৌজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে মহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি ও বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবুদ্দিন আইবক উত্তর ভারতের আরও কয়েকটি অঞ্চল দখল করিয়া লন। গুজরাট, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, মীরাট, রণথম্ভোর, মাহোবা ও বদায়ুন একে একে মুসলিম রাজ্যভুক্ত হয়। ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ[১] নামক অপর একজন তুর্কী সেনাপতি সেনবংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাস্ত করিয়া বিহার ও পশ্চিমবাংলার একাংশ অধিকার করেন। মিনহাজ-উস-সিরাজ লিখিয়াছেন মাত্র সতেরজন অশ্বারোহী লইয়া ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বাংলার রাজধানী নদীয়া বা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রায় বিনাযুদ্ধে বাংলা অধিকৃত হয়। রাজা লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে পলাইয়া যান। সেখানে আরও কিছুকাল সেন রাজত্ব টিকিয়া থাকে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে পশ্চিম সিন্ধু নদী হইতে পূর্বে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ : ঘুরীর শাসন প্রতিষ্ঠা

(১) ইনি বখতিয়ার খলজী নামেও পরিচিত।

স্বাধীন দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠা ঃ

১২০৩ খ্রীঃ ভ্রাতার মৃত্যুর পর মহম্মদ ঘুরী গজনী, ঘুর ও দিল্লীর সুলতান হন। ১২০৫ খ্রীঃ মধ্য এশিয়ার শক্তিশালী খাওয়ারিজম বংশীয় সুলতানের সহিত সংঘর্ষে তিনি পরাস্ত হন। এই পরাজয়ের পর মহম্মদ ঘুরীর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা যায়। তিনি সমস্ত বিদ্রোহ একে একে দমন করেন। পাঞ্জাবে খোক্করদের বিদ্রোহ দমন করিয়া গজনীতে ফিরিবার পথে ১২০৬ খ্রীঃ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন। মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য সেনাপতিদের হস্তগত হয়। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর তাজউদ্দিন ইল্‌দিজ গজনী দখল করেন। নাসিরুদ্দিন কুবাচা সিন্ধু ও মুলতান দখল করিয়া স্বাধীন হইয়া যান। ভারতে কুতবুদ্দিন আইবক স্বাধীন সুলতানীর প্রতিষ্ঠা করেন।

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু ও দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠা

দিল্লীর স্বাধীন সুলতান হইবার পর কুতবুদ্দিন আইবক মাত্র চারি বৎসর (১২০৬-১২১০) রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে গজনীর শাসক তাজউদ্দিন ইল্‌দিজ পাঞ্জাব দখল করিবার জন্য তৎপরতা দেখান। আইবক গজনীতে প্রবেশ করিয়া তাজউদ্দিনকে বিতাড়িত করে। গজনী হইতে ফিরিয়া লাহোরে অবস্থানকালে পোলো খেলিবার সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া আইবকের মৃত্যু হয়।[১] লাহোরের আমীরগর কুতবুদ্দিনের পুত্র আরাম শাহকে দিল্লীর সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লীর আমীরগণ কুতবুদ্দিনের সুযোগ্য জামাতা ও বদায়ুনের শাসক মালিক শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশকে সুলতান মনোনীত করেন। ইলতুৎমিশ ক্ষমতা দখল করিয়া ১২১০ হইতে ১২৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী তাজউদ্দিন ইল্‌দিজ ও নাসিরুদ্দিন কুবাচাকে পরাস্ত করিয়া পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মুলতান প্রদেশ নিজ অধিকারে আনেন। তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিয়া একে একে মন্দাবার, রণথম্ভোর ও গোয়ালিয়র দখল করিয়া লন। মালব আক্রমণ করিয়া ভীলসা ও উজ্জয়িনী দখল করেন। বাংলার খল্‌জী মালিকদের পরাস্ত করিয়া ইলতুৎমিশ দিল্লীর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন স্বাধীন দিল্লী সুলতানীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সিন্ধুপ্রদেশের বানিয়ানে অভিযান পরিচালনার সময় অসুস্থ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

কুতবুদ্দিন, ইলতুৎমিশ ও বলবনের অধীনে সুলতানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

১২৩৬ হইতে ১২৪৬ খ্রীঃ পর্যন্ত সুলতানী শাসকদের দুর্বলতার জন্য দিল্লী সুলতানীর সম্প্রসারণ ব্যাহত হয়। এই দশ বৎসরে যাঁহারা শাসন পরিচালনা করিয়া-

(১ দিল্লী সুলতানীর প্রথম তিনজন উল্লেখযোগ্য শাসক কুতবুদ্দিন, ইলতুৎমিশ ও বলবন প্রথম জীবনে দাস ছিলেন বলিয়া অনেকে ইহাকে দাস বা মামলুক বংশ বলিয়া থাকেন। ইহা ঠিক নয়। ইঁহারা প্রথম জীবনে দাস ছিলেন ঠিকই, তবে সুলতান হইবার আগে সকলেই স্বাধীন হন। ইঁহাদের দাস বংশ না বলিয়া ইলবারী তুর্কী বংশ বলাই সঙ্গত। A.B.M. Habibullah, Foundation of Muslim Rule in India দ্রষ্টব্য।

ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ইলতুৎমিশ কন্যা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০) কিছুটা যোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। কূটনীতি, শাসনকার্য ও সৈন্য পরিচালনায় তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন। মিনহাজ-উস-সিরাজ লিখিয়াছেন একজন যোগ্য শাসকের সমস্ত গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল। তিনি পুরুষের বেশে দরবারে বসিতেন এবং সুলতানার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করেন। তবে আমীরদেয় বিরোধিতার ফলে তিনিও শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। ১২৪৬ খ্রীঃ ইলতুৎমিশের পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ দিল্লীর সুলতান হন। তিনি ছিলেন ধর্মভীরু ও দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালে (১২৪৬-১২৬৫) শ্বশুর গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের হস্তে তুলিয়া লন। ১২৬৫ খ্রীঃ জামাতা নাসিরুদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর বলবন সিংহাসন লাভ করেন। ১২৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। বলবন সুলতানী সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি পরিত্যাগ করেন। তিনি ইহার সুরক্ষার দিকে নজর দেন। তাঁহার রাজত্বকালে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে রাজপুত মেওয়াটী দস্যুদের উৎপাতে সুলতানী রাজ্যের শাসন ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়ে। বলবন ইহাদের উৎপাত বন্ধ করিতে সক্ষম হন। মহম্মদ ঘুরী ও কুতবুদ্দিন আইবক ভারতে মুসলমান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইলতুৎমিশ ইহাকে আরও প্রসারিত ও শক্তিশালী করেন। সুলতানী যুগের 'লৌহ মানব' বলবন শিশু মুসলিম রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন।

সুলতানা রাজিয়া

বলবন

সুলতানী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথম শতকে ইহা যে বিপদের সম্মুখীন হয় তাহার দুইটি দিক—অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক। অভ্যন্তরীণ বিপদ ছিল আবার বিভিন্ন ধরনের : (১) রাজপুত রাজাদের বিরোধিতা ইহাদের মধ্যে অন্যতম। তুর্কী শাসকগণ রাজপুত রাজাদের পরাস্ত করিয়া ভারতে সুলতানী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজপুত-গণ এই পরাজয়ের গ্লানি ভুলিবার জন্য বারবার সুলতানী রাজ্য আক্রমণ করিতে থাকে। অনেক পরাজিত রাজপুত রাজা বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইয়া যান। প্রথমদিককার সুলতানগণকে বারংবার এই রাজপুত প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হয়। রাজপুতনা, গুজরাট, গোয়ালিয়র, মালব প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রমাগত অভিযান পাঠাইয়া রাজপুতদের প্রতিরোধ ভাঙ্গিতে হয়। (২) সুলতানী রাজ্যের অপর প্রধান অভ্যন্তরীণ বিপদ হইল তুর্কী আমীরগণের ষড়যন্ত্র, ক্ষমতালিপ্সা ও বিদ্রোহের প্রবণতা। আমীরগণ ছিলেন বিভিন্ন দল, উপদল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের দল বা গোষ্ঠীর হাতে রাখিবার জন্য ইহারা সুলতানদের সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইত। ইলতুৎমিশ প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'চল্লিশা' বা চল্লিশ জনের অভিজাতগোষ্ঠী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা নিজেদের সুলতানদের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিত। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে নিজেদের মনোনীত প্রার্থীকে ক্ষমতায় বসাইবার জন্য ইহারা চেষ্টা করিত। ইলতুৎমিশ ও বলবন উভয়কেই এই শক্তিশালী আমীরগোষ্ঠীকে পরাস্ত

সুলতানী রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিপদের প্রকৃতি—সংহতিসাধন

করিয়া স্লতানী রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করিতে হয়। বাংলার খল্জী শাসকগণ দূরবর্তী দিল্লীর ইলবারি স্লতানদের শাসন মানিতে চাহিতেন না। তাঁহারা প্রায়ই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাইতেন। ইলতুৎমিশ ও বলবন উভয়কেই বাংলার বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। (৩) স্লতানী রাজ্যে সবচেয়ে বড় অভাব ছিল একটি স্গঠিত প্রশাসনব্যবস্থা ও সৈন্যবাহিনীর। ভারতজয়ের পর কুতব্দ্দিন আইবক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সময় পান নাই। ইলতুৎমিশ বিদ্রোহ দমন ও রাজ্যবিস্তারে এত ব্যস্ত ছিলেন যে স্ষ্ঠু প্রশাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। গিয়াস-উদ্দিন বলবন রাজ্যবিস্তার না করিয়া প্রশাসনব্যবস্থা ও সৈন্যবাহিনী গঠনে মনোনিবেশ করেন। বলা যায় তিনি অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। বলবনের শাসনের শেষ-দিকে দেশে স্শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দস্যু তস্করের উৎপাত বন্ধ হয়। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ গড়িয়া উঠে। স্লতানের নিজস্ব বিশাল সৈন্যবাহিনীও প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈন্য-বাহিনীতে নিয়োগ, শিক্ষা ও বেতন সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এযুগে স্লতানী সাম্রাজ্যের সামনে বৈদেশিক বিপদ ছিল দুই ধরনের : (১) মধ্য এশিয়ার ঘ্র সাম্রাজ্যের শাসকগণ ভারতের ম্সলিম রাষ্ট্রকে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের একাংশ বা অঙ্গরাজ্য বলিয়া মনে করিতেন। ইহার স্বাধীন সত্তা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহিতেন না। মহম্মদ ঘ্রীর উত্তরাধিকারী তাজউদ্দিন ইল্দিজ ও নাসির্দ্দিন কুবাচা ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধ্ ও ম্লতান দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারা দিল্লী স্লতানীর বশ্যতা দাবী করিতেন। ইলতুৎমিশকে ইঁহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া দিল্লী স্লতানীর সীমান্ত ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়। তাঁহার সময়ে দিল্লী মধ্য এশিয়ার রাজনীতি হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন সত্তা লাভ করে। (২) ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলনেতা চিঙ্গিস খাঁ তাঁহার পলাতক শত্রু মধ্য এশিয়ার খাওয়ারিজম স্লতান জালাল্দ্দিন মঙ্গবর্ণীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধ্নদের তীরে আসিয়া হাজির হন। স্লতান ইলতুৎমিশ পলাতক স্লতানকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিলে তিনি পারস্যদেশে পলাইয়া যান। মোঙ্গলগণও তাঁহার পশ্চাতে ভারত সীমান্ত ত্যাগ করে। ইলতুৎমিশের দূরদর্শিতায় ভারত মোঙ্গল আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

বৈদেশিক বিপদ-প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

স্লতান বলবনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ গজনী ও আম্দরিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগ্লি দখল করিয়া স্থায়ীভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এখান হইতে অভিযান চালাইয়া তাহারা পাঞ্জাব ও সিন্ধ্প্রদেশ দখল করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। বলবন সীমান্ত প্রদেশগ্লিতে স্থায়ী দুর্গ নির্মাণ করিয়া নিজ আত্মীয় অভিজ্ঞ সেনাপতি শের খাঁ, পুত্র মহম্মদ ও বুখরা খাঁর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেন। মোঙ্গলরা বারবার পাঞ্জাব, সিন্ধ্ ও ম্লতান প্রদেশ দখল করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সময় বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ প্রাণ হারান। বলবন তাঁহার দৃঢ় নীতিদ্বারা অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দিল্লী স্লতানীকে রক্ষা করেন। স্লতানী রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খল্‌জী সাম্রাজ্যবাদ

(Khalji Imperialism)

আলাউদ্দিন খল্‌জী (Alauddin Khalji) :

১২৮৭ খ্রীঃ সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র কায়কোবাদ সুলতান হন। তিনি মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। দুর্বল ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁহার সময়ে দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। তুর্কী ও খল্‌জী আমীরদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই সুযোগে খল্‌জী আমীরদের নেতা জালালুদ্দিন ফিরোজ খল্‌জী ১২৯০ খ্রীঃ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। এই ঘটনা 'খল্‌জী বিপ্লব' নামে খ্যাত। জালালুদ্দিন ফিরোজ যখন সুলতান হন তখন তিনি অতি বৃদ্ধ—বয়স সত্তর বৎসর। তাহা ছাড়া এই ধর্মভীরু সুলতান ছিলেন দুর্বল ও দয়ালু প্রকৃতির। সুলতান হইয়া উচ্চাকাংক্ষী ও উৎসাহী খল্‌জী মালিকদের উচ্চাশা তিনি পূরণ করিতে পারেন নাই। জালালুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন ছিলেন তীক্ষ্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ও উচ্চাভিলাষী। তিনি ছিলেন এই সময় কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্তা। মধ্য-প্রদেশের ভীল্‌সা ও দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি লুণ্ঠন করিয়া তিনি প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন। আলাউদ্দিন খল্‌জী আমীরদের সহিত চক্রান্ত করিয়া গুপ্তঘাতকের সাহায্যে সুলতান জালালুদ্দিনকে হত্যা করেন। ১২৯৬ খ্রীঃ তিনি দিল্লীর সুলতান হন।

খল্‌জীবিপ্লব ও আলাউদ্দিনের ক্ষমতা দখল (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)



আলাউদ্দিন খল্‌জী

ক্ষমতা দখলের পর আলাউদ্দিন বিদ্রোহী আমীর ও জালালুদ্দিনের পুত্রদের দমন করিয়া নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথমদিকে অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বারংবার মোঙ্গল আক্রমণ। কাদার, সাল্‌দি, আলীবেগ, খাজা তাশ প্রভৃতি নেতার অধীনে মোঙ্গলগণ সুলতানী রাজ্যের উপর আঘাত হানিতে থাকে। আলাউদ্দিনের সুযোগ্য সেনাপতি জাফর খাঁ ও উলুগ খাঁ মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হন। সীমান্ত দুর্গগুলি সংস্কার করিয়া সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়। আলাউদ্দিনের দৃঢ় প্রতিরক্ষা

প্রতিষ্ঠা

ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। মোঙ্গলগণ খলজী রাজ্যের কোন অংশ অধিকার করিতে পারে নাই।

ভারত ইতিহাসে আলাউদ্দিনের সবচেয়ে বড় পরিচয় সুলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী রূপে। গৌরবলিপ্সু ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই সম্রাট গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ন্যায় বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেন। তিনি দিল্লীর অধীনে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক উলসলি হেগের মতে, তাঁহার সময় হইতে দিল্লী সুলতানীর সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার শুরু হয় (with him begins the imperial period of the Sultanate)। যেহেতু সুলতানী রাজ্যের রাজধানী দিল্লী উত্তর ভারতে অবস্থিত সেহেতু আলাউদ্দিন প্রথমে উত্তর ভারত জয়ে মনোনিবেশ করেন। ১২৯৮ হইতে ১৩০৮ খ্রীঃ পর্যন্ত এই দশ বৎসর তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণ করিয়া জয় করেন। বিজিত রাজ্যগুলি সুলতানী সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। গুজরাটের ধনসম্পদের খ্যাতি ও সমৃদ্ধ বন্দরগুলি (সুরাট, ক্যাম্বে ইত্যাদি) প্রথমে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সময়ে বাঘেলা রাজপুতবংশীয় কর্ণদেব গুজরাটের রাজা ছিলেন।

আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য বিস্তার : উত্তর ভারত

আলাউদ্দিনের সেনাপতি উলুগ খাঁ ও নসরত খাঁ গুজরাট আক্রমণ করিয়া রাজা কর্ণদেবকে পরাস্ত করেন। রাজা পলাইয়া যান। তাঁহার রানী কমলাদেবী ও ধনরত্ন বিজয়ী সেনাপতিদের হস্তগত হয়। আলাউদ্দিনের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী সুরাট, ক্যাম্বে বন্দর ও সোমনাথ নগর ও মন্দির লুণ্ঠন করে।

গুজরাট : ১২৯৮

গুজরাট জয়ের পর আলাউদ্দিন রাজপুতনার রণথম্ভোর রাজ্যটি দখল করিবার জন্য সামরিক অভিযান পাঠান। সামরিক কৌশলের দিক হইতে রাজপুতনা জয়ের জন্য রণথম্ভোর জয়ের প্রয়োজন ছিল। এই রাজ্যটি ছিল রাজপুতনার প্রবেশদ্বার। তাহা ছাড়া রণথম্ভোরের চৌহান রাজা হামীরদেব আলাউদ্দিনের শত্রু মোঙ্গল বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেন। উলুগ খাঁ ও নসরত খাঁয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত রণথম্ভোরের উপর প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হয়। আলাউদ্দিন নিজে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিয়া দ্বিতীয় আক্রমণে রণথম্ভোর দখল করিতে সক্ষম হন। হামীরদেব ও তাঁহার অনুগামীরা যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন। রাজপুত রমণীরা জহর ব্রত পালন করিয়া অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করেন। রণথম্ভোর জয়ের পর শুরু হয় চিতোর অভিযান। মেবারের রাজধানী চিতোর অধিকার আলাউদ্দিনের উত্তর ভারত অভিযানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাজপুত কিংবদন্তী অনুসারে মেবারের রাণা রতনসিংহের অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করিবার জন্য আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবত' কাব্যে এই মতের সমর্থন আছে। আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের আসল কারণ অবশ্য রাজনৈতিক ও সামরিক। রাজপুত রাজন্যবর্গের শীর্ষে ছিলেন মেবারের রাণা। তাঁহাকে পরাস্ত না করিয়া রাজপুতনা জয় করা সহজ হইত না। সাতমাস

রণথম্ভোর : ১৩০১

চিতোর ১৩০৩

অবরোধের পর চিতোর দুর্গের পতন হয়। রাণা রতনসিংহ তাঁহার অনুচরদের লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। চিতোর জয়ের পর আলাউদ্দিন রাজপুতরাজ্য শিবানা ও জালোর দখল করেন। ইতিমধ্যে ১৩০৫ খ্রীঃ মুলতানের গভর্নর আইন-উল-মুল্কের নেতৃত্বে মালবে অভিযান প্রেরিত হয়। মালবের রাজা মহলকদেব যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন। আইন-উল-মুলক মালবের রাজধানী মাণ্ডু অধিকার করেন। মাণ্ডুর পর একে একে উজ্জয়িনী, ধর ও চান্দেরী অধিকৃত হয়। ১৩০৮ খ্রীঃ নাগাদ সমগ্র রাজপুতনা ও উত্তর ভারত আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

মালব ঃ ১৩০৫ উজ্জয়িনী, ধর ও চান্দেরী

উত্তর ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া আলাউদ্দিন খলজী দক্ষিণ ভারত বিজয়ে মন দেন। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির বহু যুগের সঞ্চিত ধনসম্পদ হস্তগত করিবার বাসনা তাঁহার দক্ষিণ ভারত অভিযানের আসল কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। যশলোভী আলাউদ্দিন দক্ষিণের রাজ্যগুলি জয় করিয়া দিল্লী সুলতানীর গৌরব ও সম্পদ দুইই বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কে. এস. লাল এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ইউ. এন. দে-র মতে, আলাউদ্দিন শুধু ধনলোভে নয়, প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদীর মনোভাব লইয়া দক্ষিণে অগ্রসর হন। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে সুলতানী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার দক্ষিণ ভারত অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ছিল। উত্তর ভারতে আলাউদ্দিন বিজিত রাজ্যগুলি সরাসরি সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। দক্ষিণ ভারতে তিনি ভিন্ন নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। বিজিত রাজ্যের রাজারা দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদানে রাজী হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। আলাউদ্দিন বিজিত অঞ্চল সুলতানী সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই দিক হইতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতির সহিত তাঁহার নীতির অদ্ভুত মিল আছে।

দক্ষিণ ভারত বিজয়

১৩০৮ হইতে ১৩১২ খ্রীঃ-এর মধ্যে আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারতে তাঁহার সামরিক অভিযানগুলি পাঠাইয়াছিলেন। এই যুগে দক্ষিণ ভারতে চারিটি বিশাল ও সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে যাদববংশের অধীনে ছিল দেবগিরি রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন রামচন্দ্রদেব। দেবগিরির দক্ষিণ-পূর্বে ছিল তেলেঙ্গানা রাজ্য। ইহার রাজধানী বরঙ্গল। কাকতীয় বা গণপতি রাজারা এখানে রাজত্ব করিতেন। প্রথম প্রতাপরুদ্রদেব এই সময় বরঙ্গলের রাজা ছিলেন। দেবগিরির দক্ষিণে বর্তমান কর্ণাটকে ছিল শক্তিশালী হৈসল রাজ্য। হৈসল রাজ্যের রাজধানী ছিল দ্বারসমুদ্র। তৃতীয় বীরবল্লাল ছিলেন হৈসলদের রাজা। সুদূর দক্ষিণে ছিল পান্ড্যদের রাজ্য। ইহার রাজধানী মাদুরা। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে মাবার রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারিটি প্রধান রাজ্য ছাড়াও দক্ষিণ ভারতে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি সর্বদাই পরস্পরের সহিত বিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। ইহা নিঃসন্দেহে আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনার সহায়ক হয়।

দক্ষিণ ভারতের অবস্থা

দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব দীর্ঘকাল সুলতানকে কর দেন নাই। কারা ও অযোধ্যার শাসক হিসাবে আলাউদ্দিন প্রথম জীবনে দেবগিরি জয় করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া গুজরাটের পলাতক রাজা কর্ণদেবকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দেবগিরিতে সামরিক অভিযান পাঠান। রামচন্দ্রদেব পরাজিত হন। কাফুর প্রভুত ধনরত্ন লাভ করেন। রামচন্দ্রদেব দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদানে অঙ্গীকার করিলে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হয়। দেবগিরি অভিযানের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া আলাউদ্দিন বরঙ্গল আক্রমণ করেন। পূর্বে একবার আলাউদ্দিনের বরঙ্গল অভিযান ব্যর্থ হয়। সেইজন্য বরঙ্গল জয় করা রাজনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। বরঙ্গলের রাজা প্রতাপ রুদ্রদেব সেনাপতি মালিক কাফুরের নিকট পরাস্ত হন। একশত হাতী, সাতহাজার ঘোড়া ও সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্ন তিনি মালিক কাফুরের হস্তে তুলিয়া দেন। নিয়মিত করদানের অঙ্গীকার করিয়া তিনি নিজ রাজ্য ফেরত পান। বরঙ্গল হইতে মালিক কাফুর হৈসল আক্রমণ করেন। হৈসলরাজ তৃতীয় বীরবল্লাল সেই সময় পাণ্ড্য রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি অন্যান্য দাক্ষিণী রাজাদের মত হাতী, ঘোড়া ও ধনরত্ন উপহার দিয়া মালিক কাফুরের নিকট শান্তি প্রার্থনা করেন। নিয়মিত করদানের শর্তে তাঁহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হয়। দ্বারসমুদ্র হইতে মালিক কাফুর পাণ্ড্যদের রাজ্যে প্রবেশ করেন। পাণ্ড্য রাজ্যে সেই সময় দুই রাজপুত্র সুন্দরপাণ্ড্য ও বীরপাণ্ড্যের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিতেছিল। পাণ্ড্য রাজারা মালিক কাফুরের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া যান। তাঁহারা অকস্মাৎ আক্রমণের নীতি গ্রহণ করিয়া আলাউদ্দিনের সৈন্য-বাহিনীকে বিব্রত করিতে থাকেন। মালিক কাফুর রাজধানী মাদুরা দখল করিয়া লুণ্ঠন করেন।

দক্ষিণ ভারত জয়

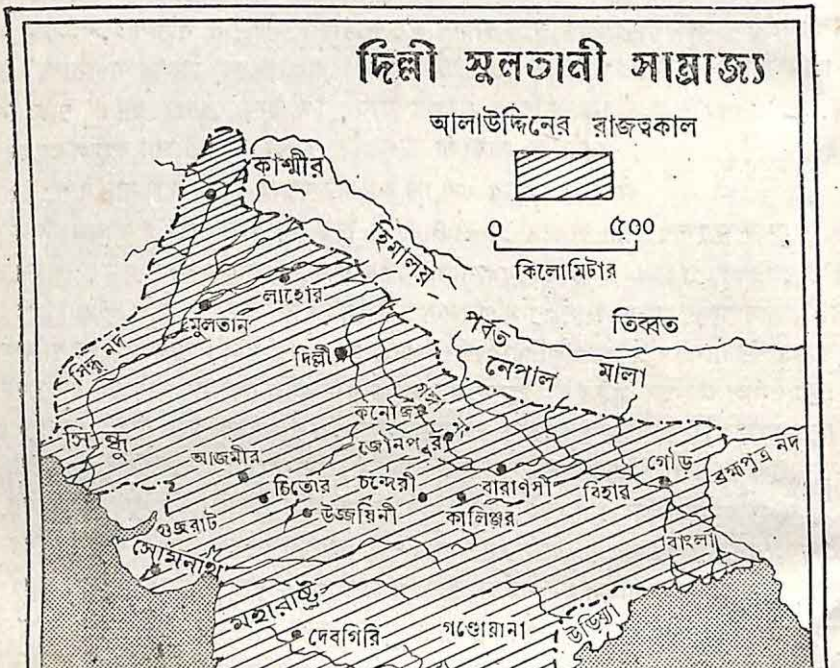
দক্ষিণে মালিক কাফুরের বিজয় অভিযান সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। তিনি দক্ষিণ ভারত জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন, হাতী, ঘোড়া দিল্লীতে লইয়া আসেন। দক্ষিণের রাজারা দিল্লী সুলতানীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদানেও স্বীকৃত হন। ইহাতে দিল্লী সুলতানীর রাজনৈতিক গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তবে দক্ষিণ ভারতের উপর দিল্লীর আধিপত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনী উত্তর ভারতে ফিরিয়া আসিলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি আবার স্বাধীন হইয়া যায় বা করদান বন্ধ করে।[১] তাঁহার পরবর্তী সুলতান মুবারক খল্‌জী ও মহম্মদ বিন তুঘলককে আবার নূতন করিয়া দক্ষিণ ভারত জয় করিতে হয়।

আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য নীতির দুর্বলতা

সুলতান বলবনের ন্যায় আলাউদ্দিনের রাজা ও রাজতন্ত্র সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি মনে করিতেন রাজা ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি। তিনি সাধারণ ব্যক্তি

(১) ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ, মোহাম্মদ হাবিব ও কে. এ. নিজামী সকলেই এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

নন। রাজার ক্ষমতা সীমাহীন। সুলতানী রাজ্যের দুইটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান—উলেমা ও অভিজাততন্ত্র সীমাহীন রাজতন্ত্রের পথে বাধার সৃষ্টি করে। আলাউদ্দিন



ঘোষণা করেন রাষ্ট্রাদর্শ ধর্মাদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। 'রাষ্ট্র ও জনগণের মঙ্গলের জন্য যাহা প্রয়োজন তিনি তাহাই করিবেন। ইহাতে ধর্মের অনুমোদন আছে কিনা

তাহা তিনি দেখিবেন না।'[১] সুলতানের ইচ্ছাই আইন। ধর্মীয় অনুশাসন এই আইনকে প্রভাবিত করিতে পারে না। এই নীতি অনুসরণ করিয়া আলাউদ্দিন দেশে স্বেচ্ছাচারী, নিয়ন্ত্রণহীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উলেমাদের প্রভাব খর্ব করা হয়। আমীরগণ নিজেদের সুলতানের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিত। আলাউদ্দিন অতি শক্তিশালী আমীরদের একে একে বন্দী ও হত্যা করিয়া নিজ ক্ষমতা নিরংকুশ করেন। তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আলাউদ্দিনের দমন ও পীড়ন মূলক আচরণের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা। জনগণের মঙ্গলের জন্য দেশে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। আলাউদ্দিন মনে করিতেন কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা ছাড়া দেশে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করিবার অন্য পথ নাই।

কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা ঃ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে হাজী মাওলার বিদ্রোহ, দিল্লীর উপকণ্ঠে স্থাপিত নব-মুসলমানদের রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং তাঁহার আত্মীয় আকাত খাঁর ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা তাঁহাকে নূতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করে। সুলতান দেশে বিদ্রোহ ও অরাজকতার চারিটি কারণ দেখিতে পান ঃ (১) সুলতানদের রাজকার্যে অবহেলা, (২) মদ্যপান, (৩) আমীরদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সামাজিক মেলামেশা ও (৪) সমাজের একশ্রেণীর হাতে অত্যধিক ধনসঞ্চয়। আলাউদ্দিন বিদ্রোহ ও অরাজকতার এই কারণগুলি দূর করিবার জন্য কয়েকটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ঃ (১) রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত জায়গীর, নিষ্কর ভূমি, পেনসন ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়। রাজকর্মচারীরা কঠোরভাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য করসমূহ নিয়মিতভাবে আদায় করিতে থাকে। ইহাতে একশ্রেণীর হাতে অত্যধিক ধনসঞ্চয় বন্ধ হয়। (২) আলাউদ্দিন গুপ্তচর বাহিনী নিয়োগ করিয়া আমীরদের কার্যকলাপ ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখেন। (৩) দেশে মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। সুলতান নিজে মদ্যপান ত্যাগ করেন। (৪) সুলতানের বিনা অনুমতিতে আমীরদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দেশে অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র ও প্রশাসনে সুলতান ছিলেন সর্বেসর্বা।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

আলাউদ্দিন রাজস্ব বিভাগে কিছু কিছু সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি জমি জরীপ করিয়া উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ (৫০%) রাজস্ব ধার্য করিবার নির্দেশ দেন। হিন্দু খুত, চৌধুরী ও মুকদ্দমরা ছিলেন এযুগের জমিদার। ইঁহারা রাজস্ব আদায় করিয়া রাজকোষে জমা দিতেন না। অধিকাংশ নিজেরা আত্মসাৎ করিতেন।

(১) 'I do not know whether this is lawful or unlawful ; whatever I think to be for the good of the state, or suitable for the emergency, that I decree.'

আলাউদ্দিন ইঁহাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি বাতিল করিয়া দেন। তাঁহাদের অধীনস্থ জমি জরীপ করিয়া রাজস্ব ধার্য করা হয়। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রের আয় বাড়াইবার জন্য আলাউদ্দিন গোচারণভূমি ও বাসস্থানের উপর দুইটি নূতন কর স্থাপন করেন। আলাউদ্দিনের ভূমি ও রাজস্ব সম্পর্কিত ব্যবস্থার ফলে আগেকার জমিদারেরা অনেকে দুস্থ হইয়া পড়েন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ রাজস্ব

আলাউদ্দিন যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার মূল ভিত্তি ছিল সামরিক বাহিনী। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁহাকে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে হয়। আলাউদ্দিনের সামরিক বাহিনীতে প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য ছিল। এই সৈন্যবাহিনীকে উচ্চ বেতন দেওয়া ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। আলাউদ্দিন তাঁহার সৈন্যদের অল্প বেতন দিতেন। এই অল্প বেতনে যাহাতে তাহারা সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারে সেইজন্য আলাউদ্দিন রাজধানীতে বাজার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের এক বিস্তৃত ব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন। তাঁহার বাজার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুইটি—কম ব্যয়ে জীবনযাপনের ব্যবস্থা এবং খাদ্যবস্তু ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ অব্যাহত রাখা।

আলাউদ্দিনের বাজার সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

আলাউদ্দিন সমস্ত খাদ্যবস্তু, সমস্ত রকম কাপড়, ঘোড়া, গরু, দাসদাসী, রুটি, শাক-সব্জী, জুতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ধার্য করিয়া দেন। তিনি দাম ধার্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করেন। দিওয়ান-ই রিয়াসত ও সাহানা-ই-মাণ্ডি নামক দুইজন অফিসার বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতেন। বণিকদের রাষ্ট্রীয় দপ্তরে নাম নথিবদ্ধ করিয়া লাইসেন্স লইতে হইত। সম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্র জামিন রাখিতে হইত। দুর্ভিক্ষ ও অনটনের দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় গুদামে খাদ্যশস্য ও কাপড় মজুত থাকিত। আলাউদ্দিনের ব্যবস্থায় মজুতদারী ও অতি মুনাফা নিষিদ্ধ হয়। আলাউদ্দিনের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়ঃ (১) দ্রব্যমূল্য নির্দিষ্ট ও সস্তা। (২) রেশনিং ব্যবস্থা। বরণী লিখিয়াছেন দেশে খরা ও শস্যাভাব থাকা সত্ত্বেও রাজধানীতে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব ছিল না। (৩) বাজার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রয়োগ। বরণী আলাউদ্দিনের বাজার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে এযুগের 'এক বিস্ময়কর ঘটনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যে উদ্দেশ্য লইয়া আলাউদ্দিন দ্রব্যমূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন তাহা সফল হয়। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন রাজধানীতে জিনিস-পত্রের দাম সস্তা ছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ অব্যাহত ছিল। দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব ছিল না। সৈন্যবাহিনী ও দিল্লীর লোকেরা সুখে ও স্বস্তিতে জীবনযাপন করিত। ইহা নিঃসন্দেহে আলাউদ্দিনের উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দেয়। তবে রাজধানী

ও সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থার ফলে দেশের কৃষি ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বণিকদের জন্য যে সামান্য মুনাফার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায়। দমন পীড়ন মূলক ব্যবস্থায় তাহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কৃষকরা জমির উৎপন্ন শস্যের পঞ্চাশ শতাংশ সরকারী রাজস্ব হিসাবে দিত। বাকী শস্য নির্দিষ্ট দামে বণিকদের নিকট বিক্রয় করিতে হইত। অথচ তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে হইত। রাজধানীর বাহিরে বাজার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছিল না। ইহাতে কৃষক সমাজে অবশ্যই অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজধানী ও সৈন্যবাহিনীর জন্য সমস্ত দেশের উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। অর্থনীতির চাহিদা ও সরবরাহ সূত্র অস্বীকার করিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করিবার ফলে আলাউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটে।[১]

ফলাফল

জিয়াউদ্দিন বরণীর মতে সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী ছিলেন মিশরের ফারাওদের চেয়েও নিষ্ঠুর ও রক্ত পিপাসু। বিরোধীদের তিনি নিষ্ঠুরভাবে দমন করিয়াছিলেন। সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার শাসনব্যবস্থা জনগণের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জন করিতে পারে নাই। তবে নিষ্ঠুর ও কঠোর প্রকৃতির এই সুলতান শিল্পী, কবি, পণ্ডিত ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি আমীর খসরু ও হাসান তাঁহার আনুকূল্য লাভ করেন। দিল্লীর কুতুবমিনারে আলাই দরওয়াজা নির্মাণ ও নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি পার্শ্বে জামাতখানা মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা তাঁহার আমলে ঘটে। আলাউদ্দিনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হইল সারা ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সুলতানী যুগে তিনি ছিলেন সবচেযে বড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। যোদ্ধা ও রণনিপুণ সেনাপতি হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। শাসক হিসাবেও তিনি ছিলেন সুলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁহার শাসন সংস্কারের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য—সামরিক সংস্কার ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা—পরবর্তীকালের শাসকগণ অনুসরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট শের শাহ্‌ আলাউদ্দিনের সামরিক সংস্কারগুলি—দাগ, হুলিয়া, নগদ বেতন, দান ব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবরের রাজস্বমন্ত্রী তোডরমল যে ভূমিব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন সেখানে আলাউদ্দিনের ভূমি-সংস্কারের প্রভাব স্পষ্ট। দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত বিদ্রোহ দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মোঙ্গল আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া আলাউদ্দিন কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তবে সমকালীন ঐতিহাসিক শেখ বসীর দিবানা মন্তব্য করিয়াছেন যে আলাউদ্দিনের স্বৈরাচারী শাসনের ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। জনসমর্থন ও আনুগত্যের অভাবে তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই খল্‌জী শাসনের অবসান ঘটে।[২]

আলাউদ্দিনের চরিত্র ও কৃতিত্ব

---

(১) K. S. Lal, History of the Khaljis দ্রষ্টব্য

(২) আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর (১৩১৬) খল্‌জী শাসন মাত্র চারি বৎসর টিকিয়া ছিল। ১৩২০ খ্রীঃ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ক্ষমতা দখল করিয়া তুঘলক বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক, তৈমুরের আক্রমণ, সৈয়দ ও লোদী শাসকগণ

(Muhammad bin Tughluq, Firuz Tughluq, Timur's invasion, The Sayyids and Lodis)

সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জির মৃত্যুর (১৩১৬) চারি বৎসরের মধ্যে খল্‌জী শাসনের অবসান ঘটে। তাঁহার দুর্বল বংশধর কুতবুদ্দিন মুবারক খল্‌জীর রাজত্বকালে (১৩১৬-২০) শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেশে বিশৃংখলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত চলিতে থাকে। এই গোলযোগের সুযোগে খসরু শাহ্ নামক জনৈক ব্যক্তি সুলতান মুবারককে হত্যা করিয়া ক্ষমতা দখল করেন। খসরু শাহ্ মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করিবার পর দিপালপুরের শাসনকর্তা তুঘলক বংশীয় গাজী মালিক দিল্লী দখল করেন। সুলতান হইবার পর তাঁহার উপাধি হয় গিয়াসউদ্দিন তুঘলক। পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৩২৫ খ্রীঃ গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু হয়।[১] তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনা খাঁ সিংহাসন লাভ করেন। ইঁনি ইতিহাসে মহম্মদ বিন তুঘলক নামে পরিচিত। পূর্বে আসাম ও উত্তর-পশ্চিমে বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তান ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন।

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা

মহম্মদ বিন তুঘলক (Muhammad bin Tughluq—১৩২৫-১৩৫১):
সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন দোষ ও গুণের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন তাত্ত্বিক ও স্বপ্নদর্শী মানুষ। মানব চরিত্র ও বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়নে তিনি ব্যর্থ হন। তাঁহার উদ্ভাবনী প্রতিভা নূতন নূতন পরিকল্পনা রচনা করিত। জনগণ তাহা গ্রহণ না করিলে তিনি ক্ষিপ্ত হইতেন। জনগণের মানসিকতা বুঝিবার ধৈর্য তাঁহার ছিল না। ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন তাঁহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন। সমসাময়িক জিয়াউদ্দিন বরণী বা ইবুন বতুতা তাঁহার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা বা পাগলামীর কোন লক্ষণ দেখেন নাই। ইবুন বতুতা শুধু তাঁহার নিষ্ঠুরতার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ



মহম্মদ বিন তুঘলক

(১) অনেকে মনে করেন সুলতান গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর জন্য পুত্র জুনা খাঁ অনেকাংশে দায়ী ছিলেন।

করিয়াছেন। ঐতিহাসিক লেনপুল[1] মনে করেন সুলতানের জনগণের মঙ্গল করিবার শুভ ইচ্ছা, উন্নত চিন্তা সবই ছিল। শুধু ছিল না মানসিক ভারসাম্য, ধৈর্য ও পরিমিতিবোধ। এইজন্য তিনি চরম ব্যর্থ হন (with the best intentions, excellent ideas but no balance or patience, no sense of proportion, Muhammad bin Tughlak was a transcendent failure)। সুলতানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হইল এই যে, তিনি জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোন মূল্য দেন নাই।

১৩৩১ খ্রীঃ সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির জন্য সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দোয়াব অঞ্চলে নূতন কর স্থাপন করেন। এই সময় দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। ইহা সত্ত্বেও সুলতানের নির্দেশে সরকারী কর্মচারীরা কঠোর-ভাবে সরকারী প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিতে থাকে। সরকারী নীতির কঠোরতায় কৃষকরা দলে দলে এই অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া যায়। সুলতান কৃষকদের দুর্দশার কথা জানিতে পারিয়া কৃষি ঋণ ও জলসেচের ব্যবস্থা করেন। এ সমস্ত ব্যবস্থা অনেক বিলম্বে গ্রহণ করায় এ অঞ্চলে কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। দোয়াবের কৃষকগণ সরকারের সহিত সহযোগিতা না করায় সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের শাস্তি দেন। ইহাতে তাঁহার ভাবমূর্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুলতানের রাজত্বকালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর। তিনি দেবগিরির নাম পরিবর্তন করিয়া রাখেন দৌলতাবাদ। তিনটি কারণে রাজধানী স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দেয়: (১) দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পর দিল্লী আর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু রহিল না। সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে রাজধানী স্থাপিত হইলে শাসনের সুবিধা হয়। (২) দিল্লী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিকট অবস্থিত হওয়ায় মোঙ্গলগণ সহজেই দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিত। ইহাতে রাজধানীর নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইত। (৩) সর্বোপরি, দক্ষিণ ভারতে মুসলমান শাসনের প্রভাব ছিল খুব সামান্য। মুসলমান শাসন সেখানে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বেশী সংখ্যায় মুসলমানদের দক্ষিণ ভারতে উপস্থিতি অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। সুলতান এইসব কারণে দিল্লীর জনগণকে দৌলতাবাদে যাইবার নির্দেশ দেন। অনিচ্ছুক ব্যক্তিদেরও তিনি নূতন রাজধানীতে যাইতে বাধ্য করেন। রাজধানী স্থানান্তরের জন্য রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় হয়। কিছুকাল পরে সুলতানের দৌলতাবাদ ভাল লাগিল না। তিনি আবার দিল্লীতে ফিরিবার আদেশ দিলেন। সাতশত মাইল দীর্ঘ দিল্লী-দৌলতাবাদ পথে যাতায়াতে বহু লোক প্রাণ হারাইল এবং রাজধানী দিল্লীরও পূর্ব গৌরব আর রহিল না।

প্রশাসনিক কাজকর্ম: দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি

রাজধানী স্থানান্তর

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তামার নোটের প্রচলন। সুলতান মুদ্রাব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে ভালবাসিতেন। এই

(১) Stanley Lane-Poole, Medieval India under Mohammadan Rule.

সময় পারস্য ও চীনদেশে তামার নোটের প্রচলন হয়। ঐ সময় দেশে রূপার দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়। গার্ডনার ব্রাউন মন্তব্য করিয়াছেন যে চতুর্দশ শতকে সারা পৃথিবীতে রূপার সরবরাহে অবনতি দেখা দেয়। এজন্য সুলতান প্রতীক মুদ্রা প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া শাসন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সুলতানের বাড়তি অর্থের প্রয়োজন ছিল। তিনি তামার প্রতীক মুদ্রার প্রচলনের আদেশ জারী করেন। তিনটি কারণে সুলতানের মুদ্রাব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ঃ (১) জনগণ উন্নত প্রতীক মুদ্রার (token currency) তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারে নাই। (২) সরকারের স্থায়িত্বের উপর প্রতীক মুদ্রার সাফল্য নির্ভর করে। চতুর্দশ শতকে সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। জনগণ সরকারের স্থায়িত্বে বিশ্বাস করিত না। (৩) সুলতান এই মুদ্রা জাল করার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন। ফলে বহু লোক মুদ্রা জাল করিয়া এই মুদ্রার পতন ঘটায়। বণিকগণ তামার মুদ্রা লইতে অস্বীকার করিলে লেনদেন বন্ধ হইবার উপক্রম হয় এবং দেশে আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। সুলতান সোনা ও রূপার মুদ্রার বিনিময়ে সমস্ত তাম্র মুদ্রা রাজকোষে ফেরত লইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে রাষ্ট্রের বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়।

তামার নোটের প্রচলন

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেন। তিনি খোরাসান (ইরান) ও ইরাক জয়ের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বিশাল সৈন্য-বাহিনী গঠন করা হয়। এক বৎসর ধরিয়া বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করিবার পর পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায় সুলতান খোরাসান ও ইরাক জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। সামরিক খাতে রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় হয়। সুলতান চীন ও ভারতের মধ্যবর্তী কারাচল বা কারাজল প্রদেশে (বর্তমান কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অঞ্চল) এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই সামরিক অভিযান পার্বত্য জাতিগুলিকে পরাস্ত করিলেও সমস্ত সৈন্যবাহিনী শীত ও খাদ্যাভাবে ধ্বংস হইয়া যায়। সুলতানের এই সমস্ত ব্যর্থ পরিকল্পনার ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বাংলায় ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অযোধ্যা ও সিন্ধুপ্রদেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহ করেন। মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল নেতা তারমাশিরিন খান ভারতে প্রবেশ করেন। সম্ভবতঃ সুলতান তাহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন-কালে ১৩৫১ খ্রীঃ সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যু হয়। বদায়ুনী মন্তব্য করিয়াছেন 'সুলতান জনগণের হাত হইতে এবং জনগণ সুলতানের হাত হইতে বাঁচিল।'[১]

দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা

মহম্মদ বিন তুঘলক ভারত ইতিহাসের এক বিস্ময়কর চরিত্র। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বরণী ও ইবন বতুতা তাঁহার গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

(১) 'The king was freed from his people and they from their king.'

সুলতানী আমলের শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিদ্বান ব্যক্তি। আরবী ও ফার্সী ভাষা, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি ছিলেন পারদর্শী। ব্যক্তিগত জীবনে সুলতান ছিলেন নিষ্কলঙ্ক। মদ্যপান বা ব্যভিচারের কোন কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। গুরুজন, গুণী ব্যক্তি, দার্শনিক, ধর্মীয় নেতা ও পণ্ডিতদের তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। অকাতরে অজস্র দান করিতেন। ইব্‌ন বতুতা লিখিয়াছেন সুলতান কঠোরভাবে নিজ ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন। তবে রাষ্ট্র পরিচালনায় উলেমাদের পরামর্শ তিনি মানিতেন না। এইজন্য উলেমাগোষ্ঠী তাঁহার উপর ক্ষুণ্ণ হয়। আমীরদের তিনি অবিশ্বাস করিতেন। নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের সহায়তায় তিনি প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করিতেন। তুর্কী অভিজাতগণ এইজন্য সুলতানকে পছন্দ করিতেন না। সমকালীন সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে জানা যায় মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও পরিশ্রমী শাসক। ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বহু হিন্দুকে তিনি উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু, জৈন ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায় ধর্মাচরণে ও মত প্রকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত।[১] আকবর ব্যতীত আর কোন মধ্যযুগীয় শাসক ধর্ম সম্পর্কে এত উদার ছিলেন না। দিল্লী সুলতানীর দুই প্রভাবশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী —উলেমা ও আমীর-সুলতানের উদার রাষ্ট্র-নীতির বিরোধিতা করে। অস্বীকার করা যায় না উলেমা ও আমীরদের বিরোধিতা তাঁহার শাসনের ব্যর্থতার জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল।

মহম্মদ বিন তুঘলকের কৃতিত্ব

ফিরোজ তুঘলক (Firuz Tughluq—১৩৫১-১৩৮৮) ঃ মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্য পুত্র ফিরোজ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ছিলেন সুলতানী যুগের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক। মুঘল যুগের পূর্বে ফিরোজ তুঘলক ছিলেন সবচেয়ে জনকল্যাণকামী শাসক। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মতে তাঁহার দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসরের রাজত্বকালে দেশে সুখ ও সমৃদ্ধি ছিল।[২] জনগণ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করিত। ফিরোজ তাঁহার পূর্ববর্তী শাসক মহম্মদ বিন তুঘলকের মত দক্ষ সেনাপতি ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলাদেশ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইয়া যায়। সুলতান দুইবার বাংলায় অভিযান পরিচালনা করিয়া ব্যর্থ হন। হরিয়ানার নগরকোট ও উড়িষ্যায় অভিযান চালাইয়া অবশ্য তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। সিন্ধুপ্রদেশ ও রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহ তিনি দমন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারত সুলতানী সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যায়। সুলতান ইহা পুনরায় অধিকারের চেষ্টা করেন নাই।

---

(১) Mahdi Hussain, The Tughluq Dynasty দ্রষ্টব্য।

(২) শাম্‌স-ই সিরাজ আফিফ ও জিয়াউদ্দিন বরণী এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুলতান ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালে সুলতানী শাসনব্যবস্থায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। সুলতান ছিলেন একজন ধর্মভীরু মুসলমান। তিনি নিজেকে খলিফার প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেন। উলেমাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রনীতি ঠিক করিতেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজী ও মহম্মদ বিন তুঘলক রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে বিভাজন রেখা মানিতেন। ফিরোজ তুঘলক এ বিভাজন রেখা তুলিয়া দেন। ধর্মাদর্শই তাঁহার নিকট রাষ্ট্রাদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। আলাউদ্দিন খলজী দেশে জাগীরব্যবস্থা রহিত করিয়া উচ্চ রাজকর্মচারীদের নগদ বেতন দেওয়ার নীতি চালু করিয়াছিলেন। ফিরোজ তুঘলক উচ্চ রাজকর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর লোকেদের বেতনের পরিবর্তে জাগীর দানের ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করেন। ইহাতে পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। দেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা জোরদার হয়।

নূতন রাষ্ট্রাদর্শ ও রাষ্ট্রনীতি

সুলতান ফিরোজ তুঘলকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হইল শাসনব্যবস্থায় জনকল্যাণকর নীতির প্রবর্তন। তিনি জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সাম্রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন। সুলতানের আত্মজীবনী 'ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহী'তে তিনি এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সুলতান সারা দেশে বহু উৎপীড়নমূলক কর ও সেস তুলিয়া দেন। কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী মাত্র চারিটি কর খারাজ (দশ শতাংশ ভূমিকর), জাকাত (মুসলমানদের দেয় আয়কর), জিজিয়া (অ-মুসলমানদের দেয় কর) ও খোমস (খনিজ ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় অংশ) স্থাপন করেন। উলেমাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি অতিরিক্ত সেচকর স্থাপন করিয়াছিলেন। অভ্যন্তরীণ শুল্ক ও অন্যান্য স্থানীয় কর রহিত করিবার ফলে দেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যাওয়ায় জনসাধারণ সুখ ও সমৃদ্ধিতে জীবনযাপন করিতে থাকে। কর ব্যবস্থার সংস্কার ছাড়াও সুলতান ফিরোজ তুঘলক আরও কতকগুলি জনহিতকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লী ও পাঞ্জাবের বিস্তৃত অঞ্চলে পাঁচটি দীর্ঘ খাল খনন করাইয়া তিনি কৃষির উন্নতিতে সাহায্য করেন। এই অঞ্চলের সমস্ত পতিত জমি চাষের আওতায় আসে। সুলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ফিরোজ তুঘলক অনেকগুলি শহর, প্রাসাদ, রাস্তা, সরাইখানা, উদ্যান, জলাধার, হাসপাতাল, মসজিদ, সেতু ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জৌনপুর, ফতেহাবাদ, ফিরোজপুর প্রভৃতি শহর নির্মিত হয়। নির্মাণকার্যে তাহার অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঐতিহাসিক উলসলি হেগ তাঁহাকে রোমান সম্রাট অগাস্টাসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রাজধানী দিল্লীতে বারশত উদ্যান প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। সুলতান শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনটি কলেজ ও ত্রিশটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজকোষ হইতে নিয়মিত অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

জনকল্যাণকর ব্যবস্থা-সমূহ

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও জনগণের মঙ্গলের জন্য সুলতান ফিরোজ তুঘলক আরও কতকগুলি প্রশাসনিক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সারা দেশের ক্রীতদাসদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। এই বিভাগের অধীনে তাহাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। দেশের দুস্থ, অনাথ ও বিধবাদের সাহায্য করিবার জন্য পৃথক 'দিওয়ান-ই-খয়রাত' বিভাগ স্থাপিত হয়। কর্মহীনদের কর্মের সংস্থান করিবার জন্য 'কর্মবিভাগ' (employment bureau) খোলা হয়। 'দারুল সাফা' বা রাষ্ট্রীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সুলতান রাজধানীতে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পূর্ববর্তী সুলতানদের নিষ্ঠুর নির্যাতনমূলক বিচারব্যবস্থার সংস্কার করিয়া তিনি দণ্ড ব্যবস্থায় শারীরিক নির্যাতন ও অঙ্গচ্ছেদ প্রথা রহিত করেন। দেশের বিচারব্যবস্থা উদার ও মানবিক করা হয়। এই সমস্ত সংস্কার কার্যের জন্য স্যার হেনরী ইলিয়ট সুলতান ফিরোজ তুঘলককে 'সুলতানী যুগের আকবর' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই রকম তুলনা অবশ্য সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। মুঘল সম্রাট আকবর সামরিক প্রতিভায়, শাসনকার্যে ও মানবিক গুণে সুলতান ফিরোজ তুঘলক অপেক্ষা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ফিরোজ তুঘলকের গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনী দুর্বল হইয়া পড়ে। শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি ও দুর্বলতা দেখা দেয়। দেশে সামন্তপ্রথা শক্তিশালী হয়। সুলতান হিন্দু ও শিয়াদের প্রতি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা দেখান নাই। তাঁহার দুর্বল ব্যক্তিত্ব তুঘলক বংশের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী একথা অস্বীকার করা যায় না।

প্রশাসনিক সংস্কার

তৈমুরের ভারত আক্রমণ ঃ সুলতান ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পর ঐ বংশে আর কোন যোগ্য শাসকের আবির্ভাব হয় নাই। তুঘলক সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তুর্কী আমীরগণ ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও হিন্দু সামন্ত রাজারা একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে থাকে। সুলতানী রাজ্য ক্রমশঃ দুবল ও ক্ষুদ্রায়তন হইয়া পড়ে। তুঘলক বংশের এই ঘোর দুর্দিনে সমরকন্দের চাগতাই বংশীয় তুর্কী দিগ্বিজয়ী বীর আমীর তৈমুর দিল্লী আক্রমণ করেন। মধ্য এশিয়ার এই দুর্ধর্ষ সমরনায়ক খোঁড়া ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে তিনি তৈমুর লঙ্ নামে খ্যাত। ১৩৯৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে তৈমুর বিনা বাধায় দিল্লীতে প্রবেশ করিলে তুঘলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ গুজরাটে পলাইয়া যান। দিল্লীতে অবস্থানকালে তৈমুর লঙ্ একলক্ষ লোককে হত্যা করেন। কয়েকদিন ধরিয়া দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্নসহ তৈমুর সমরকন্দে ফিরিয়া যান। তৈমুরের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর দিল্লীতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। ইহাতে বহু লোক প্রাণ হারায়। তুর্কী আমীরদের কলহ, ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপরতা, সুলতানদের অপদার্থতা, প্রশাসনিক অব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা ধীরে ধীরে তুঘলক বংশের পতনের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তৈমুরের ভারত আক্রমণের অব্যবহিত পরে তুঘলক বংশের পতন সম্পূর্ণ হয়। এই বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ

দিল্লীতে নামমাত্র সুলতান হিসাবে ১৪১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত টিকিয়াছিলেন। দিল্লীর অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ একে একে স্বাধীন হইয়া যায়।

সৈয়দ ও লোদী বংশ ঃ তুঘলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির উপর সৈয়দ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তৈমুরের প্রতিনিধি হিসাবে সৈয়দ বংশীয় খিজর খাঁ লাহোর ও মুলতান শাসন করিতেন। তিনি দিল্লী অধিকার করিয়া সৈয়দ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৪২১ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুলতান খিজর খাঁয়ের মৃত্যুর পর একে একে মুবারক শাহ (১৪২১-১৪৩৪), মুহম্মদ শাহ (১৪৩৪-১৪৪৫) ও আলাউদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৫-১৪৫১) দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল শাসন করেন। সৈয়দ বংশের শাসনকালে দেশে নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য দুইই নষ্ট হইয়া যায়। ১৪৫১ খ্রীঃ শেষ সৈয়দ বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিন আলম্ শাহ্ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন। পাঞ্জাব ও সরহিন্দের লোদী শাসক বহলুল দিল্লীর সুলতান হন। তিনিই লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

সৈয়দ বংশ : ১৪১৪-১৪৫১

লোদীরা ছিল জাতিতে আফগান। এই বংশের তিনজন শাসক পরপর দিল্লীর সুলতান হন। প্রথম সুলতান বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯) দিল্লী সুলতানীর হৃত গৌরব ও মর্যাদা খানিকটা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে শাসনব্যবস্থায় শৃংখলা ফিরিয়া আসে। সুলতান বহলুল লোদীর পুত্র সিকান্দর শাহ্ (১৪৮৯-১৫১৭) ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি পার্শ্ববর্তী সামন্তরাজাদের পুনরায় দিল্লীর অধীনে স্থাপন করিতে সক্ষম হন। সুলতান সিকান্দার শাহ্ ছিলেন ন্যায় বিচারক, গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক ও দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁহার রাজত্বকালে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে। লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর (১৫১৭-১৫২৬) সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল। তবে তিনি ছিলেন উগ্র প্রকৃতির ও অবিবেচক। তাঁহার উদ্ধত আচরণের জন্য আত্মীয়-স্বজন প্রায় সকলেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হন। আমীরদের প্রতি দমন ও উৎপীড়ন মূলক ব্যবহার তাঁহার সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। পাঞ্জাবের গভর্ণর দৌলত খাঁ লোদী ও সুলতানের আত্মীয় আলম খাঁয়ের আমন্ত্রণে তৈমুর বংশীয় কাবুলের তুর্কী শাসক জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর ভারত আক্রমণ করেন। ১৫২৬ খ্রীঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাবর দিল্লী অধিকার করেন। দিল্লীতে সুলতানী যুগের অবসান ও মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

লোদী বংশ : ১৪৫১-১৫২৬

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ—**(ক) মিনহাজ-উস-সিরাজ কে ছিলেন? (খ) তারিখ-ই-ফকরুদ্দিন মুবারক শাহীর লেখক কে? (গ) আমীর খসরুর ইতিহাস গ্রন্থের নাম কি? (ঘ) 'হিন্দুস্তানের তোতাপাখী' কাহাকে বলা হয়? (ঙ) জিয়াউদ্দিন বরণীর গ্রন্থের নাম কি? চ) ইবন বতুতা কাহার রাজত্বকালে ভারতে আসেন? তাঁহার গ্রন্থের নাম কি? (ছ) তাজ-উল-মাসীরের লেখক কে? (জ) মার্কোপোলো ও নিকো-লোকন্তি কখন ভারতে আসেন? (ঝ) মাহ্‌ব্রান কে? (ঞ) পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করে? (ট) আরবরা কত খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ জয় করেন? (ঠ) দিল্লী সুলতানী কখন শুরু হয়? (ড) তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কর। (ঢ) খল্‌জী বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (ণ) সৈয়দ বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (ত) লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন? (থ) তৈমুরের ভারত আক্রমণকালে দিল্লীর সুলতান কে ছিলেন? (দ) তৈমুর কত খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন? (ধ) প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কোন্ বৎসর হইয়াছিল?

২। **সংক্ষেপে আলোচনা কর ঃ—**(ক) ভারতের মধ্যযুগকে মুসলিম যুগ বলা যায় না কেন? (খ) আল বিরূণী ভারত সম্পর্কে কিরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন? (গ) সিন্ধুদেশে আরব অভিযানের বিবরণ দাও। ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল? (ঘ) মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? (ঙ) গজনীর সুলতান মাহমুদ কেন ভারত আক্রমণ করেন? তাঁহার আক্রমণের ফলাফল কি হইয়াছিল? (চ) দিল্লী সুলতানীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁহার পরিচয় দাও। (ছ) প্রথমদিকের সুলতানগণ কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হন? (জ) আলাউদ্দিন খল্‌জীর প্রশাসনিক সংস্কারগুলির পরিচয় দাও। (ঝ) আলাউদ্দিনের চরিত্র বিচার কর।

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর ঃ—**(ক) সুলতানী যুগের ঐতিহাসিক উপাদানগুলির উপর একটি প্রবন্ধ লিখ। (খ) সম্রাট আলাউদ্দিন খল্‌জীর সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিচয় দাও। (গ) সম্রাট আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক সংস্কারগুলির পরিচয় দাও। ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল? (ঘ) মহম্মদ তুঘলকের কার্যাবলীর বিবরণ দাও। তাঁহার ব্যর্থতার কারণ কি? (ঙ) ফিরোজ তুঘলকের সংস্কারগুলির বর্ণনা দাও। তাঁহাকে 'দ্বিতীয় আকবর' বলা যায় কি?

৪। **টীকা লিখ ঃ—**(ক) আলাউদ্দিনের সামরিক সংস্কার (খ) দিওয়ান-ই-রিয়াসাত ও সাহানা-ই-মাণ্ডি (গ) চিঙ্গিজ খান (ঘ) কুতুবমিনার (ঙ) আলাই দরওয়াজা (চ) তৈমুর লঙ্।

৫। **ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ কর ঃ—** (ক) দেবগিরি খ) বরঙ্গল (গ) হৈসল রাজ্য (ঘ) মাদুরা (ঙ) চিতোর (চ) গুজরাট (ছ) রণথম্ভোর (জ) কালিঞ্জর (ঝ) উজ্জয়িনী।

৬। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—**(ক) ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহীর লেখক সুলতান —। (খ) সুলতান মাহমুদ ও তৈমুরের — হইতে ভারত ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। (গ) মুহম্মদ বিন্ কাশিমের সিন্ধুদেশ আক্রমণকালে ঐ অঞ্চলে — রাজত্ব করিতেন। (ঘ) পাঞ্জাবের শাহী রাজাদের রাজধানী ছিল —। (ঙ) ফিরদৌসী, আনসারী, উৎবী — আনুকূল্য লাভ করেন। (চ) ১১৯২ খ্রীঃ মুহম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে — দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। (ছ) তাজউদ্দিন ইলদিজ — শাসক ছিলেন। (জ) জাফর খান, নসরত খান — সেনাপতি ছিলেন। (ঝ) — সুলতানী যুগের 'লৌহ মানব' বলা হয়।

৭। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও ঃ—**(ক) মেবারের রাণা রতন সিংহের / অজিত সিংহের রাজত্বকালে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। (খ) আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর / উলুখ খান ও নসরত খান গুজরাট আক্রমণ করেন। (গ) সুদূর দক্ষিণে ছিল পাণ্ড্য / হৈসল রাজ্য। (ঘ) বলবন / আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে নব মুসলমানদের বিদ্রোহ ঘটে। (ঙ) খুত, মুকদ্দম, চৌধুরীরা ছিলেন সরকারী কর্মচারী / জমিদার। (চ) বলবন / আলাউদ্দিন / মহম্মদ বিন তুঘলক তামার নোটের প্রচলন করেন। (ছ) মহম্মদ বিন তুঘলক / ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালে দাসদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা হয়।

নবম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

(Rise of some Regional Powers)

বাংলা ঃ

দিল্লী সুলতানীর শুরু হইতে বাংলাদেশে দিল্লীর আধিপত্য কখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাংলার প্রাদেশিক শাসকগণ নামমাত্র দিল্লীর অধীন ছিলেন। সুযোগ পাইলেই দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করিয়া তাঁহারা স্বাধীন হইতেন। দিল্লী হইতে বাংলার দূরত্ব ও বাংলার অফুরন্ত সম্পদ প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ করিতে উৎসাহ দিত। সুলতান ইলতুৎমিশ ও বলবন উভয়েই বাংলার শাসকদের লইয়া বিব্রত ছিলেন। বলবনের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে বাংলা কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া যায়।

সুলতানী আমলে বাংলা

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলা পুনরায় দখল করিয়া সমগ্র দেশকে তিনভাগে বিভক্ত করেন—লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁ ও সোনারগাঁ। উত্তরবঙ্গের রাজধানী হয় লক্ষ্মণাবতী, পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁ এবং দক্ষিণবঙ্গের সাতগাঁ। এইরকম প্রশাসনিক বিভাজনের ব্যবস্থা করিয়াও বাংলাকে দমন করা সম্ভব হয় নাই। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতে অরাজকতার সুযোগ লইয়া হাজী ইলিয়াস নামক একজন আমীর ১৩৩২ খ্রীঃ বাংলায় স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া হাজী ইলিয়াস সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। মালদহ জেলার পান্ডুয়ায় স্বাধীন বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়।

সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী বিহারের অঞ্চলসমূহ গোরখপুর, চম্পারণ, ত্রিহুত প্রভৃতি জয় করিয়া বাংলার অধিকারভুক্ত করেন। নেপাল ও উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করা হয়। পূর্বে সোনারগাঁ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ্‌কে বিতাড়িত করিয়া ইলিয়াস শাহ্ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের

সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ ১৩৪২-১৩৫৭

শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলক তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। ইলিয়াস শাহ্ সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করিয়া দিনাজপুরের একডালা দুর্গে আশ্রয় লন। ফিরোজ তুঘলকের সৈন্যবাহিনী একডালা দুর্গ দখল করিতে পারে নাই। তুলতান ইলিয়াস শাহের সহিত সন্ধি করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া যান। ইলিয়াস শাহ্ বাংলার স্বাধীন সুলতান রহিলেন। ফিরোজ তুঘলকের প্রত্যাবর্তনের পর ইলিয়াস শাহ্ কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া কামরূপ দখল করিয়া

লন। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। জনগণের মধ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে। বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলার পরবর্তী সুলতান হন সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দর শাহ্। তিনি পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী ও যোগ্য শাসক ছিলেন। ত্রিশ বৎসরের অধিককাল তিনি বাংলার সুলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দিল্লীর আক্রমণ হইতে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলক তাঁহার প্রথমবারের ব্যর্থ অভিযানের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি সিকান্দর শাহের রাজত্বকালে আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। সিকান্দর শাহ্ তাঁহার পিতার ন্যায় দিল্লী বাহিনীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া যান। একডালা দুর্গে আশ্রয় লইয়া তিনি কালহরণ করিতে থাকেন। ফিরোজ তুঘলক সিকান্দর শাহ্কে পরাস্ত করিতে ব্যর্থ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব দেন। দিল্লী ও বাংলার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ইহার পর প্রায় দুইশত বৎসর বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল। দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে সিকান্দর শাহ্ গঠনমূলক কার্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি দামাস্কাসের মসজিদের অনুকরণে রাজধানীতে এক বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ তাঁহার রাজত্বকালে নির্মিত হয়।

সিকান্দর শাহ্ঃ
১৩৫৮-১৩৮৯

সিকান্দর শাহের পর তাঁহার পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ বাংলার সুলতান হন। আসাম বুরানজী হইতে জানা যায় আজম শাহের রাজত্বকালে আসাম ও কামতাপুর বা কুচবিহারের সহিত বাংলার সংঘর্ষ ঘটে। তিনি জৌনপুরের সুলতান খাজা জাহানের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি চীনদেশের সম্রাটের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। এই দূতের সহিত চৈনিক দূত মাহুয়ান বাংলায় আসেন (১৪০৬)। তাঁহার বিবরণী হইতে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ ছিলেন ন্যায় বিচারক। তাঁহার ন্যায় বিচারের নানা কাহিনী বাংলাদেশে কিংবদন্তীর রূপ পাইয়াছে। কাব্য ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এই সুলতান সিরাজের বিখ্যাত কবি হাফিজের সহিত পত্রালাপ করিতেন।

গিয়াসউদ্দিন আজম
শাহ্ঃ ১৩৮৯-১৪০৯

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে আবার অরাজকতা শুরু হয়। দিনাজপুর ও ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ ক্ষমতা দখল করিয়া নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার উপাধি হয় 'দনুজমর্দনদেব'। রাজা গণেশ ও তাঁহার বংশ ১৪৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলাদেশে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা গণেশের পুত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া নাম নেন জালালুদ্দিন মুহম্মদ। ইঁহাদের রাজত্বের অবসানে ইলিয়াস শাহের বংশধররা আবার ক্ষমতা লাভ করেন। শেষ পর্বে ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ ১৪৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে হাবসী বা আবিসিনীয় ক্রীতদাসরা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। অনেক

রাজা গণেশ,
জালালুদ্দিন ও হাবসী
মুজাফফর শাহের শাসন

গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়া ইহারা প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়। শেষ পর্বের ইলিয়স শাহী সুলতানরা ছিলেন ইহাদের হাতে ক্ষমতাহীন পুত্তলিকামাত্র। ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ্‌কে হত্যা করিয়া হাবসী মুজাফফর শাহ্‌ ১৪৯০ খ্রীঃ বাংলার মসনদ দখল করেন। অত্যাচারী মুজাফফর শাহ্‌কে পদচ্যুত করিয়া আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌ নামক আরবদেশীয় একজন আমীর ১৪৯৩ খ্রীঃ বাংলার সুলতান হন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ :

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌ বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। ইনি বাংলার নবযুগের স্রষ্টা। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলাদেশে অন্ধকারময় যুগের অবসান এবং সুখ, শান্তি ও জ্ঞানদীপ্তির সূচনা হয়। জ্ঞানী, বিবেচক, সুদক্ষ শাসক ও বীর যোদ্ধা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌ অল্পকালের মধ্যে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। তিনি রাজধানীতে অশান্তির উৎস হাবসী প্রাসাদ রক্ষীবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেন। হাবসীরা দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। বাংলার স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতদের মধ্য হইতে প্রকৃত গুণী ব্যক্তিদের মনোনীত করিয়া তিনি দেশের সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগ করেন। জৌনপুরের পরাজিত ও বিতাড়িত শাসক হুসেন শাহ্‌ শর্কীকে তিনি বাংলায় আশ্রয় দেন। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি স্থাপন করিয়া হুসেন শাহ্‌ বাংলার সীমান্ত অঞ্চলগুলি দখল করিয়া রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণ করেন। দক্ষিণে উড়িষ্যার সীমান্ত, পশ্চিমে মগধ এবং পূর্বে কামতাপুর পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিপুরার একাংশ ও চট্টগ্রাম বাংলার শাসনাধীনে স্থাপিত হয়। দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদী হুসেন শাহের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিতে বাধ্য হন। এই চুক্তির ফলে প্রায় সমগ্র বিহার হুসেন শাহের প্রভাবাধীনে চলিয়া আসে।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ঃ ১৪৯৩-১৫১৯

হুসেন শাহ্‌ বাংলাকে শুধু সামরিক গৌরব দান করেন নাই। তাঁহার শাসনকালে বাংলাদেশে নব জাগরণ ঘটে। তাঁহার সুশাসনে দেশে অরাজকতা, লুণ্ঠন, রক্তপাত ও উৎপীড়নের অবসান হয়। দেশে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে। বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত নিজেকে একান্ত করিয়া হুসেন শাহ্‌ দেশে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ মানিতেন না। তাঁহার উৎসাহে দেশে শিক্ষা, শিল্প, স্থাপত্য, কাব্য, সাহিত্য ও ধর্মের উন্নতি হয়। তাঁহার রাজত্বকালে চৈতন্যদেব দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। হুসেন শাহ্‌ চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জ্ঞানদীপ্ত এই মহান শাসকের রাজত্বকালে দেশে শিক্ষার প্রসার হয়। তিনি শিক্ষাবিস্তার, রাস্তাঘাট, প্রাসাদ, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি নির্মাণে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে উজীর গোপীনাথ বসু, চিকিৎসক মুকুন্দ দাস, প্রধান দেহরক্ষী কেশবছত্রী, টাঁকশালের অধ্যক্ষ অনুপ, চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর রূপ ও সনাতন সুলতানের উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করেন।

তিনি আরবী ও ফার্সী ছাড়াও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য উৎসাহ দেন। বাঙালী কবি ও সাহিত্যিক মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত যশোরাজ খাঁ প্রভৃতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। হুসেন শাহের সময়ে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক শাসক পরাগল খাঁ ও তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁ পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহারা মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। এককথায় বলা যায় তাঁহার উৎসাহ ও আনুকূল্যে বাংলার সৃজনী প্রতিভা মুক্তি পায়। হুসেন শাহের বিনয়, দয়া, করুণা ও মানবিক গুণের জন্য হিন্দুরা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করিত। গুণমুগ্ধ দেশবাসী তাঁহাকে 'নৃপতিতিলক', 'জগৎভূষণ' প্রভৃতি উপাধি দেয়। 'মহান হুসেন শাহ' বাঙালী হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। মুসলমান শাসকগণের মধ্যে একমাত্র মুঘল সম্রাট আকবরের সহিত তাঁহার তুলনা চলে। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাংলার সর্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ শাসক।

বাংলায় নবজাগরণ

সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নসরত শাহ বাংলার সুলতান হন। তিনি পিতার অনেক গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। সুলতান নসরত শাহ যতদিন জীবিত ছিলেন তিনি বিহারের লোহানী আফগান ও মুঘল সম্রাট বাবরের হাত হইতে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। নসরত শাহ বিহারের ত্রিহুত জয় করিয়া বাংলার শাসনাধীনে আনেন। সুলতান শাসনব্যবস্থায় পিতার উদার-নীতি অনুসরণ করিতেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁহার রাজত্বকালকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে। গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ ও কদম রসুল মসজিদ তাঁহার আমলে নির্মিত হয়। তাঁহার কর্মচারী কবিরঞ্জন কাব্য রচনার জন্য তাঁহার উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করেন। সুলতান নসরত শাহের মৃত্যুর পর হুসেন শাহী বংশ দুর্বল হইয়া পড়ে। এই বংশের শেষ শাসক গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহকে বিতাড়িত করিয়া শের শাহ বাংলা দখল করেন (১৫৩৮ খ্রীঃ)।

নসরত শাহ ঃ ১৫১৯-১৫৩২

বাহমনী রাজ্য ঃ

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষদিকে দক্ষিণের আমীরগণ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্রোহী আমীরদের দলপতি ছিলেন হাসান। প্রথমে দৌলতাবাদ ও পরে গুলবর্গা দাক্ষিণাত্যের এই নূতন মুসলমান রাজ্যের রাজধানী হয়। হাসান সুলতান হইয়া আলাউদ্দিন বাহমান শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম হয় বাহমনী রাজ্য। দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের অবসানে সারা দেশে যত মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় বাহমনী রাজ্য তাহাদের মধ্যে ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। ঐতিহাসিক আবুল কাশেম ফিরিস্তার মতে হাসান প্রথম জীবনে দিল্লীর গঙ্গু নামক এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। সেইজন্য সুলতান হইবার পর তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজ রাজ্যের নাম দেন

বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

বাহমনী রাজ্য। এই মত অবশ্য ঠিক নয়। আসলে হাসান পারস্যের বিখ্যাত বীর বাহমনের বংশধর বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন। এইজন্য তাঁহার বংশ বাহমনী বংশ নামে খ্যাত হয়। বাহমনী বংশের সুলতানরা একশত আশি বৎসর (১৩৪৭—১৫২৭) রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন বাহমন শাহ্ ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক। উত্তরে ওঁয়াই গঙ্গানদী (Wainganga) হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা এবং পশ্চিমে দৌলতাবাদ হইতে পূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশের ভঙ্গির (Bhongir) পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। দক্ষ প্রশাসক বাহমন শাহ্ তাঁহার রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র দেশকে চারিটি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রতিটি প্রদেশে প্রাদেশিক গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। বাহমন শাহের পুত্র প্রথম মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে দক্ষিণ-পূর্বে বরঙ্গল ও দক্ষিণ-পশ্চিমে বিজয়নগর রাজ্যের সহিত বাহমনী রাজ্যের সংঘাত শুরু হয়। বিজয়নগর রাজ্যের সহিত বাহমনী বংশের দ্বন্দ্ব দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। বাহমনী রাজ্যের পতন পর্যন্ত এই বিরোধ চলিয়াছিল।

আলাউদ্দিন বাহমন শাহ্ ১৩৪৭-১৩৫৮ ও প্রথম মুহম্মদ শাহ্ ১৩৫৮-৭৭

দিল্লীর সুলতানী শাসনের শেষদিকে দক্ষিণ ভারতে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য দুইটি প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ (১) একটি মুসলিম, অপরটি হিন্দু রাজ্য। মুসলিম বাহমনী রাজ্য দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে হিন্দু বিজয়নগর রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহিত না। অপরদিকে হরিহর ও বুক্কা হিন্দু পন্ডিত মাধব বিদ্যারণ্য ও তাঁহার ভ্রাতা বেদের ভাষাকার শায়নের অনুপ্রেরণায় হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতে মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু-ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক হিসাবে বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হয়। সুতরাং বাহমনী-বিজয়নগর দ্বন্দ্ব ছিল প্রকৃতপক্ষে দুই ভিন্ন সংস্কৃতি ও আদর্শবাদের মধ্যে লড়াই। (২) বাহমনী রাজ্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র দক্ষিণ ভারতে মুসলিম শাসন কায়েম করা। বিজয়নগর কর্তৃক মুসলিম রজেনৈতিক আধিপত্য অস্বীকার বাহমনী শাসকগোষ্ঠীর নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাঁহারা সর্বদাই বিজয়নগর রাজ্যের রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। (৩) উপরন্তু, কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর রায়চুর দোয়াব অঞ্চল ছিল উভয় রাজ্যের মধ্যে বিরোধের আসল কারণ। উভয় রাষ্ট্রই উক্ত অঞ্চলে আধিপত্য দাবী করায় বিরোধ তীব্র হয়।

বাহমনী-বিজয়নগর দ্বন্দ্বের কারণ

প্রথম মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর সুলতান আলাউদ্দিন মুজাহিদ ও দাউদ খুব অল্পকালের জন্য বাহমনী রাজ্যের শাসক হন। পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৩৭৮-৯৭) দেশে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় সুলতান। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অনুরাগী এই সুলতান কবি, শিল্পী ও পন্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। বাহমনী বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন আহমদ শাহ্ (১৪২২-৩৬)। সুলতান আহ্মদ শাহ্ বরঙ্গল জয় করেন। মালব

আক্রমণ করিয়া এবং বিজয় নগর রাজ্যের একাংশ লুণ্ঠন করিয়া তিনি নিজ রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তবে আহমদ শাহের গুজরাট অভিযান ব্যর্থ হয়। তিনি বিদরে বাহমনী রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময় হইতে প্রকৃতপক্ষে বাহমনী রাজ্যের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে শুরু করে। দেশের আমীরগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। একদলে ছিল এদেশীয় ও আবিসিনীয় আমীরগণ আর অপরদলে ছিল তুর্কী, পারস্য ও আরবদেশীয় আমীর। সুন্নী স্বদেশী ও শিয়া বিদেশী আমীরদের ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসের আসল কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। আহমদ শাহের পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দিন (১৪৩৬-১৪৫৭) কঙ্কন ও সঙ্গমেশ্বরের হিন্দু রাজাদের পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি খান্দেশের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন। বিজয়নগরের বিরুদ্ধে বাহমনী রাজ্যের যুদ্ধ চলিতে থাকে। বাহমনী বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন তৃতীয় মুহম্মদ শাহ্ (১৪৬৩-১৪৮২)। তাঁহার রাজত্বকালে বিচক্ষণ মন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ানের সুদক্ষ পরিচালনায় দেশে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। মাহমুদ গাওয়ানের নেতৃত্বে বাহমনী রাজ্যের সৈন্যবাহিনী কঙ্কন ও সঙ্গমেশ্বরের রাজাদের পরাস্ত করে। বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করে। গোয়া, রাজামুন্দ্রি ও কোন্দাবীর দুর্গ অধিকৃত হয়। উড়িষ্যার রাজা বাহমনী সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাস্ত হন। শুধু যুদ্ধে নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও শাসনকার্যেও মাহমুদ গাওয়ান অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। বাহমনী রাজ্যে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার বিরোধীগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। অস্থিরচিত্ত সুলতান তৃতীয় মুহম্মদ শাহ্ মাহমুদ গাওয়ানের সততায় সন্দিহান হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুর (১৪৮১) সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের ঐক্য ও শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শেষ বাহমনী শাসক কলিমুল্লাহ শাহের মৃত্যুর পর (১৫২৭) বাহমনী রাজ্য পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। শাসকদের উপাধি অনুযায়ী এই রাজ্যগুলির নাম হয়। এইগুলি হইল বেরারের ইমাদশাহী, আহমদনগরের নিজামশাহী, বিজাপুরের আদিলশাহী, গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী ও বিদরের বারিদশাহী রাজ্য।

বাহমনী রাজ্যের পরবর্তী সুলতানগণ

মাহমুদ গাওয়ান

বাহমনী রাজ্যের পতন ও পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

বিজয়নগর সাম্রাজ্য ঃ

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় পাদে হরিহর ও বুক্কা নামক দুই ভ্রাতা ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে তাহাদের রাজধানী বিজয়নগর স্থাপিত হয়। কালক্রমে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চল জুড়িয়া বিজয়নগর সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। মোট চারিটি রাজবংশ—সঙ্গম, শালুব, তালুব ও অরবিদু—প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া এখানে রাজত্ব করেন। প্রথম দুইজন শাসক হরিহর ও বুক্কার রাজত্বকালে (১৩৩৬-১৩৭৯) প্রায় সমগ্র হৈসলরাজ্য বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত

বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

হয়। কদম্ব রাজ্যের রাজা ও মাদুরার সুলতান তাঁহাদের নিকট পরাস্ত হন। হরিহর ও বুক্কা দেশে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহই রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় হরিহর 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি নেন।

দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্যের বিস্তার হয়। তিনি কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর দোয়াব অঞ্চল দখল করিয়া বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই অঞ্চলের অধিকার লইয়া বাহমনী রাজ্যের সহিত বিজয়নগরের দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় হরিহর প্রকৃতপক্ষে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৯-১৪০৬) ও প্রথম দেবরায় (১৪০৬-১৪২২)

তাঁহার সময়ে দক্ষিণ ভারতের উপর বিজয়নগরের আধিপত্য স্থাপিত হয়। মহীশূর, কানাড়া, চিংলিপুট, ত্রিচিনোপল্লী ও কাঞ্চী একে একে বিজয়নগরের অধীনে আসে। সিংহলের রাজা তাঁহাকে করদানে স্বীকৃত হন। দ্বিতীয় হরিহর নিজে শৈব হইলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সমান সহনশীল ছিলেন। দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বিজয়নগরের সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। গৃহযুদ্ধের শেষে রাজপুত্র প্রথম দেবরায় সিংহাসম লাভ করেন। প্রথম দেবরায় শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার আমলে বিজয়নগর সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হয়। বাহমনী সুলতান তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্ষতি করিতে পারেন নাই। প্রথম দেবরায়ের রাজত্বকালে রাজধানী বিজয়নগর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় দেবরায় বাহমনী সুলতানদের বিরুদ্ধে দুই বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের শাসকগণ তাঁহার নিকট পরাস্ত হন।

দ্বিতীয় দেবরায় (১৪২২-৪৬) ও মল্লিকার্জুন (১৪৪৬-৬৫)

তাঁহার রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সুখ, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। ইতালীয় পর্যটক নিকোলোকন্তি ও পরাস্যের দূত আবদুর রজ্জাক তাঁহার রাজত্বকালে বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিজয়নগর ও তাঁহার সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় দেবরায়ের পুত্র মল্লিককার্জুন বাহমনী ও উড়িষ্যার যুক্ত আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

মল্লিকার্জুনের মৃত্যুর পর বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। বাহমনী

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা

সুলতান কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াব অধিকার করিয়া লন। উড়িষ্যার গজপতি রাজা বিজয়নগর আক্রমণ করেন। এই গোলযোগের সময় শালুব বংশীয় সামন্ত রাজা নরসিংহ শালুব সঙ্গমরাজ-বংশের পতন ঘটাইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। নরসিংহ শালুব মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব (১৪৮৬-৯২) করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের

সমস্ত বিদ্রোহ তিনি দমন করিতে সমর্থ হন। তবে রায়চুর দোয়াব বাহমনী সুলতানের এবং উদয়গিরি উড়িষ্যারাজের অধিকারে চলিয়া যায়। নরসিংহ শালুবের সেনাপতি পুত্র বীর নরসিংহ (১৫০৫-১৫০৯) বিজয়নগরের সিংহাসন দখল করিয়া নূতন তুলুব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বীর নরসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি ভারত ইতিহাসের একজন বিখ্যাত নরপতি। তাঁহার রাজত্বকাল ছিল বিজয়নগরের ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি ও চরম উন্নতির যুগ।

শালুব ও তুলুব বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা

দক্ষ সেনাপতি ও সুযোগ্য শাসক হিসাবে কৃষ্ণদেব রায় প্রসিদ্ধ। তাঁহার রাজত্বকালে কোন যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন নাই। রাজত্বের প্রথমদিকে তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও দেশে শান্তি স্থাপন করিয়া সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার উদয়গিরি, কোন্দাবিদু দুর্গ এবং বরঙ্গল একে একে অধিকৃত হয়। কৃষ্ণদেব রায় দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি সুলতানী রাজ্যের মধ্যে বিজাপুর ও বিদর আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে দুর্বল করিয়া দেন। রায়চুর দোয়াব পুনরায় দখল করিয়া বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত করেন। এইভাবে একে একে বিজয়নগরের সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করিয়া কৃষ্ণদেব রায় হৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুশাসন দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনে। তাঁহার আমলে দেশে শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। মুঘল সম্রাট বাবর তাঁহার 'আত্মজীবনীতে' বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায়কে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫২৯)

কৃষ্ণদেব রায়ের দুর্বল বংশধরদের অধীনে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে। তাঁহার উত্তরাধিকারী অচ্যুত রায় (১৫৩০-৪২) ও সদাশিব রায়ের (১৫৪২-৭০) রাজত্বকালে অরবিদু পরিবারের রামরায় ও তিরুমল প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করেন। ১৫৬৫ খ্রীঃ উত্তরের আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা ও বিদর সম্মিলিতভাবে বিজয়নগর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়। তেলিকোটার যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর বিজয়নগরের গৌরব রবি অস্তমিত হয়। সাম্রাজ্যের এই দুর্দিনে ১৫৭০ খ্রীঃ মন্ত্রী তিরুমল তুলুব বংশের অবসান ঘটাইয়া অরবিদু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিরুমলের দুই পুত্র দ্বিতীয় রঙ্গ ও দ্বিতীয় ভেঙ্কট ১৬১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভেঙ্কটের মৃত্যুর পর বিজয়নগর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসকগণ মহীশূর, বেদনুর, মাদুরা, তাঞ্জোর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা :

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সম্রাট। তিনি ছিলেন শাসন, বিচার ও সামরিক বিভাগের প্রধান। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রায়ই সামাজিক বিরোধগুলি

নিষ্পত্তি করিতে হইত। সম্রাট অনেক ক্ষমতার অধিকারী হইলেও তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। রাষ্ট্রের স্বার্থ, জনগণের অধিকার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইত। শাসনব্যবস্থায় উদার-নীতি অনুসরণ করিয়া বিজয়নগরের শাসকগণ দেশে সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্মের অনুশাসন মানিয়া ধর্ম ও সমাজ রক্ষা করিতেন। সেইজন্য তাঁহাদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব হইত না।

সম্রাট ক্ষমতাশালী—স্বেচ্ছাচারী নন

মন্ত্রিসভা ও অন্যান্য রাজকর্মচারী

রাজা কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রিসভা তাঁহাকে শাসনকার্যে পরামর্শ দান করিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এই মন্ত্রিসভায় স্থান পাইতেন। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সেক্রেটারিয়েট বা মহাকরণ ছিল। মন্ত্রীরা ছাড়া অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা হইলেন প্রধান কোষাধ্যক্ষ, রত্নরক্ষক, বাণিজ্য শুল্কের পরিদর্শক, পুলিসপ্রধান, অশ্ব পরিদর্শক প্রভৃতি।

রাজসভা

ইঁহারা ছাড়া নিম্নস্তরের অনেক রাজকর্মচারী ছিলেন। বিজয়নগরের রাজারা অনেক ব্যয়ে আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভা রাখিতেন। অভিজাত, পুরোহিত, কবি, সাহিত্যিক, জ্যোতিষী, গায়ক প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিরা এই সভা অলংকৃত করিতেন। উৎসবের সময় খুব জাঁকজমক হইত।

শাসনের সুবিধার জন্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি প্রদেশ আবার কতকগুলি উপ-প্রদেশে বিভক্ত হয়। প্রদেশের শাসক নায়ক বা নায়েক সাধারণতঃ রাজপরিবার বা অভিজাতদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইতেন।

শাসনবিভাগ—প্রদেশ ও উপ-প্রদেশ

প্রদেশের শাসন ব্যাপারে প্রাদেশিক শাসক ছিলেন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। অভ্যন্তরীণ শাসনে তিনি প্রায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করিতেন। প্রদেশের সংগৃহীত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ তিনি কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা দিতেন। যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিনী লইয়া রাজাকে সাহায্য করা ছিল তাঁহার অপর প্রধান দায়িত্ব। প্রদেশ শাসনে অত্যাচার বা উৎপীড়ন হইলে বা রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অপরাধে রাজা প্রাদেশিক শাসককে শাস্তি দিতেন।

বিজয়নগরের রাজারা সারা দেশে শক্তিশালী গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি গ্রাম ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ। 'গ্রামসভা' বা 'পঞ্চায়েত' গ্রামের শাসন, বিচার ও শান্তি রক্ষার কাজ তদারকি করিত। এইজন্য হিসাবরক্ষক, শান্তিরক্ষক, বেগারশ্রম পরিদর্শক প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করা হইত। ইহারা বেতন হিসাবে নিষ্কর জমি বা গ্রামের উৎপন্ন ফসলের একাংশ পাইত। বণিক সংঘগুলি গ্রামীণ সভার অঙ্গ ছিল। রাজকর্মচারী মহানায়কাচার্য গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার তদারকি করিতেন। বিজয়নগর রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সম্ভবতঃ উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশের অধিক রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইত। রাজার ভূমি-রাজস্ব বিভাগ দেশের সমস্ত জমিকে তিনভাগে ভাগ (ভিজা, শুষ্ক, ফলের বাগান ও বন) করিয়া রাজস্ব ধার্য করিত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়া কৃষকরা গোচারণ ও বিবাহ কর দিত। ইহা ছাড়া বাণিজ্য,

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা

বাগিচা, পথ, বণিক, কারিগর ও শিল্পীদের উপর কর স্থাপন করা হইত। সন্দেহ নাই বিজয়নগর রাজ্যে করের চাপ খুব বেশী ছিল। সরকারী কর্মচারীরা বেশ কড়াকড়ি করিয়া ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য কর আদায় করিত। তবে জনগণ রাজার নিকট অভিযোগ করিলে তিনি কর হ্রাস বা মকুবের ব্যবস্থা করিতেন।

রাজ্যে রাজা ছিলেন প্রধান বিচারক। তাঁহার অধীনে সারা দেশে বিচারালয় ও বিচারকরা নিযুক্ত হইতেন। অনেক সময় গ্রামসভার সহায়তায় বিচারকরা বিচারকার্য সমাধা করিতেন। ধর্মীয় আইন ছাড়াও ঐতিহ্যবাহী সামাজিক নিয়ম-রীতির সাহায্যে

বিচারব্যবস্থা

বিচারকার্য পরিচালনা করা হইত। দণ্ডাদেশ সাধারণতঃ কঠোর হইত। অর্থদণ্ড, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, শারীরিক নির্যাতন, অঙ্গচ্ছেদ ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রথা ছিল। হৈসল রাজাদের মত বিজয়নগরের রাজাদের সুগঠিত সৈন্যবাহিনী ছিল। সামরিক বিভাগের অধীনে 'দণ্ডনায়ক' বা প্রধান সেনাপতি ইহা

সৈন্যবাহিনী

পরিচালনা করিতেন। বিজয়নগর রাজ্য শত্রুবেষ্টিত থাকায় ইহাকে বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখিতে হইত। এই বাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী, উট ও গোলন্দাজ বাহিনী দ্বারা সজ্জিত করা হয়। বিজয়নগর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গোলন্দাজ বাহিনী ছিল সবচেয়ে দুর্বল। শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যে বাহমনী রাজ্যের সৈন্যবাহিনী বিজয়নগর বাহিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। বিজয়নগর

শাসনব্যবস্থার ত্রুটি

শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল দুইটিঃ (১) প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ অত্যধিক ক্ষমতা ভোগ করিতেন। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইলে তাহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। (২) বিজয়নগরের রাজারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেন নাই। শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁহারা ব্যর্থ হন।

বিজয়নগরের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন:

সমসাময়িক বিবরণী হইতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমাজজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সামাজিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করিত। শূদ্ররা দৈহিক শ্রম ও অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকিত। ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রচর্চা ছাড়াও সরকারী কাজকর্ম, কৃষি ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিত। ক্ষত্রিয়রা রাজকার্য ও যুদ্ধবিগ্রহ এবং বৈশ্যরা বাণিজ্য ও কৃষিতে নিযুক্ত থাকিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে সমাজে জাতিভেদ থাকিলেও কঠোর বৃত্তি বিভাগ ছিল না। বিজয়নগর রাজ্যে নারীজাতি

সমাজ

উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। রাজনীতি, সমাজ, প্রশাসন, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতে তাহারা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। ধনী ও অভিজাতদের মধ্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রথা ছিল। সাধারণ মানুষ এক স্ত্রী গ্রহণ করিত। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে সহমরণ, শিশু বিবাহ ও পণ প্রথা চালু ছিল। দেশে দেবদাসী প্রথা ছিল। দেবদাসীরা নৃত্যগীতে পারদর্শিনী ছিলেন।

সাধারণ মানুষ ভাত, ফল, শাক্-সবজি, মাছ ও মাংস খাইত। শুধু ব্রাহ্মণরা মাছ ও মাংস খাইত না। পূজা ও অন্যান্য উৎসবের সময় পশুবলি হইত।

পারস্য দেশীয় পর্যটক আবদুর রজ্জাক, ইতালীবাসী নিকোলোকান্তি ও পর্তুগীজ ডমিংগোস পায়েস বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের বিভিন্ন অংশে উন্নত কৃষিব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া কৃষিকার্যের সহায়তা করিত। দেশের প্রধান প্রধান শিল্প ছিল বয়ন, খনিজদ্রব্য উত্তোলন ও মিশ্রধাতু নির্মাণ। গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত ছিল অপর প্রধান শিল্প। শিল্পী ও কারিগররা নিজেদের সংঘ গঠন করিয়াছিল। রাজধানী বিজয়নগরের খ্যাতি ছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে। আবদুর রজ্জাক লিখিয়াছেন, দেশে ৩০০ বন্দর ছিল। এই বন্দরগুলির মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলি, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, চীন, আরব, পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, আবিসিনিয়া ও পর্তুগালের সহিত বাণিজ্য চলিত। বস্ত্র, চাউল, লৌহ, সোরা, চিনি ও মসলা প্রভৃতি ছিল প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। আর দেশে আমদানী করা হইত হাতি, ঘোড়া, মণি-মুক্তা, তামা, কড়ি, শাঁখ, পারদ, চীনা সিল্ক প্রভৃতি। ঘোড়া, বলদ, গাধা ও গাড়ীর সাহায্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিবহনকার্য সমাধা হইত। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রা চালু ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় আহার্য ও বিলাসদ্রব্য ছিল সহজলভ্য ও সস্তা। ধনীরা ঐশ্বর্য ও বিলাসে জীবন কাটাইত। সাধারণ মানুষ করভারে কষ্ট পাইত।

অর্থনীতি

বিজয়নগরের রাজারা ধর্মে শৈব বা বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের আমলে বিজয়নগরে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়। রাজারা শৈব বা বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী হইলেও সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনরা রাজাদের আনুকূল্য লাভ করিতেন। ইহা ছাড়া খ্রীষ্টান, ইহুদি ও মুসলমানরা তাঁহাদের রাজ্যে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের সুযোগ পাইতেন। ফ্রেডারিক বারবোসা লিখিয়াছেন, বিজয়নগরে সকল ধর্মের লোকেরা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিত। কেহ জানিতে চাহিত না কে কোন্ ধর্মাবলম্বী। বিজয়নগরের রাজারা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজয়নগরের নিজস্ব শিল্পশৈলী গড়িয়া উঠে। তাঁহাদের আমলে নির্মিত বিখ্যাত হজারা রামস্বামী ও বিট্টলস্বামী মন্দির বিজয়নগর স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিজয়নগর রাজ্যে চিত্রকলা ও সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় ও রাজপ্রতিনিধি রাম রায় সঙ্গীতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। নাটকের অভিনয় দেখিয়া জনসাধারণ আনন্দ পাইত।

সংস্কৃতি ঃ ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্য

বিজয়নগর সাম্রাজ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রাজারা সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু ও কানাড়া ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দিতেন। বেদের ভাষ্যকার শায়ন ও তাঁহার ভ্রাতা পণ্ডিত মাধব বিজয়নগর রাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ

উন্নতি ঘটিয়াছিল। তিনি নিজে ছিলেন একজন পণ্ডিত মানুষ। তেলেগু ভাষায় 'আমুক্তমাল্যদা' ও সংস্কৃত ভাষায় আরও পাঁচখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 'আমুক্তমাল্যদা'য় রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁহার চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভায় আটজন বিখ্যাত তেলেগু কবি ছিলেন যাহাদের 'অষ্ট দিগগজ' বলা হয়। তাঁহার প্রধান সভাকবি পেদ্দন ছিলেন তেলেগু কবিদের প্রধান এবং খুবই জনপ্রিয়। অরবিদুবংশীয় রাজারাও কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিদের উৎসাহ দিতেন। তাঁহাদের আমলে তেলেগু সাহিত্যের আরও অগ্রগতি হয়। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, ব্যাকরণ তর্কশাস্ত্র, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয়। বলা যায় বিজয়নগরের অধীনে ও তাহার সংস্কৃতিবান রাজাদের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি সমন্বয় ও অগ্রগতি ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতানী যুগে ভারতীয় সভ্যতার উপর ইসলামের প্রভাব (Impact of Islam on India during the Sultanate Period)

যুগে যুগে বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতে প্রবেশ করিয়া এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। গ্রীক, শক, হূণ, কুষাণ প্রভৃতি জাতিগুলির ক্ষেত্রে এমন পরিণতি ঘটিয়াছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কী ও আফগানগণ কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যান নাই। ইহার প্রধান কারণ হইল তাঁহারা নূতন সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শ লইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যখন তুর্কী ও আফগানগণ ভারতে প্রবেশ করেন তখনও এই আদর্শবাদ ছিল বেশ নূতন ও শক্তিশালী। অপরদিকে ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে স্থবিরতা প্রবেশ করিয়াছিল। অন্য সভ্যতাকে আত্মস্থ করিবার ক্ষমতা তাহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ইসলাম বিজয়ীর মত ভারতে প্রবেশ করে। দুই সভ্যতার মধ্যে বহু দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও রক্তপাতের পর ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সুলতানী রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে বিজয়ী আগন্তুক জাতি ও বিজিত ভারতীয়দের মধ্যে ভয়, অবিশ্বাস ও সন্দেহের মনোভাব দেখা দেয়। ঠিক এই কারণেই সুলতানী রাজত্বের প্রথমদিকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। হিন্দু সমাজ নেতাদের ধারণা হয় আচরণ-বিধি কঠোর করিয়া হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব। জাতিভেদ প্রথা কঠোর হয় এবং জাতি ও উপজাতির নিয়ম-রীতিও কঠোর করা হয়। হিন্দু স্মৃতিকাররা ধর্মশাস্ত্রের নূতন নিয়ম ও ব্যাখ্যা রচনা করেন। বিজয়নগরের মাধববিদ্যারণ্য 'কালনির্ণয়' নামক পরাশরস্মৃতির টীকা, বিশ্বেশ্বর 'মদনপারিজাত', কুল্লুক ভট্ট মনুস্মৃতির টীকা ও বাংলার রঘুনন্দন শিরোমণি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। স্ত্রীজাতি অধিকার ও স্বাধীনতা

ইসলামের আগমন ও হিন্দু রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া

হারাইয়া ক্রমশঃ গৃহবন্দী হয়। নূতন নূতন নিয়ম নিগড়ে বাঁধিয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজকে ইসলামের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যাইবে বলিয়া সমাজপতিদের ধারণা হয়।

সুলতানী রাজ্য ভারতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুই সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ক্রমশঃ কমিয়া আসে। শুরু হয় সহযোগিতা, আদান-প্রদান ও সমন্বয়ের যুগ। ইসলামের গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম চিন্তার দিকে আকৃষ্ট হন। ইসলামের একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ হিন্দুদের আকৃষ্ট করে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফল হইল হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত উপাস্য দেবতা 'সত্যপীর'। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে আবার অনেকে ইসলামধর্ম হইতে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করে। ইহাতে দুই ধর্মের মধ্যে সংস্কৃতি বিনিময় হয়।

সহযোগিতা ও সমন্বয় পর্ব

মুসলিম সুলতানরা হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করান। সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক, কাশ্মীরের সুলতান জয়নাল আবেদিন, বাংলার হুসেন শাহ্ ও নসরত শাহ্ এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রণীর ভূমিকা লন। মুসলিম রাজদরবারে গুণী ও পণ্ডিতগণ হিন্দু দর্শন, যোগ, বেদান্ত, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতিষচর্চা করিতে থাকেন। অপরদিকে হিন্দুরা ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞান, বিশেষ করিয়া জ্যোতিষ ও রসায়নশাস্ত্র আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হিন্দির সহিত ফার্সী, আরবী ও তুর্কী ভাষার শব্দ ভাণ্ডার ও ধারণা যুক্ত হইয়া জন্ম হয় উর্দু ভাষার। ইহা ভারতীয় সভ্যতা ও ইসলামের ভাষা সমন্বয় বলা যাইতে পারে। এই যুগে মুসলিম লেখক হিন্দু কাহিনী লইয়া হিন্দিতে ও হিন্দুলেখক মুসলিম কাহিনী লইয়া ফার্সীতে কাব্য রচনা করেন। মালিক মুহম্মদ জায়সী ও রায় ভাণমল এইরূপ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

দুই সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় স্থাপত্য, ভাস্কার্য, চিত্রকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের নূতন নূতন শৈলী ও আঙ্গিকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে উভয়ের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণে পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। অর্থনৈতিক কাজকর্মে সহযোগিতা ও সামাজিক মেলামেশা ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা দেখা দেয়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিত হিন্দুরা। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে, বিশেষ করিয়া রাজস্ব-বিভাগে, হিন্দুরা কাজ পাইত। সুলতানী যুগে প্রাদেশিক শাসকগণ ও স্বাধীন সুলতানদের অনেকে হিন্দুদের রাজকার্যে প্রাধান্য দেন। মালব, বাংলা, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরে হিন্দুরা রাজকার্যে প্রাধান্য পাইত। অপরদিকে বিজয়নগর ও রাজপুতনার রাজারা মুসলমানদের রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেন। একসঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস ও কাজ করিবার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এককথায় বলা যায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সমন্বয় সাধিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জীবিকা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলায় এই ঐক্যভাব

লক্ষ্য করা যায়। স্যার জন মার্শাল মন্তব্য করিয়াছেন যে বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতা ভারতে প্রায় মিশিয়া গিয়াছে।[১] এই সংস্কৃতি সমন্বয় এমন পর্যায়ে পেঁাছিয়াছিল যে বাবর ভারতে আসিয়া শুধু 'হিন্দুস্তানী সভ্যতা' দেখিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, ইহা হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির যৌথ ফসল।

সুফীবাদ ও ভক্তিবাদী আন্দোলন :

সুফীমত বা সুফীবাদ ইসলামের একটি প্রাচীন শাখা। সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সুফী দরবেশ ও আউলিয়ারা ভারতে আসেন এবং তাঁহাদের ধর্মমত প্রচার করিতে থাকেন। হিন্দুদের ভক্তিবাদী সাধকের মত সুফী দরবেশ ও ফকিররা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ইসলামের একেশ্বরবাদ, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সাম্যে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। তবে নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি ধর্মীয় আচার-আচরণে তাঁহারা তেমন গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। সুফীরা সহজ, সরল, পবিত্র সাধুর জীবন যাপন করিতেন এবং গুরুর উপদেশে ধর্মসাধনা করিতেন। সমস্ত রকম লালসা ত্যাগ ও সর্বজীবে প্রেম তাঁহাদের ধর্মসাধনার অঙ্গ ছিল। সুফী দরবেশরা প্রধানত দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল—সুরাবর্দী ও চিশ্‌তী। সুলতানী যুগে সুফী সাধকদের অনেকে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে শেখ মইনুদ্দিন চিশ্‌তী, বাবা ফরিদউদ্দিন, নাসিরুদ্দিন মাহমুদ, খাজা শেখ তকিউদ্দিন ও মুহম্মদ গাওস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সাধুদের ঈশ্বর প্রেম, অহিংসা, তপস্যা ও ত্যাগ সুফী মতবাদকে প্রভাবিত করিয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে সুফী দরবেশদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় হিন্দুধর্মের অনেক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সুফীবাদে স্থানলাভ করে।

সুফীবাদ

সুলতানী যুগে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ভক্তিবাদ ও ভক্তিবাদী আন্দোলনের অগ্রগতি। ইসলামের আবির্ভাবের পর হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ উদার, সহিষ্ণু, সমন্বয়ধর্মী সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজন দেখা দেয়। হিন্দুধর্মে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ আছে। এযুগের ভক্তিবাদী ধর্মপ্রচারকগণ জ্ঞান বা কর্ম নয়, ভক্তিকেই মুক্তির প্রধান উপায় বলিয়া গ্রহণ করেন। ইঁহাদের প্রচারিত ভক্তিধর্মের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে : (১) ঈশ্বর এক। (২) সমস্ত ধর্মের মূল সত্য এক। রাম বা রহিম যে নামেই ডাক, ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। (৩) সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এবং সকলেই সমান। (৫) ঈশ্বর লাভের জন্য যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তি ঈশ্বর লাভ বা মুক্তির

ভক্তিবাদ

(১) 'Seldom in the history of mankind has the spectacle been witnessed of two civilisations, so vast and so strongly developed, yet so radically dissimilar as the Muhammadan and Hindu, meeting and mingling together. The very contrasts which existed between them, the wide divergences in their culture and their religion, make the history of their impact peculiarly instructive....'

একমাত্র উপায়। গুরু ভক্তকে পথ দেখাইতে পারেন। (৫) ভক্তিবাদীরা জাতিভেদ প্রথা ও মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করিতেন না। (৬) ইঁহারা সহজ, সরল স্থানীয় ভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভক্তিবাদ প্রচার করিতেন। রামানুজ. রামানন্দ, বল্লভাচার্য, চৈতন্যদেব, নামদেব, নানক ও কবীরের প্রচেষ্টায় ভক্তিবাদী আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ইঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

রামানুজ ও রামানন্দ

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে রামানুজ অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভক্ত ও প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভের কথা ঘোষণা করেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না ও যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করিতেন না। শূদ্ররাও রামানুজের শিষ্য হন। রামানুজের পর নিম্বকর ও মাধবাচার্য ভক্তিবাদী ভাবধারা প্রচার করিতে থাকেন। ইঁহারা কৃষ্ণপ্রেম মুক্তির উপায় বলিয়া প্রচার করেন। ইঁহাদের প্রচারিত ভক্তিবাদ শক্তিশালী বা জনপ্রিয় হয় নাই। এই কাজটি সম্পন্ন করেন রামানন্দ। ব্রাহ্মণ রামানন্দ উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলিতে হিন্দি ভাষায় রামভক্তি মুক্তির উপায় বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। সমস্ত শ্রেণীর মানুষ ও নারী পুরুষের মধ্যে তাঁহার ভক্তিবাদ প্রচারিত হয়। রামানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার বারজন শিষ্য ভক্তি আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। রামানন্দ ও তাঁহার শিষ্যদের আন্দোলনের ফলে নিম্নজাতির মানুষ ও স্ত্রীজাতির সামাজিক উন্নতি ঘটে। তাহারা মানবিক অধিকার ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে।

কবীর

রামানন্দের বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন কবীর। তিনি সুলতান সিকান্দর লোদীর সমসাময়িক ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্যস্থাপন ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। কিংবদন্তী অনুযায়ী কবির ছিলেন কাশীর এক ব্রাহ্মণ বিধবার সন্তান। এক মুসলমান তাঁতী পরিবার তাঁহাকে পালন করেন। কবীর নিজেও তাঁতী ছিলেন। মিলিত হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সন্তান কবীর সারা জীবন প্রেমধর্মের (religion of love) সাধনা করেন। সমস্ত ধর্মমত ও সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধন করা ছিল তাঁহার ধর্মপ্রচারের লক্ষ্য। তাঁহার দোঁহা বা গানগুলিতে তিনি একেশ্বরবাদ এবং সমস্ত মানুষের ঐক্য ও সাম্যের জয়গান করেন। তিনি জাতিভেদ প্রথা ও মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।



কবীর

ভক্তিমার্গের প্রচারকদের মধ্যে চৈতন্যদেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলার নবদ্বীপে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণ পরিবারে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। অল্প বয়সে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন কয়েন। চব্বিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বাকী জীবন তিনি ভক্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া কাটান। তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিল রাধাকৃষ্ণ। কৃষ্ণপ্রেম ও হরিনাম সংকীর্তন মুক্তির উপায় বলিয়া চৈতন্যদেব প্রচার করেন। সকল শ্রেণী ও ধর্মের মানুষ তাঁহার শিষ্য হন। চৈতন্যদেবের শিষ্যদের মধ্যে চণ্ডাল ও মুসলমান ছিলেন। বাংলা, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্য ও বৃন্দাবনে চৈতন্যদেব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। জাতিভেদপ্রথা ও পুরোহিত তন্ত্রে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। চৈতন্যদেবের শিষ্যরা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মনে করিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য-চরিতামৃত’ একখানি প্রামাণ্য চৈতন্য জীবনী।

চৈতন্যদেব ঃ ঃ ১৪৮৫-১৫৩৩



শ্রীচৈতন্য

মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদের প্রচারক ছিলেন নামদেব। নামদেব ছিলেন দরজী পরিবারের সন্তান। তিনি মূর্তিপূজা ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন। শুধু ঈশ্বরপ্রেম মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া তিনি প্রচার করেন।

নামদেবের মত আর একজন গৃহী সাধক ছিলেন নানকদেব। ১৪৬৯ খ্রীঃ লাহোরের নিকট তালবন্দী গ্রামে ক্ষত্রী পরিবারে নানকদেব জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য ভক্তিবাদী সাধকের মত নানকদেব একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করিতেন। মূর্তিপূজা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও জাতিভেদ প্রথায় তিনি বিরোধিতা করেন। সমস্ত ধর্মের মৌলিক ঐক্যে তিনি বিশ্বাস করিতেন। স্থানীয়

নানকদেব ঃ ১৪৬৯-১৫৩৮



নানকদেব

গুরুমুখী ভাষায় হিন্দু-মুসলমান সকলকেই তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন। তাঁহার বাণীগুলি 'আদিগ্রন্থ' বা 'গ্রন্থসাহেবে' লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নানকদেব ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ঈশ্বর ভক্তির উপর জোর দেন। সরল, পবিত্র জীবন, সৎ-আচরণ, দয়া ও সত্যবাদিতা তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মূল কথা। নানকদেবের শিষ্যগণ শিখ নামে পরিচিত হয়।

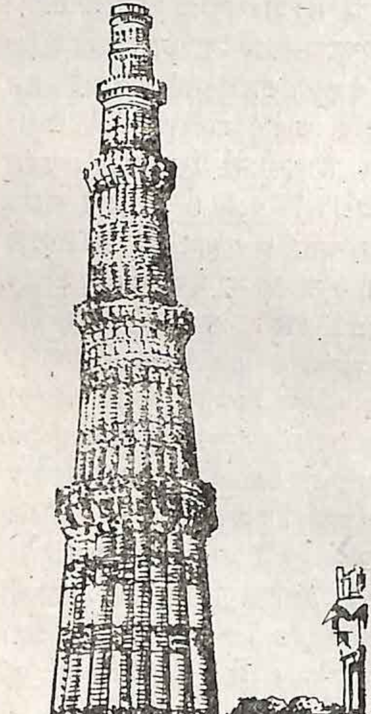
সুলতানী যুগের শাসকগণ ফার্সী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের ফলে ঐ অঞ্চল হইতে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি, পণ্ডিত, কবি ও সাহিত্যিক পলাইয়া আসিয়া ভারতে সুলতানগণের দরবারে আশ্রয় নেন। ইঁহাদের অবদানে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। দিল্লী ফার্সী কাব্য ও সাহিত্যচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে রাজধানীতে লাইব্রেরী ও কবি সাহিত্যিকদের সোসাইটি গড়িয়া উঠে। সুলতানী যুগে ভারতে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম হয়। হিন্দু ভাষার সহিত ফার্সী, আরব ও তুর্কী ভাষার সংমিশ্রণে এই নূতন ভাষা গড়িয়া উঠে। ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতি, ভাব ও মানসিকতা এই ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে। কবি সাহিত্যিক 'হিন্দুস্থানের তোতাপাখি' আমীর খসরু ফার্সী ও উর্দু উভয় ভাষায় কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সুলতানী যুগের প্রথমদিকে কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আমীর খসরু ও হাসান দেহলভী বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। আমীর খসরু ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সঙ্গীতেও তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সভায় বিখ্যাত ফার্সী কবি বদরুদ্দিন মহম্মদ উপস্থিত ছিলেন। ইসলামী শাস্ত্র ও সংস্কৃতির অসাধারণ পণ্ডিত মাওলানা মুয়াইয়ানউদ্দিন উমরানী ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক। সুলতান ফিরোজ তুঘলক আত্মজীবনী লেখেন। সুলতানী যুগে ইতিহাস সাহিত্যের উন্নতি হয়। আমরা ভারতের লিখিত ইতিহাস পাই। ঐতিহাসিকদের মধ্যে হাসান নিজামী (তাজ-উল-মাসীর), মিনহাজ উস সিরাজ (তবাকৎ ই-নাসিরী), জিয়াউদ্দিন বরণী (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী), শামস-ই-সিরাজ আফিফ (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী), ইয়াহিয়া বিন আহমদ (তারিখ-ই-মুবারকশাহী) ও ইসামী (ফুতু-উস্-সালাতিন) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। ইঁহাদের রচনা হইতে সুলতানী যুগের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য ও ইতিহাস ছাড়া ধর্ম, দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়। সুলতান সিকান্দর লোদী নিজে একজন কবি ছিলেন। ফিরোজ তুঘলক ও সিকান্দর লোদী শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের আমলে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়।

ফার্সী ও উর্দু সাহিত্য

সুলতানী যুগে সারা দেশে ভক্তিবাদী আন্দোলন প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নতির সহায়ক হয়। সাধারণের বোধগম্য স্থানীয় ভাষায় ধর্মপ্রচারকগণ তাঁহাদের ধর্মমত ব্যাখ্যা করিতেন। রামানন্দ ও কবীর হিন্দী ভাষায় তাঁহাদের ধর্মমত প্রচার করেন। কবীরের 'দোঁহা' ও 'সখীগুলি' হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই যুগে চাঁদ বরদাই রচিত 'পৃথ্বীরাজ রসো', সারঙ্গধরের হামীর রসো ও হামীর কাব্য ও জগনায়কের কাব্যগুলি হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি ঘটায়। নামদেব মারাঠী ভাষার উন্নতি করেন।

মীরাবাঈ ব্রজভাষায় তাঁহার বিখ্যাত ভজনগুলি রচনা করেন। নানক ও তাঁহার শিষ্যরা গুরুমুখী ও পাঞ্জাবীর উন্নতিতে উৎসাহ যোগান। বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ ও ভক্তি প্রচারকদের অবদান কম নয়। জয়দেবের ভাবগম্ভীর ও সুললিত কাব্য 'গীত গোবিন্দম্' আজও বাঙালীর আদরের বস্তু। লক্ষ লক্ষ রসিক ও ভক্তজনকে ইহা আনন্দদান করিতেছে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি মৈথিলী ও সংস্কৃতে কাব্য রচনা করেন। প্রাদেশিক শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাদেশিক ভাষাগুলির যথেষ্ট উন্নতি হয়। বাংলার সুলতান হুসেন শাহ্ ও নসরত শাহ্ রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে উৎসাহ দেন। কবি কৃত্তিবাস এই সময় বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন। কবি মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গানুবাদ করিয়া হুসেন শাহের নিকট হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি পান। বিজয়নগরের রাজারা স্থানীয় তামিল, তেলেগু ও কানাড়া ভাষার উন্নতিতে উৎসাহ দেন।

প্রাদেশিক সাহিত্য



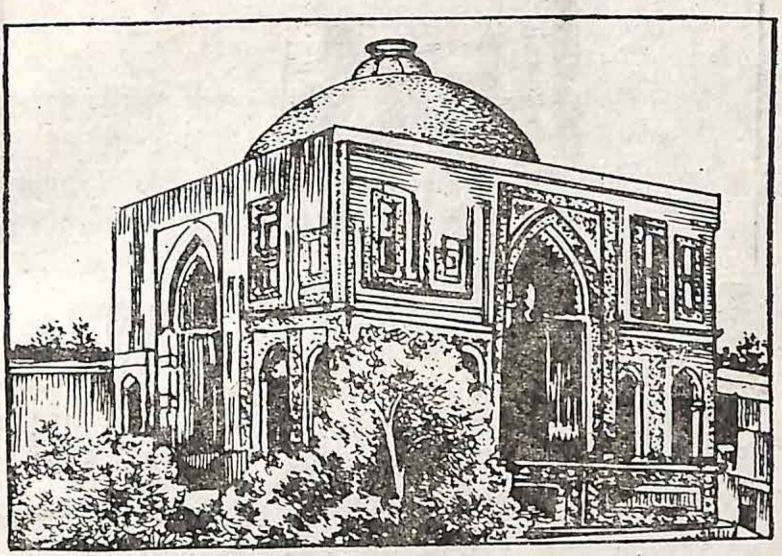
কুতুবমিনার, দিল্লী

সুলতানী যুগের শাসকগণ স্থাপত্যের অনুরাগী ছিলেন। নৃত্য ও গীত তাঁহাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের মত এ যুগের স্থাপত্য শিল্প হিন্দু ও মুসলমান রীতির সংমিশ্রণ। ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন রীতির সহিত আরব, পারস্য ও তুর্কী রীতির মিশ্রণ ঘটে। তুর্কীরা মিশর, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও আফগানিস্তানের শিল্প-রীতিও ভারতে লইয়া আসেন।

শিল্প

সুলতানী যুগের শাসকগণ নির্মাণকার্যে এদেশীয় শিল্পী ও কারিগরদের নিয়োগ করিতেন। স্বাভাবিকভাবে এদেশীয় স্থাপত্য-রীতি সুলতানী স্থাপত্যে স্থান লাভ করে। তাহা ছাড়া হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া অনেক মস্‌জিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করিবার ফলে উভয় রীতির মিশ্রণ ঘটে। ইসলামী গম্বুজ, খিলান ইত্যাদির সহিত সূক্ষ্ম নক্সা ও অলঙ্করণ মিলিত হইয়া সমন্বিত সুলতানী শিল্প-রীতির সৃষ্টি হয়। সুলতান কুতবউদ্দিন, ইলতুৎমিশ ও আলাউদ্দিন সকলেই নির্মাতা ছিলেন। কুবাতুল ইসলাম মস্‌জিদ, কুতুবমিনার, আলাই দরওয়াজা ও

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধি পার্শ্বে জামাতখানা মস্‌জিদ ইঁহাদের আমলে নির্মিত হয়। এইগুলি সুলতানী স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। স্যার জন মার্শালের মতে,



আলাই দরওয়াজা

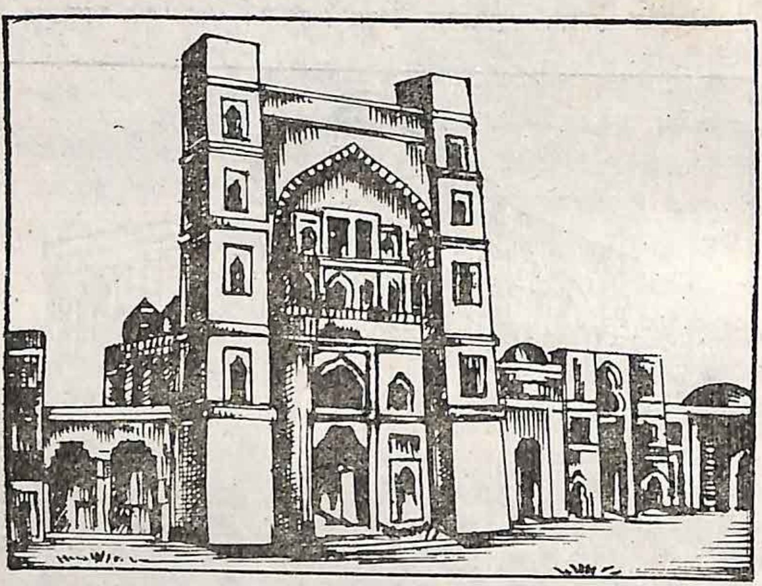
'আলাই দরওয়াজা ইসলামী স্থাপত্যের এক অমূল্য সম্পদ'।[১] সুলতানী যুগের স্থাপত্য শিল্পে ইসলামী রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। তুঘলক যুগের স্হাপত্য নিদর্শনগুলি খুবই সাদাসিধা ধরনের। ফিরোজ তুঘলকের প্রাসাদ 'কোটলা ফিরোজ শাহ' ও তাঁহার স্মৃতিসৌধ সহজ, সরল ও অলঙ্কারহীন। সম্ভবতঃ তুঘলক যুগের অর্থনৈতিক অবনতির জন্য এইরূপ সহজ, সরল শিল্প-রীতি প্রাধান্য পায়। সৈয়দ ও লোদী সুলতানগণ আবার খল্‌জী যুগের বিশাল, অলঙ্কৃত শিল্প-রীতি অনুসরণ করেন।

সুলতানী আমলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, রাজপুতনা ও বিজয়নগরে নূতন নূতন শিল্প-শৈলী গড়িয়া উঠে। হিন্দু মুসলমান স্থাপত্য-রীতির সহিত স্থানীয় রীতি যুক্ত হইয়া এই নূতন প্রাদেশিক শৈলী গঠিত হয়। জৌনপুরের সুলতানগণ যেসব মস্‌জিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন তাহা দিল্লী স্থাপত্য-রীতি হইতে পৃথক। ইহা অনেকটা হিন্দু-রীতি অনুসারী। ইহাদের মস্‌জিদে মিনার নাই। থামগুলি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ও ছোট গ্যালারী সম্বলিত। জৌনপুরের অতাল দেবী মস্‌জিদ এই রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সুলতানী যুগে বাংলাদেশেও এক মিশ্র স্থানীয় শিল্প-রীতি গড়িয়া উঠে। এখানে মস্‌জিদ, প্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণে পাথরের স্থলে ইট ব্যবহৃত হয়। নির্মাণ কৌশল, ছোট থাম, কার্নিশ, অলঙ্করণ, হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের প্রভাব মনে করাইয়া দেয়। গৌড় পাণ্ডুয়ার ছোট সোনা মস্‌জিদ, বড় সোনা মস্‌জিদ ও আদিনা মস্‌জিদ এই স্হাপত্য-রীতির নিদর্শন। গুজরাটে

প্রাদেশিক শিল্প

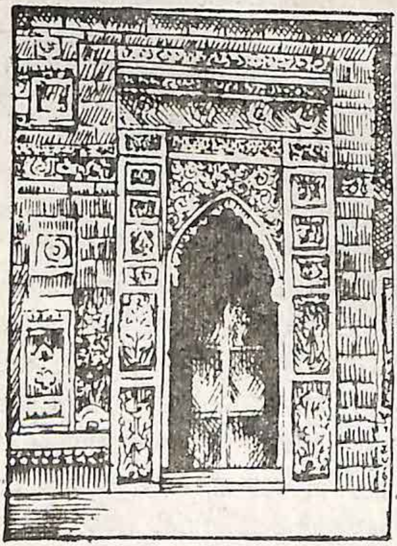
(১) 'The Alai Darwaza is one of the most treasured gems of Islamic architecture.'

শিল্প সুষমামণ্ডিত এক নূতন ধরনের স্থাপত্য-রীতি গড়িয়া উঠে। স্থানীয় রীতির



অতাল দেবী মস্‌জিদ, জৌনপুর

সহিত ইসলামী প্রভাব যুক্ত হইয়া নূতন রীতির সৃষ্টি হয়। কাঠের কাজের সহিত পাথরের উপর সূক্ষ্ম কাজ ও অলঙ্করণ গুজরাট শৈলীর বৈশিষ্ট্য। কাশ্মীরের সুলতানগণ পাথর ও কাঠের মিশ্রিত স্থাপত্য কৌশল বজায় রাখেন। শুদ্ধ ইসলামী সৌধ নির্মাণ পদ্ধতি ও অলঙ্করণ যুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যের বাহমনী সুলতানগণ ভারতীয়, তুর্কী, মিশরীয় ও পারসীক শৈলীর এক মিশ্র রীতি চালু করেন। গুলবর্গার জামি মস্‌জিদ, দোলতাবাদের চাঁদমিনার ও বিজাপুরে আদিল শাহের সমাধি এই স্থাপত্য-রীতির নিদর্শন। রাজপুতনায় রাজপুত রাজগণ এবং বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা হিন্দু-রীতি অনুযায়ী মন্দির, প্রাসাদ, দুর্গ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করান। রাণা কুম্ভের কীর্তিস্তম্ভ ও কুম্ভলগড় দুর্গ ও কৃষ্ণদেব রায়ের বিট্‌ঠলস্বামী মন্দির এই রীতির নিদর্শন। গোপুরম (সম্মুখদ্বার), মণ্ডপ ইত্যাদি দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দুমন্দির শৈলীর বৈশিষ্ট্য।



ছোট সোনা মস্‌জিদ, গৌড়

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ—**(ক) বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (খ) বাহমনী রাজ্য কোন্ অঞ্চলে গড়িয় উঠে ? (গ) বিজয়নগর রাজ্য কাহারা প্রতিষ্ঠা করেন ? (ঘ) এই রাজ্য কোন্ অঞ্চলে স্থাপিত হয় ? (ঙ) নসরত শাহ্ কে ছিলেন ? (চ) সুলতানী যুগে কোন্ কোন্ অঞ্চলে নূতন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়িয়া উঠে ? (ছ) কবি জয়দেব কেন খ্যাতিলাভ করিয়াছেন ? (জ) বিদ্যাপতি কে ? (ঝ) প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির উন্নতির কারণ কি ? (ঞ) পেন্দন কে ছিলেন ? (ট) মাহমুদ গাওয়ান কে ছিলেন ? (ঠ) দুইজন সুফী সাধকের নাম কর। (ড) সুলতানী যুগে বাংলার রাজধানী কোথায় ছিল ? (ঢ) বাহমনী সুলতানদের রাজধানী কোথায় ছিল ? (ণ) বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—**(ক) বাংলায় বার বার বিদ্রোহের কারণ কি ? (খ) ইলিয়াস্ শাহ্ ও সিকান্দর শাহ্ কিভাবে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন ? (গ) বিজয়নগর ও বাহমনী দ্বন্দ্বের কারণগুলি আলোচনা কর। (ঘ) সুলতানী যুগের প্রথম-দিকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ ছিল ? (ঙ) হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় কিরূপে ঘটে ? (চ) সুফীবাদ কি ? ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (ছ) সুলতানী যুগে ফার্সী সাহিত্যের অগ্রগতির পরিচয় দাও। (জ) সুলতানী যুগের স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দাও। (ঝ) চৈতন্যদেবের জীবন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর ঃ—**(ক) বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের কৃতিত্বের পরিচয় দাও। (খ) বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও। (গ) বিজয়নগর সাম্রাজ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল ? (ঘ) বিজয় নগরের সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর পরিচয় দাও। (ঙ) ভক্তিবাদী আন্দোলন বলিতে কি বুঝ ? ইহা দেশে কিরূপে ঐক্য ও সমন্বয় সৃষ্টি করিয়াছিল ? (চ) হুসেন শাহের রাজত্বকালের বর্ণনা দাও। তাঁহার রাজত্বকালে যে নবজাগরণ ঘটিয়াছিল তাহার পরিচয় দাও।

৪। **টীকা লিখ ঃ—**(ক) একডালা দুর্গ (খ) কদম রসুল মস্জিদ (গ) ছোট সোনা মস্জিদ (ঘ) উর্দু সাহিত্য (ঙ) নামদেব (চ) কবীর (ছ) নানকদেব (জ) আবদুর রজ্জাক (ঝ) বারবোসা (ঞ) পায়েস।

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**—(ক) — বাংলায় স্বাধীন সুলতানীর প্রতিষ্ঠা করেন। (খ) ফিরোজ তুঘলক — আমলে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। (গ) চীনা দূত — বিবরণী হইতে সুলতানী যুগে বাংলার পরিচয় পাওয়া যায়। (ঘ) চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর রূপ ও সনাতন্ সুলতান — আনুকূল্য লাভ করেন। (ঙ) বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে — ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (চ) বিজয়নগর রাজ্যে — প্রথা ছিল। (ছ) আমুক্তমাল্যদা — রচনা।

৬। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও ঃ**—(ক) সুফীবাদে রোজা, নামাজ, হজ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত / হইত না। (খ) সুফী সম্প্রদায় দুইটি / তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। (গ) রামানুজ / রামানন্দের বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন কবীর। (ঘ) পণ্ডিত উমরাণী বলবন / মহম্মদ তুঘলক / ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের সমসাময়িক ছিলেন। (ঙ) সুলতান সিকান্দর লোদী নিরক্ষর / কবি ছিলেন। (চ) কবীরের দোহাগুলি হিন্দী / ফার্সী / উর্দু ভাষায় রচিত।

দশম অধ্যায়

মুঘল যুগ, ১৫২৬—১৭০৭

(The Mughal Age)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুঘল ইতিহাসের উপাদান (Sources of Mughal History) :

মুঘল যুগের ইতিহাসের ভিত্তি খুবই মজবুত। এই যুগের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিককে বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় না। বিবিধ উপাদান বিশ্লেষণ ও তুলনা করিয়া ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে। মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় : (১) **ঐতিহাসিক সাহিত্য ও আত্মজীবনী, (২) সরকারী আদেশ, চিঠি ও পরিসংখ্যান,** (৩) **মুদ্রা, লেখ ও স্থাপত্য,** (৪) **প্রাদেশিক সাহিত্য ও ইতিহাস** এবং (৫) **বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী।**

ঐতিহাসিক সাহিত্য ও আত্মজীবনী

(১) মুঘল সম্রাটগণ ছিলেন শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী। তাঁহাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম পণ্ডিতগণ মুঘল যুগের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। মির্জা মুহম্মদ হায়দার ও খন্দ আমীরের 'তারিখ-ই-রশিদী' ও 'হুমায়ুননামা' মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম পর্বের ইতিহাস। আবুল কাশেম ফিরিস্তার 'গুলসাম ই-ইব্রাহিমী', আবুল ফজলের 'আকবরনামা' ও 'আইন ই-আকবরী', আব্দুল কাদের বদায়ুনীর 'মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ', নিজামুদ্দিন আহমদের 'তবাকৎ-ই-আকবরী', আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'পাদশাহনামা' ও মুহম্মদ হাশিম কাফী খানের 'মুন্তাখাব-উল-লুবাব' মুঘল যুগের দরবারী ইতিহাস। সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-বাবরী' বা বাবরনামা, বাবর-কন্যা গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা' ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' হইতে মুঘল ইতিহাসের বহু তথ্য পাওয়া যায়। (২) মুঘল ইতিহাসের অপর উল্লেখযোগ্য উপাদান হইল সম্রাটদের ফরমান, চিঠিপত্র ও পরিসংখ্যান সম্বলিত গ্রন্থগুলি। দস্তুর-উল-আমল বা গেজিটিয়ার, সম্রাটদের মুন্সী বা সেক্রেটারীদের সঙ্কলিত পত্রাবলী,[১] সরকারী আদেশ বা ফরমান, দরবারের সংবাদ বুলেটিন (আখবরাত-ই-দরবার-ই-মুয়াল্লা) মুঘল ইতিহাস রচনায় অনেক তথ্য সরবরাহ করে।

সরকারী আদেশ, চিঠিপত্র ও পরিসংখ্যান

(৩) মুঘল যুগের মুদ্রা, লেখ ও স্থাপত্য নিদর্শন অসংখ্য। এই যুগের মুদ্রাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। মুঘল সম্রাটগণ ছিলেন স্থাপত্য কর্মের রসগ্রাহী রূপকার। অসংখ্য শিল্প শ্রীমণ্ডিত প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি তাঁহাদের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছে। তাঁহাদের

---

(১) সম্রাট আরঙ্গজেবের সেক্রেটারী মুন্সী ইনায়েতুল্লাহ খানের 'আহকাম-ই-আলমগিরী' এরূপ একখানি আকর গ্রন্থ।

উৎকীর্ণ লিপি ও স্থাপত্য নিদর্শন হইতে এ যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করা যায়। তাজমহল, লালকেল্লা, আকবরের সমাধি, জামা মস্‌জিদ, দেওয়ানি খাস প্রভৃতি অপূর্ব শিল্প নিদর্শনগুলি এই যুগে নির্মিত হয়। (৪) মুঘল যুগের ইতিহাসের এক বিশিষ্ট উপাদান হইল প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক সাহিত্য। মারাঠী ভাষায় রচিত 'বখর সাহিত্য', আসামী ভাষায় 'বুরাঞ্জী' ও উড়িয়া ভাষায় লিখিত 'উড়িয়া পঞ্জিকা' হইতে মুঘল যুগের কতক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজপুত চারণ কবিদের রচনা ও প্রাদেশিক দরবারের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিও মুঘল ইতিহাসের উপাদান। আলী মুহম্মদ খানের 'মিরাত-ই-আহম্মদী' (গুজরাটের ইতিহাস) ও সলিমুল্লাহর তারিখ-ই-বাঙ্গলা (বাংলার ইতিহাস) প্রাদেশিক ইতিহাসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। (৫) মুঘল যুগে বহু বিদেশী নানা উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণী হইতে মুঘল যুগের পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্যান লিন্‌সচোটেন, ফ্রাঙ্কোয়েজ পাইরাড, উইলিয়ম হকিন্স, পিয়ের দু জারিক, টমাস রো, ফ্রান্সিসকো পেলসার্ট, পিটার মুণ্ডি, সেবাস্তিয়ান মানরিক, ফ্রাঙ্কোয়েজ বার্নিয়ে, বাপটিস্ট তাভার্নিয়ে, মানুচ্চি প্রভৃতি বিদেশীরা মুঘল যুগের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের রচনা মুঘল ইতিহাসের অমূল্য উপাদান।

মুদ্রা, লেখ ও স্থাপত্য নিদর্শন

প্রাদেশিক সাহিত্য ও প্রাদেশিক ইতিহাস

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী

ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা (Foundation of the Mughal Padshahi by Babur) :

মোঙ্গল শব্দ হইতে মুঘল শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। মোঙ্গল শব্দ হইতে মুঘল শব্দটি উৎপন্ন হইলেও মুঘলরা কিন্তু খাঁটি মোঙ্গল নয়। মুঘলরা চুগতাই বংশীয় তুর্কী। ইহারা মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্তান প্রদেশে বাস করিত। এই অঞ্চলের মোঙ্গল, তাতার, তুর্কী ও উজবেগ প্রভৃতি জাতিগুলি একসময় যাযাবর জীবন যাপন করিত ও পার্শ্ববতী দেশগুলি লুণ্ঠন করিত। সুলতানী যুগে মোঙ্গলরা বেশ কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে। পরে ইহাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয়। রাজ্যস্থাপন করিয়া ইহারা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। বাবরের পূর্বপুরুষ তৈমুর লঙ্‌ ছিলেন মোঙ্গল ও তাতার জাতির সংমিশ্রণে গঠিত তুর্কী জাতির চুগতাই শাখার নেতা।[১] সমরকন্দ ছিল তাঁহার রাজধানী। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর মাতার দিক হইতে মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খানের পরিবারের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতা কতলুদ নিগার খানুম ছিলেন চিঙ্গিজ খানের বংশধর ইউনুস খানের কন্যা। পিতা ওমর শেখ মির্জা ছিলেন তৈমুরের বংশধর। এশিয়ার দুই দিগ্বিজয়ী বীরের রক্ত ছিল বাবরের ধমনীতে। মোঙ্গল ও তাতারদের সংমিশ্রণে চুগতাই তুর্কীদের উদ্ভব হইলেও ভারতে উহারা মুঘল নামে পরিচিত হয়।

মুঘলদের উৎপত্তি

(১) চাগতাই ছিলেন বিখ্যাত মোঙ্গলনেতা চিঙ্গিজ খানের দ্বিতীয় পুত্র।

বাবর (Babur) ঃ

জাহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর ইতিহাসে শুধু বাবর নামেই পরিচিত। তাঁহার পিতা ওমর শেখ মির্জা মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানের ক্ষুদ্র ফারগানা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

বাবর ঃ ১৫২৬-১৫৩০

পিতার মৃত্যুর পর মাত্র এগার বৎসর বয়সে বাবর ফারগানার শাসনভার পান (১৪৯৪)। ছোটবেলা হইতে বাবর ছিলেন সাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ অধিকার করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। ১৪৯৭ হইতে ১৫১২ খ্রী মধ্যে বাবর তিনবার সমরকন্দ দখল করিবার চেষ্টা করেন। তিনবারই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সমরকন্দের শক্তিশালী শাসক উজবেগ নেতা শাইবানী খানকে পরাস্ত করা ক্ষুদ্র ফারগানা রাজ্যের অধিপতির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে জ্ঞাতি-শত্রুদের ষড়যন্ত্রে বাবর পৈতৃক ফারগানা রাজ্যটিও হারান। এই সময় কাবুলে উজবেগ শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া বাবর প্রায় আনায়াসে কাবুল ও আফগানিস্তান দখল করিয়া মুঘল পাদশাহী বা বাদশাহীর সূচনা করেন। ১৫০৭ খ্রী বাবর নিজেকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন। কাবুলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাবর তৈমুর লঙের মত ভারত জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি লোদী শাসকদের অধীনে



বাবর

মুঘল পাদশাহীর সূচনা

দিল্লীর দুরবস্থা ও আফগান দলপতিদের মধ্যে বিরোধের খবর রাখিতেন। পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খাঁ লোদী ও সুলতান ইব্রাহিম লোদীর আত্মীয় আলম খাঁ তাঁহাকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। বাবর এরকম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৫২৫ খ্রীঃ বাবর পাঞ্জাব আক্রমণ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬

করিয়া দখল করেন। পরের বৎসর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লন। বাবরের রণনৈপুণ্য, সাহস ও সর্বোপরি গোলন্দাজ বাহিনী তাঁহাকে সাফল্য আনিয়া দেয়। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেও তাঁহার ভারত বিজয় সম্পূর্ণ হয় নাই। ভারতে বাবরের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিল দুইটি—উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে প্রতিষ্ঠিত আফগান দলপতিরা এবং রাণা সঙ্গ বা সংগ্রামসিংহের নেতৃত্বে গঠিত রাজপুত রাষ্ট্রসংঘ। ঐতিহাসিক রাসব্রুক উইলিয়ামসের মতে, পানিপথে বাবরের সাম্রাজ্য স্থাপনের শুরু হয়। ঐ যুদ্ধের পরেই তিনি দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি দখল করিতে শুরু করেন। আফগান দলপতিদের দমন করিবার কাজ শুরু হয়। এই কাজ সম্পূর্ণ হইবার আগেই রাণা সংগ্রামসিংহের নেতৃত্বে

রাজপুত রাজন্যবর্গ ও আফগান দলপতিদের কেহ কেহ বাবরকে বাধা দেন। বাবরের সহিত রাজপুত রাজা ও আফগান দলপতিদের যে যুদ্ধ হয় তাহা **খানুয়ার যুদ্ধ** নামে খ্যাত। ১৫২৭ খ্রীঃ আগ্রার নিকট খানুয়ার প্রান্তরে এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করেন। খানুয়ার যুদ্ধ পানিপথের যুদ্ধ অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পানিপথের যুদ্ধে দুর্বল লোদী সুলতান ছিলেন বাবরের প্রতিপক্ষ। আর খানুয়ায় বাবরকে শক্তিশালী রাজপুত সংঘের সম্মুখীন হইতে হয়। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে বাবরের সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে প্রধান বাধা অপসারিত হয়। রাসব্রুক উইলিয়ামস্ মন্তব্য করিয়াছেন, খানুয়ার যুদ্ধের পর বাবরের ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন নিশ্চিত হইয়া যায়। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বাবর মধ্য ভারতের চান্দেরীর রাজপুত রাজা মেদিনী রায়কে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।

খানুয়ার যুদ্ধ—১৫২৭

আফগান প্রতিরোধ তখনও শেষ হয় নাই। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদী ও বাংলার সুলতান নসরত শাহের নেতৃত্বে পূর্ব ভারতের আফগান দলপতিরা সংঘবদ্ধ হন। ১৫২৯ খ্রীঃ বাবর পাটনার নিকট ঘর্ঘরা নদীর তীরে সম্মিলিত আফগান বাহিনীকে পরাস্ত করেন। এই তিনটি যুদ্ধে জয়লাভের ফলে উত্তর ভারতের অনেকখানি অংশ বাবরের অধিকারে আসে। মাত্র চারি বৎসরের মধ্যে বাবর পাঞ্জাব, বর্তমান উত্তর প্রদেশ ও উত্তর-বিহার অধিকার করেন। রাজপুত রাষ্ট্রসংঘের নেতা রাণাসঙ্গ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৫৩০ খ্রীঃ বাবরের মৃত্যু হয়। বাবর শুধু রাজ্যজয় করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ইহার শাসনব্যবস্থা, বিচার ও সামরিক বিভাগ গঠন বা আইন ও রাজস্বব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে পারেন নাই।

ঘর্ঘরার যুদ্ধ—১৫২৯

ভারত ইতিহাসে বাবরের পরিচয় রণনিপুণ সেনাপতি ও মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা হিসাবে। তাঁহার ব্যক্তিত্বের অন্য এক পরিচয় আছে। সম্রাট ছিলেন একজন কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতের অনুরাগী মানুষ। ঈশ্বর, প্রকৃতি ও সত্যের পূজারী। তুর্কী ভাষায় লিখিত তাঁহার আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-বাবরী' বা 'বাবরনামা' পৃথিবীর একখানি শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী। এই গ্রন্থে সম্রাট নিঃসঙ্কোচে সত্যকথা লিপিবদ্ধ কয়িয়াছেন। এই আত্মজীবনীতে মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের প্রকৃতি, মানুষ, পশুপাখী, গাছপালা সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় আছে। বাবরের আত্মজীবনীতে হিন্দুস্তানের কথা আছে। এখানকার জলবায়ু, মানুষজন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। রাজ্য ও রাজনীতির কথাও বাদ দেন নাই। প্রথম দর্শনে ভারতীয়দের তাঁহার ভাল লাগে নাই। উষ্ণ দেশের জলবায়ু, মানুষজন, পশুপাখী, বাসস্থান, আহার্য বস্তু ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাঁহার পছন্দ হয় নাই। মধ্য এশিয়ার শীতল জলবায়ু, ঝর্নার গান ও পাখীর ডাক তাঁহার মনে পড়িত। ভারতের বর্ষা ও শীতকালীন জলবায়ু তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। এই দেশের বিশালতা ও ইহার অফুরন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য ভাণ্ডার তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এদেশের কৃষক ও গরীবদের দারিদ্র্য তাঁহার দৃষ্টি

তুজুক ই বাবরী বা বাবরনামা

এড়ায় নাই। ইহাদের দেহে তিনি স্বল্পবাস লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে এদেশে অসংখ্য কুশলী কারিগর ও শ্রমিক পাওয়া যাইত। বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোক নিযুক্ত হইত। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বাবর লিখিয়াছেন 'ভারতের রাজধানী দিল্লী…আমি যখন ঐ দেশ জয় করি তখন ওখানে পাঁচটি মুসলমান ও দুইটি হিন্দু রাজ্য ছিল।' তিনি মালব, গুজরাট, বাহমনী, মেবার ও বিজয়নগর রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাবরের আত্মজীবনী অসম্পূর্ণ। ইহাকে নির্ভুলও বলা যায় না। এই ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও বলা যায় ইহা ভারত ইতিহাসের একখানি আকর গ্রন্থ।

মুঘল ও আফগানদের মধ্যে আধিপত্যের লড়াই (Mughal-Afghan contest for supremacy) :

ভারত ইতিহাসে প্রথম পানিপথের যুদ্ধ (১৫২৬) হইতে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ (১৫৫৬) পর্যন্ত সময়কাল মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ হিসাবে চিহ্নিত। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আকবরের জয়লাভের পর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার তিনটি পর্ব : (১) ১৫২৬-১৫৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রথম পর্বে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। ঘর্ঘরার যুদ্ধে পূর্ব ভারতের আফগানদের পরাস্ত করিয়া তিনি মুঘলদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। বাবর আফগানদের পরাস্ত করিলেও একেবারে ধ্বংস করিতে পারেন নাই।

মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১৫২৬-১৫৫৬

(২) দ্বিতীয় পর্বে বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের রাজত্বকালে (১৫৩০-৪০, ১৫৫৫-৫৬) আফগান শক্তি মালব, গুজরাট ও পূর্ব ভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। হুমায়ুন গুজরাটের বাহাদুর শাহ ও বাংলা-বিহারের শের শাহকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হন নাই। শের শাহের নিকট চৌসা (১৫৩৯) ও কনৌজের (১৫৪০) যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া হুমায়ুন ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ভারতে শের শাহের নেতৃত্বে আফগান শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। শের শাহ দিল্লী অধিকার করিয়া আফগান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৫৪০ ১৫৪৫)। (৩) তৃতীয় পর্বে শের শাহের দুর্বল বংশধরদের নিকট হইতে হুমায়ুন পুনরায় ক্ষমতা দখল করিয়া লন (১৫৫৫)। পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিবার পর ১৫৫৬ খ্রীঃ হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। তখনও ভারতে আফগান শক্তি সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় নাই। শের শাহ প্রতিষ্ঠিত বংশের শেষ সুলতান আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু পুনরায় দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া হুমায়ুন-পুত্র আকবর ও তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খাঁ দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। মুঘল-আফগান বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

শের শাহ (Sher Shah) :

ভারতে আফগান অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন শের শাহ। তাঁহার আসল নাম ফরিদ খান। ফরিদ খান ছিলেন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গীরদার হাসানের পুত্র।

১৪৭২ খ্রীঃ ফরিদ খানের জন্ম হয়। বাল্যকালে বিমাতার চক্রান্তে ফরিদ তাঁহার পিতার জায়গীর হইতে বিতাড়িত হন। পিতার মৃত্যুর পর ফরিদ সাসারামে ফিরিয়া আসেন এবং বিহারের আফগান শাসক বাহার খান লোহানীর অধীনে চাকুরী নেন। অসাধারণ সাহসিকতায় একাকী একটি বাঘ মারিবার জন্য সুলতান বাহার খান তাঁহাকে 'শের খান' উপাধি দেন। ইহার পর শের খানের দ্রুত পদোন্নতি হয়। তিনি বিহারের ডেপুটি-গভর্ণর ও বাহার খানের নাবালক-পুত্র জালাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন। শত্রুদের কুমন্ত্রণায় সুলতান বাহার খান শের খানকে বিতাড়িত করেন। তিনি সাসারামের জায়গীরটিও হারান। এই সময় (১৫২৭-২৮) শের খান বাবরের অধীনে মুঘল সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী নেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে মুঘল সামরিক কৌশল ও রণ-নীতি তিনি আয়ত্ত করেন।

প্রথম জীবন



শের শাহ্

সম্রাট বাবর শের খানের প্রতিভা ও কর্মকুশলতায় খুশী হইয়া তাঁহাকে সাসারামের জায়গীর প্রত্যর্পণ করেন। বাবরের অধীনে চাকুরী ছাড়িয়া শের খান পুনরায় বিহারে ফিরিয়া আসেন। এবার ভাগ্য তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়। তিনি বিহারের সুলতান নাবালক জালাল খানের অভিভাবক ও বিহারের সর্বময় কর্তা হইয়া বসেন। চুনার দুর্গের অধিপতির বিধবাকে বিবাহ করিয়া শের খান ঐ দুর্গ লাভ করেন।

ক্ষমতা বৃদ্ধি

শের খানের ক্ষমতা বৃদ্ধি অন্যান্য আফগান নেতা ও নাবালক সুলতানের ঈর্ষার কারণ হয়। লোহানী সুলতান জালালখান বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহের সহিত সম্মিলিতভাবে শের খানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। শের খান বিহারের সুরজগড়ের যুদ্ধে (১৫৩৩ খ্রীঃ) বিহার ও বাংলার সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে



হুমায়ুন

জয়লাভের ফলে শের খান বিহারের একচ্ছত্র অধিপতি হন। এই সময় মুঘল সম্রাট হুমায়ুন গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ কে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হন। গুজরাট জয় করিয়া তিনি মালব আক্রমণ করেন। এই অবসরে শের শাহ্ দুইবার বাংলা দেশ আক্রমণ করিয়া গৌড় দখল করিতে সক্ষম হন (১৫৩৭)। হুমায়ুন এইবার বাংলা বিহারের আফগান দলপতি শের খানকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হন। বিহারের চুনার দুর্গ অবরোধ করিয়া তিনি বৃথা কালক্ষেপ করেন। হুমায়ুন বাংলার দিকে অগ্রসর হইলে শের খান মুঘল বাহিনীর সহিত সংঘর্ষ এড়াইয়া বিহার, জৌনপুর ও কনৌজ দখল করিয়া নেন। হুমায়ুন গৌড় দখল করিয়া অযথা আমোদ-প্রমোদে সময় কাটান। পরে পশ্চিমে শের খানের কার্যকলাপের সংবাদ পাইয়া হুমায়ুন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে বক্সারের নিকট চৌসাতে (১৫৩৯) শের খান তাঁহাকে পরাস্ত করেন।

শের শাহের সামরিক সাফল্য

চৌসাতে বিজয়লাভের পর শের খানের উচ্চাভিলাষ জাগরিত হয়। তিনি রাজকীয় শের শাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা চালু করা হয়। পরের বৎসর হুমায়ুন আবার শের শাহ্ কে দমন করিবার চেষ্টা করেন। শের শাহ্ কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০) হুমায়ুনকে দ্বিতীয়বার পরাস্ত করেন। ইহার পয় ভারতে মুঘল শাসনের অবসান হয়। সিন্ধুর অমরকোট, পাঞ্জাব, কাবুল কোথাও আশ্রয় না পাইয়া হুমায়ুন পারস্যে চলিয়া যান। শের শাহ্ দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া আফগান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লী দখল করিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী শের শাহ্ সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। মধ্য ভারতে মালব, গোয়ালিয়র, রণথম্ভোর ও চান্দেরী অধিকৃত হয়। বাংলার বিদ্রোহ দমন করা হয়। মাড়ওয়ার রাজ্যের শক্তিশালী রাজা মালদেবকে পরাস্ত করিয়া শের শাহ্ আজমীর হইতে আবু পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে এক বিস্ফোরণে শের শাহ্ নিহত হন (১৫৪৫)। কাশ্মীর, আসাম ও গুজরাট বাদে সমগ্র উত্তর ভারত শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

শের শাহের দিল্লী অধিকার ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

শের শাহের সাম্রাজ্য

শের শাহের শাসনব্যবস্থা : বিজেতা অপেক্ষা শাসক হিসাবে শের শাহের কৃতিত্ব অধিক।[১] মাত্র পাঁচ বৎসরের রাজত্বকালে (১৫৪০-১৫৪৫) শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-সংস্কারের অনেকখানি নিজের মৌলিক উদ্ভাবনী প্রতিভার দান। অতীতকালের হিন্দু ও সুলতানী শাসন-ব্যবস্থার সহিত নিজ সৃজনী প্রতিভাসৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত করিয়া শের শাহ্ এই শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। চরিত্র বিচারে তাঁহার শাসন নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীভূত

(১) 'His qualities as a ruler were more remarkable than his victories on the field of battle.

স্বৈরাচারী ব্যবস্থা। তবে তাঁহার স্বৈরাচারী ব্যবস্থা ছিল জ্ঞানদীপ্ত ও জনগণের মঙ্গল ও স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত। সামরিক শক্তি নয়, জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল তাঁহার শাসনের ভিত্তি। উইলিয়ম আরস্কিনের মতে, 'আকবরের আগে আর কোন শাসক শের শাহের মত জনগণের স্বার্থে আইন ও শাসন পরিচালনা করেন নাই।'

শাসনব্যবস্থার চরিত্র

শাসনের সুবিধার জন্য শের শাহ্ সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে ভাগ করেন। প্রতি সরকারে শিকদার-ই-শিকদারান ও মুন্সিফ-ই-মুন্সিফান নামক দুই শ্রেণীর কর্মচারী সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ পরিচালনা করিত। সরকারগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। প্রতি পরগণায় শাসন, বিচার ও রাজস্ব আদায়ের কার্য পরিচালনার জন্য শিকদার, মুন্সেফ, আমীন, কারকুন প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত হইল। গ্রামে ছিল পাটোয়ারী, চৌকিদার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের শান্তিরক্ষা এবং রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করা ছিল ইহাদের কাজ।

শাসন-বিভাগ—
সরকার, পরগনা ও গ্রাম

শের শাহের শাসন সংস্কারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহার ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা। জমি জরীপ করাইয়া শের শাহ্ রাজস্ব ধার্যের ব্যবস্থা করেন। সাধারণতঃ উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব ধার্য হইত। উৎপন্ন শস্যে বা টাকায় রাজস্ব জমা দেওয়া চলিত। আমীন, শিকদার, মুকদ্দম, কানুনগো ও পাটোয়ারীরা রাজস্ব আদায় করিত। রাজস্ব ধার্যের সময় উদারতা দেখান হইত। আদায়ের সময় চলিত কড়াকড়ি। রাষ্ট্র প্রজার অধিকার ও রাজস্ব ধার্য করিয়া 'পাট্টা' দিত। প্রজা রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব ও অধিকার স্বীকার করিয়া 'কবুলিয়ত' দিত। এই 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়ত' ব্যবস্থা শের শাহ প্রথম চালু করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অন্য কোন কারণে শস্যহানি ঘটিলে রাজস্ব মকুব বা ঋণ দান করিবার ব্যবস্থা ছিল। শের শাহের রাজস্ব-সংস্কারে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পায় ও জনগণের সুবিধা হয়। ভূমি ও রাজস্বের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে। শের শাহ প্রবর্তিত এই ভূমি-রাজস্বব্যবস্থা পরবর্তীকালের শাসকগণ গ্রহণ করেন।

ভূমি রাজস্বব্যবস্থা

শের শাহ্ দেশের মুদ্রা ও শুল্ক-নীতির সংস্কার করেন। আগেকার সুলতানদের মুদ্রাগুলির মূল্য ও ওজনে প্রায়শঃ অবনতি দেখা যাইত। বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হারও নির্দিষ্ট ছিল না। শের শাহ্ এই ত্রুটিগুলি দূর করিয়া স্থায়ী নির্দিষ্ট মানের স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা চালু করেন। তিনি দেশের মধ্যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ শুল্ক তুলিয়া দেন। শুধু দেশের সীমান্তে ও বাজারে পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপন ও আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই দুই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি দেখা দেয়। যোগাযোগ, বাণিজ্যিক উন্নতি ও সামরিক প্রয়োজনে শের শাহ্ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধ্যে বড় বড় রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। পূর্ব বাংলা হইতে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত **'গ্রান্ড ট্রাংক রোড'** ইহাদের মধ্যে

মুদ্রা ও শুল্ক সংস্কার

রাস্তাঘাট ও সরাই নির্মাণ

প্রধান। ইহা ছাড়া আগ্রা হইতে বুরহানপুর, যোধপুর ও চিতোর এবং লাহোর হইতে মুলতান পর্যন্ত আরও চারিটি বড় রাস্তা তিনি নির্মাণ করান। শের শাহ্ রাস্তার ধারে বিশ্রামাগার স্থাপন ও বৃক্ষরোপণ করেন। বিশ্রামাগার বা সরাইখানাগুলি ডাকচৌকি হিসাবে কাজ করিত। শের শাহ্ দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন।

দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিস ও গুপ্তচর ব্যবস্থা গঠন করা হয়। কোন অঞ্চলে অপরাধ ঘটিলে স্থানীয় লোকদের দায়ী করা হইত (local responsibility for local crimes)। গ্রাম-প্রধান গ্রামের শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকিতেন। দণ্ডাদেশ কঠোর থাকায় গ্রাম-প্রধান অপরাধীদেয় ধরাইয়া দিতেন। শের শাহের গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসে। সম্রাট তাঁহার গুপ্তচরদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের অবস্থার খবর পাইতেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতেন।

পুলিস ও গুপ্তচর ব্যবস্থা

দেশের বিচারব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সম্রাট। তাঁহার অধীনে রাজধানীতে ছিলেন প্রধান কাজী। সরকার ও পরগনায় আমীন ও মুন্সেফ দেওয়ানী বিচার করিত। কাজী ও মির-ই-আদল ফৌজদারী বিচারকার্য পরিচালনা করিত। শের শাহ্ ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়-পরায়ণ সম্রাট। বিচারের ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট উচ্চ-নীচ ও শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ছিল না।

বিচার-বিভাগ

শের শাহ্ সুলতান আলাউদ্দিনের মত সম্রাটের অধীনে নিয়মিত বেতনভোগী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে দেড় লক্ষ অশ্বারোহী, পঁচিশ হাজার পদাতিক, পাঁচ হাজার হাতী ও গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া ফৌজদারদেয় অধীনে সেনা সন্নিবেশ করা হয়। সম্রাট নিজে সৈন্যদের নিয়োগ, শিক্ষা, বেতন ও শৃঙ্খলার তদারকি করিতেন। প্রত্যেকটি সৈনিকের জন্য বিস্তৃত বিবরণ (হুলিয়া) এবং অশ্বের জন্য 'দাগ' ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। এ সমস্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল সৈন্য বিভাগে দুর্নীতি দূর করিয়া শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। শের শাহের সৈন্যবাহিনী শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সমরকুশল ছিল।

সামরিক বিভাগে সংস্কার

সম্রাট শের শাহ্ নিজে ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মভীরু মুসলমান। তবে অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা ছিল। ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর মতে, শের শাহ্ হিন্দুদের প্রতি ন্যায়বিচার ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। বহু হিন্দুকে তিনি উচ্চ রাজপদ দেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড় তাঁহার একজন সেনাপতি ছিলেন। শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের অনুরাগী এই সম্রাট হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি সমন্বয়ে বিশ্বাস করিতেন। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসে শের শাহ্ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজ বরিতেছেন।

ধর্মীয় উদারতা

সাসারামের সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়া শের শাহ্ আপন প্রতিভাবলে ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁহার সমরকুশলতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক জ্ঞান ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা তাঁহার শাসনকালকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এইচ. জি. কীনের মতে, 'ব্রিটিশসহ কোন সরকারই এই পাঠানের মত শাসনকার্যে বিচক্ষণতা দেখাইতে পারে নাই'।[১]

শের শাহের অবদান

(১) 'No government, not even the British, has shown so much wisdom as this Pathan.'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহামতি আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

(Akbar The Great)

আকবরের অধীনে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার : ১৫৪২ খ্রীঃ সিন্ধুর অমরকোটে আকবরের জন্ম হয়। ১৫৫৬ খ্রীঃ যখন সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যু হয় তখন আকবর কার্যতঃ ছিলেন শুধু পাঞ্জাবের অধিপতি। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর দিল্লীর মুঘল গভর্নরকে পরাজিত করিয়া আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আকবর দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। এই সময় হুমায়ুনের বিশ্বস্ত উজীর বৈরাম খান ছিলেন আকবরের অভিভাবক। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ হইতে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয় (The Second Battle of Panipat marked she real beginning of the Mughal Empire in India)। ১৫৬০ খ্রীঃ শক্তিশালী ও কঠোর প্রকৃতির অভিভাবক বৈরাম খানকে পদচ্যুত করিয়া আকবর স্বহস্তে ক্ষমতা তুলিয়া লন। পরবর্তী দুই বৎসর তাঁহার ধাত্রীমাতা মাহম আনগ ও তাঁহার পুত্র আদম খান সম্রাট ও প্রশাসনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ১৫৬৪ খ্রীঃ আকবর হারেম প্রভাব (Petti-coat Government) হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হন। ঐ সময় হইতে তিনি স্বাধীনভাবে সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করিতেন।

প্রথম জীবন

১৫৫৬ হইতে ১৬০১ খ্রীঃ খান্দেশের আসীরগড় দুর্গ অধিকার পর্যন্ত আকবর সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি অনুসরণ করেন। চরিত্র ও মানসিকতায় আকবর ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। পররাজ্য আক্রমণ করা রাজার কর্তব্য বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করিয়া রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন তাঁহার আদর্শ ছিল। এইদিক হইতে তিনি ছিলেন মৌর্য, গুপ্ত ও সুলতানী যুগের যোগ্য উত্তরাধিকারী। জার্মান ঐতিহাসিক ফন নোয়ারের (Von Noer) মতে, আকবর সারা দেশ মুঘল শাসনাধীনে আনিয়া রাজনৈতিক ঐক্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী নীতি



আকবর

১৫৫৮ হইতে ১৫৬০ খ্রীঃ মধ্যে আকবর একে একে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর অধিকার করেন। এইগুলি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ১৫৬১ খ্রীঃ আকবরের সেনাপতি আদম খান ও পীরমহম্মদ মালবের সুলতান বাজবাহাদুরকে পরাস্ত করিয়া

মালব দখল করেন। ১৫৬৪ খ্রীঃ আকবর সেনাপতি আসফ খানকে মধ্যপ্রদেশের গন্ডোয়ানা রাজ্যটি অধিকার করিতে নির্দেশ দেন। এই রাজ্যের রানী বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী ও তাঁহার শিশুপুত্র বীরনারায়ণ অসীম সাহসিকতার সহিত মুঘল বাহিনীকে বাধা দিয়াছিলেন। সেনাপতি আসফ খান উভয়কে পরাস্ত করিয়া গণ্ডোয়ানা অধিকার করেন।

খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭) রাজপুত শক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই। রাজপুতরা সাহসী ও সমরকুশল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণধী আকবর বুঝিয়াছিলেন রাজপুতদের বন্ধুত্ব মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় সহায়ক হইবে। রাজপুতরা ভারতীয় হিন্দুদের নেতা। ভারতীয়রা আফগানদের বিদেশী বলিয়া মনে করে না। ইহাদের চোখে মুঘলরা বিদেশী। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী করিতে হইলে রাজপুতদের সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন হইবে। রাজপুতরা সৈন্যাধ্যক্ষ, শাসক, কূটনীতিবিদ্ ও সৈন্য দ্বারা মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংগঠনে সহায়তা করিতে পারে। রাজপুতদের সমর্থন লাভ করিলে ভারতের হিন্দুদের আনুগত্যও লাভ করা সহজ হইবে। আকবর উদার ও সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করিয়া রাজপুতদের সহযোগিতা লাভের সিদ্ধান্ত নেন। ভারতে জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের শাসন-নীতি স্থির হইয়া যায়। শক্তিশালী রাজপুতদের শত্রু না করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের বন্ধুরূপে আকবর তাহাদের শৌর্য-বীর্য সাম্রাজ্যের সেবায় নিয়োগ করেন। আকবরের নীতির ফলে পরবর্তী চারি পুরুষ ধরিয়া মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও কূটনীতিবিদ্‌দের সাহায্যে মুঘল সাম্রাজ্য লাভ করে।[১] বলা যায়, আকবরের সাম্রাজ্য ছিল মুঘল শৌর্য ও কূট-নীতি এবং রাজপুত বীর্য ও সেবার সম্মিলিত ফল (The Empire of Akbar was, infact, the outcome of the co-ordination of Mughal prowess and diplomacy and Rajput valour and service)।

আকবরের রাজপুত নীতি

আকবর রাজপুতদের প্রতি একই সঙ্গে বন্ধুত্ব ও বলপ্রয়োগের নীতি অনুসরণ করেন। ১৫৬২ খ্রীঃ অম্বররাজ বিহারীমল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি নিজ কন্যার সহিত আকবরের বিবাহ দেন। রাজা বিহারীমল, পুত্র ভগবানদাস ও পৌত্র মানসিংহ মুঘল সৈন্যবাহিনীতে উচ্চপদ লাভ করেন। মুঘল ও অম্বররাজ পরিবারের মধ্যে এই বন্ধুত্ব মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত টিকিয়াছিল। তবে রাজপুত রাষ্ট্রসংঘের নেতা মেবারের রাণা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ১৫৬৭ খ্রীঃ আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে রাণা উদয়সিংহ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। রাজপুতবীর জয়মল ও পত্ত অসীম সাহসিকতায় চিতোর রক্ষার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ১৫৬৮ খ্রীঃ সম্রাট চিতোর অধিকার করেন। চিতোরের পতনের পর অন্যান্য রাজপুত

(১) 'Thus was opened tne way through which the Mughal Emperors were able to secure the servicess of the some greatest captains and diplomats that medieval India produced.'

রাজারা একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজপুত রাজ্য বিকানীর, জয়সলমীর, রণথম্ভোর ও কালিঞ্জর আকবরের অধিকারে আসে।

মেবার পরাজিত হইলেও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার বীর পুত্র **রাণা প্রতাপ** দুর্জয় সাহস ও জ্বলন্ত দেশপ্রেম লইয়া মুঘল-বাহিনীর প্রতিরোধ করেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ হলদিঘাটের যুদ্ধে মুঘল সেনাপতি আসফখান ও মানসিংহের নিকট পরাস্ত হইলেও **রাণা প্রতাপ** মুঘল সম্রাটের নিকট নতি স্বীকার করেন নাই। শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে আজীবন মুঘল বাহিনীর সহিত লড়াই করিয়া রাণা প্রতাপ মৃত্যুর পূর্বে রাজধানী চিতোর ও আজমীর ছাড়া প্রায় সমস্ত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর পর পুত্র অমরসিংহ আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যান। ১৫৯৯ খ্রীঃ তিনি মুঘল সেনাপতি মানসিংহের নিকট পরাস্ত হন।

আকবরের বিজয় অভিযানঃ গুজরাট, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা



রাণা প্রতাপ

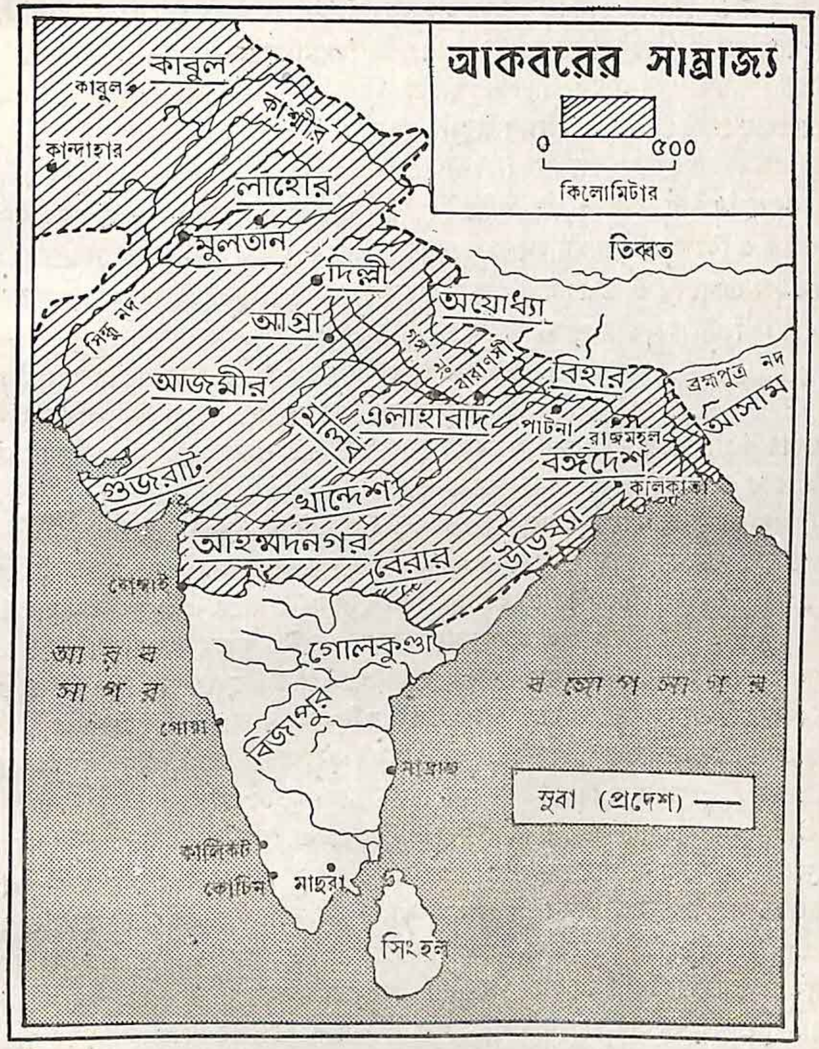
রাজপুতনা বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া আকবর গুজরাট জয়ে মন দেন। গুজরাট সম্পদশালী এবং পশ্চিম ভারতের কয়েকটি সমৃদ্ধ বন্দর ছিল এই রাজ্যের মধ্যে। ১৫৭২ খ্রীঃ আকবর নিজে গুজরাটের সুলতান তৃতীয় মুজাফফর শাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। গুজরাট অধিকার করিয়া আকবর ইহাকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। গুজরাটের পর আকবর একে একে বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা জয় করেন। ১৫৭৪ খ্রীঃ মুঘলবাহিনী বিহার অধিকার করে। ১৫৭৬ খ্রীঃ রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার পাঠান সুলতান দাউদ খানকে পরাস্ত করিয়া মুঘলবাহিনী বাংলা অধিকার করিয়া লয়। ১৫৯২ খ্রীঃ উড়িষ্যা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

উত্তর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পূর্ণ করিয়া আকবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে নজর দেন। কাবুল, কান্দাহার, সিন্ধু, মুলতান ও বেলুচিস্তান একে একে অধিকার করা হয়। ১৫৮৬ খ্রীঃ সেনাপতি ভগবান দাস ও কাসিম খান কাশ্মীর অধিকার করেন। জীবনের শেষদিকে আকরর দক্ষিণ ভারত জয়ে মনোনিবেশ করেন। দক্ষিণ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের পশ্চাতে দুইটি কারণ ছিল। ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ করা এবং পশ্চিম ভারতে গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজ অনুপ্রবেশ রোধ করা। বলা যায়, সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব লইয়া আকবর দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাত্য অভিযান

আকবর তাঁহার দাক্ষিণাত্য বিজয়-নীতি সম্পূর্ণ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের দুইটি

মুসলিম রাজ্য আহম্মদনগর ও খান্দেশ শুধু জয় করেন। ১৫৯৫ খ্রীঃ মুঘলবাহিনী আহম্মদনগর আক্রমণ করিলে নাবালক সুলতানের অভিভাবিকা বিধবা রানী বীরাঙ্গনা



চাঁদ সুলতানা তাহা প্রতিরোধ করেন। চাঁদ সুলতানার মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ গোল-যোগের সুযোগে মুঘলরা ১৬০০ খ্রীঃ আহম্মদনগর দখল করিতে সমর্থ হয়। ১৫৯৯ খ্রীঃ

আকবরের সাম্রাজ্য

আকবর খান্দেশ আক্রমণ করিয়া ইহার রাজধানী বুরহানপুর দখল করেন। খান্দেশের দুর্ভেদ্য দুর্গ আসীর গড় অধিকৃত হয়। ইহাই আকবরের শেষ বিজয় ও সাম্রাজ্যবিস্তার। উত্তর-পশ্চিমে কাবুল ও কান্দাহার

হইতে পূর্বে বাংলা এবং উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে আহম্মদনগর ও বেরার পর্যন্ত আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। আকবর পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে শুধু পাঞ্জাব লাভ করিয়াছিলেন। নিজের বাহুবল, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও কূটকৌশলে সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে পরাস্ত করিয়া আকবর এই বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন গুণে মুঘল সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করে। সুতরাং আকবরকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আকবরের শাসনব্যবস্থা (Akbar's administration) ঃ

শুধু বিজেতা হিসাবে নয়, ভারত ইতিহাসে আকবরের আসল খ্যাতি সুদক্ষ শাসন সংগঠক ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা হিসাবে। তাঁহার শাসনব্যবস্থা ছিল নিঃসন্দেহে স্বেচ্ছাচারী। তবে ইহা জ্ঞানদীপ্ত ও প্রজার মঙ্গলকামী স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা। সম্রাট ছিলেন শাসনব্যবস্থায় প্রধান। তিনি একাধারে প্রধান শাসক, প্রধান আইন-প্রণেতা, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান বিচারক। আকবরের শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল সৈন্যবাহিনী। সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। কোরাণ ও শরিয়তের অনুশাসন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হইত। তবে কোরাণ ও শরিয়তের ভাষ্যকার উলেমারা নন, সম্রাট স্বয়ং।

শাসন-সংগঠন

আকবর সারা দেশে মুঘল সম্রাটের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও শৃংখলা রক্ষার জন্য এক-কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সমগ্র সাম্রাজ্যকে মোট পনেরটি সুবায় বা প্রদেশে ভাগ করা হয়। এইগুলি হইল আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, দিল্লী, লাহোর, মুলতান, কাবুল, আজমীর, বাংলা, বিহার, আহমেদাবাদ, মালব, বেরার, খান্দেশ ও আহম্মদনগর। প্রতিটি সুবায় শাসনকার্য নিজামত ও দেওয়ানী এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সুবাদার নিজামত বা সামরিক বিভাগ, শাসন ও ফৌজদারী বিচারের ভার পাইতেন। দেওয়ান রাজস্ব ও দেওয়ানী বিচার বিভাগ পরিচালনা করিতেন। সুবাদার ও দেওয়ান উভয়েই ছিলেন সমক্ষমতাসম্পন্ন এবং তাহাদের কার্য-কলাপের জন্য সরাসরি সম্রাটের নিকট দায়ী। ইহাতে প্রদেশগুলিতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর হইত। সুবা বা প্রদেশগুলিকে শাসনের সুবিধার্থে সরকার বা জেলায় ভাগ করা হইত। সরকারগুলির শাসন পরিচালনা করিত ফৌজদার, আমলগুজার বা রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী, কানুনগো, খাজনদার (কোষাধ্যক্ষ) প্রভৃতি। প্রতিটি সরকার আবার পরগনায় বিভক্ত ছিল। পরগনায় শিকদার, আমীল, ফতেদার, কানুনগো, কারকুন প্রভৃতি কর্মচারীরা শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব আদায়ের কাজ করিত। গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের শান্তি, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিত।

শাসন-বিভাগ

আকবর পরধর্ম-সহিষ্ণু ও উদার চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি শাসনব্যবস্থায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ-নীতি অনুসরণ করেন। তাঁহার শাসনকালে হিন্দুরা শাসনব্যবস্থার বহু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসন ব্যাপারে সম্রাট হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বৈষম্যমূলক-নীতি অনুসরণ করিতেন না। হিন্দুদের উপর

উদার শাসন-নীতি ও জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

স্থাপিত জিজিয়া ও তীর্থকর তুলিয়া দিয়া আকবর তাহাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করেন। তাঁহার সমদর্শী শাসন-নীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজস্বব্যবস্থা

আকবরের শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা। দেশের জমি জরীপ করিয়া তিনি রাজস্ব ধার্যের নির্দেশ দেন। উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী জমির শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। রাজস্বমন্ত্রী তোডরমল ও মজফ্‌ফর খান সারা দেশে জাবতি, নাসাক ও বাঁটাই প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্বব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন। অনেকের মতে, আকবরের রাজস্বব্যবস্থার মূল চরিত্র রায়তওয়ারী অর্থাৎ রাষ্ট্র সরাসরি কৃষকের সহিত ভূমি বন্দোবস্ত করিত। জমিতে মধ্যস্বত্বভোগী ছিল না। প্রজার অধিকার ও দায়িত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া পাট্টা দেওয়া হইত। আকবরের রাজস্বব্যবস্থায় দেশের সমস্ত জমি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—খাল্‌সা ও জাগীর। খালসা জমির আয় সম্রাট ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই শ্রেণীর জমি হইতে আয় সরাসরি কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা পড়িত। জাগীর জমির আয় পাইত জাগীরদার। তবে জাগীর জমিতে ভূমিবন্দোবস্ত ও রাজস্বব্যবস্থা একই থাকিত। শুধু উৎপন্ন রাজস্ব জাগীরদার বা মনসবদারদের দেওয়া হইত। মনসবদার ছাড়াও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিকেও নিষ্কর জাগীর দেওয়ার প্রথা ছিল। ডঃ ইরফান হাবিবের মতে, আকবরের রাজস্বব্যবস্থায় ধার্য রাজস্বের হার ছিল বেশ উচ্চ। সাধারণতঃ উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য হইত। আকবর অন্যান্য কর ও সেস তুলিয়া দিয়া কৃষকদের উপর করভার লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্থানীয় কর 'আবওয়াব' ও রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ তিনি বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন।

সৈন্যবাহিনী

আকবর রাষ্ট্রের অধীনে নিয়মিত বেতনভোগী জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করেন নাই। তিনি মনসবদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। মনসবদাররা জাগীর ভোগ করিত। বিনিময়ে পদমর্যাদা অনুযায়ী সৈন্য ও অশ্ব রাখিত। দশ হইতে দশহাজারী মনসবদার ছিল। আলাউদ্দিন ও শের শাহ্‌ প্রবর্তিত 'হুলিয়া' ও 'দাগ' ব্যবস্থা চালু থাকিলেও মুঘল সৈন্যবাহিনীতে দুর্নীতি কম ছিল না। আকবরের সৈন্যবাহিনী অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ, নৌবাহিনী ও হস্তী এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। মনসবদারদের অধীনস্থ থাকায় মুঘল সৈন্যবাহিনীতে সম্রাট ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অভাব দেখা যাইত।

বিচারব্যবস্থা

সম্রাট আকবর ন্যায়-বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। জনগণের সুবিধার্থে তিনি সারা দেশে বিচারব্যবস্থা গঠন করেন। জনগণ যাহাতে দ্রুত ন্যায়-বিচার পায় সেদিকে সম্রাট লক্ষ্য রাখিতেন। রাজধানীতে প্রধান কাজী এবং প্রদেশগুলিতে কাজী, মুফ্‌তি ও মীরআদল ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার সমাধা করিত। গ্রামে পঞ্চায়েত সালিশীর মাধ্যমে অনেক বিরোধের নিষ্পত্তি করিত।

সম্রাট স্বয়ং ছিলেন বিচারব্যবস্থার শীর্ষে। গুরুত্বপূর্ণ বিচারের ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। সারা দেশে সুশাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করিয়া আকবর দেশে ঐক্য ও সংহতি আনয়ন করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ শক্তিশালী হয়।

দীন-ই-ইলাহী ঃ আকবর তাঁহার ধর্মীয়-সহিষ্ণুতা, সমদর্শিতা ও সর্বধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টার জন্য ভারত ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। আকবরের ধর্ম চিন্তার মূলে ছিল 'সুল-ই-কুল' বা বিশ্বজনীন শান্তি ও সহিষ্ণুতা। তাঁহার উন্নত, উদার ও সর্বদর্শী মানসিকতা গঠনে তাঁহার পরিবেশ ও শিক্ষার অবদান কম নয়। আকবরের মাতা হামিদাবানু ছিলেন পারস্যের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এক বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান পরিবারের কন্যা। শিক্ষিতা সুরুচিশীলা মাতার প্রভাব পড়িয়াছিল পুত্রের উপর। তৈমুর বংশীয় শাসকগণ স্বাধীন চিন্তা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাবর গান শুনিতে ভালবাসিতেন, জাহাঙ্গীর ছবি আঁকিতেন। আকবরের শিক্ষক আব্দুল লতিফ ছিলেন উদারনৈতিক ভাবধারার মানুষ। তিনি তাঁহার শিষ্যের মধ্যে এই মানসিকতা গঠনে কৃতকার্য হন। উদার, সংস্কৃতিবান পণ্ডিত মানুষ শেখ মুবারক ও তাঁহার দুই সুযোগ্য পুত্র আবুল ফজল ও ফৈজী আকবরের সহিত ধর্ম, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিতেন। ইঁহারা ছিলেন তাঁহার ধর্ম চিন্তায় অন্তরঙ্গ সহচর। সুফীসাধকদের ধর্মাদর্শ—ধর্মীয় ঐক্য, সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং ভক্তি আন্দোলনের মানবিকতাবাদ আকবরকে প্রভাবিত করিয়াছিল। আকবরের রাজপুত মহিষী ও তাহাদের হিন্দু আচার-ব্যবহার অন্যধর্ম সম্পর্কে তাঁহাকে সহিষ্ণুতা দান করে। তাঁহার উদার, সহনশীল ও সর্বদর্শী মন গড়িয়া উঠে।

আকবরের ধর্মচিন্তায় শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব

ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। বহু ধর্ম ও জাতির মানুষ এখানে বাস করে। ধর্মীয় ঐক্য অবশ্যই জাতীয় ঐক্যের সহায়ক হইতে পারে। ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের মত রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের জন্য আকবর ধর্মীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তবে একথা ঠিক, রাজনৈতিক প্রয়োজন ছাড়াও সম্রাটের অন্তরে এক গভীর ধর্ম জিজ্ঞাসা ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এক সত্যান্বেষী সম্রাট। সমস্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য জানিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হন। ঐতিহাসিক বদায়ুনী লিখিয়াছেন, তিনি গভীর রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে একাকী গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন এবং ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করিতেন। সমস্ত ধর্মের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিনি ফতেপুরসিক্রিতে 'এবাদত খানা' নামক এক আলোচনা সভা স্থাপন করেন। এখানে ধর্মালোচনার জন্য আকবর ইসলাম, জৈন, হিন্দু, পারসীক ও খ্রীষ্টান ধর্মগুরুদের আহ্বান করেন। হিন্দু পণ্ডিত পুরুষোত্তম ও দেবী, পার্শী পণ্ডিত দস্তুর মাহিয়ারজী রাণা ও খ্রীষ্টান পাদরী ফাদার মনসেরাট আকবরের সহিত ধর্মালোচনা করেন। ইহা ছাড়া শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের উলেমা ও জৈন ধর্মগুরুরাও তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন।

ধর্মীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা

ধর্মগুরুদের আলোচনা শুনিয়া আকবর সিদ্ধান্ত করেন সমস্ত ধর্মের মূলকথা এক (there is light in all)। সমস্ত ধর্মের মধ্যে সত্য ও ঐক্য আছে। ১৫৮২ খ্রীঃ তিনি **দীন-ই-ইলাহী** ধর্মমত প্রচার করেন। ইসলাম, হিন্দু ও খ্রীস্টান ধর্ম চিন্তার ইহা এক সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। আকবর প্রচারিত ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শুদ্ধ জীবন যাপন, নিরামিষ ভোজন, দান, ঈশ্বরের আরাধনা ও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য। এই ধর্মে পুরোহিত বা ধর্মগ্রন্থের ব্যবস্থা করা হয় নাই। পরধর্ম সহিষ্ণু আকবর নিজ ধর্মমত অন্যের উপর জোর করিয়া চাপান নাই। তাঁহার রাজসভার কয়েকজন অনুরাগী বন্ধু—বীরবল, আবুল ফজল, ফৈজী প্রভৃতি—তাঁহার নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত গঠন

ভিনসেণ্ট স্মিথ আকবরের দীন-ই-ইলাহীকে সম্রাটের 'মূর্খতার স্তম্ভ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১] ইহা ঠিক নয়। গোঁড়া মোল্লাতন্ত্রের সমর্থক বদায়ুনীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। উদার ও সমন্বয়পন্থী সম্রাটের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিবার মত মানসিকতা বদায়ুনীর ছিল না। বদায়ুনী ও জেসুইট লেখকরা মন্তব্য করিয়াছেন আকবর শেষ জীবনে ইসলামধর্ম ত্যাগ করেন। ইহাও সত্য নহে। আকবর কখনও নামাজ ত্যাগ করেন নাই। তবে একথা ঠিক আকবর সংশয়বাদী ও সমন্বয়পন্থী (eclectic) হইয়া উঠেন। ১৫৭৯ খ্রীঃ উলেমাদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া কোরাণ ও শরিয়ত ব্যাখ্যার চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্রাট 'মহজর' বা অমোঘ আদেশ বলে (infallibility decree) নিজের হাতে তুলিয়া লন। ইহাতে উলেমারা তাঁহার উপর চটিয়া যান। হিন্দুদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন ও ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টাও তাঁহারা ভাল চোখে দেখেন নাই। যুক্তিবাদী, উদার ও জাতীয়তাবাদী ধর্মাদর্শের জন্য আকবর উলেমাদের সমর্থন না পাইলেও ইতিহাসে তিনি 'মহামতি আকবর' আখ্যা পাইয়াছেন।[২]

দীন-ই-ইলাহীর সমালোচনা

আকবর ভারতের জাতীয় সম্রাট। এই নিরক্ষর সম্রাট সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। রাজনীতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও গুণীব্যক্তিদের সমাদর করিতেন। তাঁহার রাজসভায় নয়জন গুণী ব্যক্তি স্থান লাভ করেন। ইঁহাদের নবরত্ন বলা হয়। ইঁহারা হইলেন হাস্যরসিক বীরবল, সেনাপতি মানসিংহ, রাজস্ব সচিব তোডরমল, কবি ফৈজী, ঐতিহাসিক আবুল ফজল, মোল্লা দো-পিয়াজা, বিশিষ্ট প্রশাসক, লেখক ও সেনাপতি আবদুর রহিম খান-ই-খানান, সঙ্গীতগুরু তানসেন ও রাজপ্রাসাদের বিশিষ্ট কর্মচারী হাকিম হুকুম। বদায়ুনী ও নিজামুদ্দিন

আকবরের রাজসভা

(১) 'The Divine Faith was a monument of Akbar's folly, not of his wisdom.'

(২) ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান মন্তব্য করিয়াছেন, 'In his age he stood alone, not only in Islam but in the whole world ; Catholic and Protestant Christendom might both have gone and sat at his feet.'

আহম্মদ আকবরের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্সী, হিন্দী ও উর্দু ভাষার প্রসার ঘটে। তুলসীদাস, সুরদাস, তানসেন ও বীরবলের রচনায় আকবরের যুগ সমৃদ্ধ। আবুল ফজলের 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' এই যুগে রচিত হয়।

আকবরের জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার স্থাপত্য রীতিতে স্থান পাইয়াছে। এই রীতি হিন্দু, মুসলিম ও মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণ। এই মিশ্র-রীতি মুঘল-রীতি নামে পরিচিত হয়। আকবরের সময় নির্মিত হুমায়ুনের সমাধি, আগ্রা, এলাহাবাদ ও লাহোরের দুর্গ ও ফতেপুরসিক্রির প্রাসাদগুলিতে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ফতেপুরসিক্রির জামি মসজিদ ও প্রাসাদগুলি—পাঁচমহল, যোধবাঈমহল, তুর্কী সুলতানা প্রভৃতি স্থাপত্য কৌশল ও শিল্প সুষমার অপূর্ব নিদর্শন। ভিনসেণ্ট স্মিথ ফতেপুরসিক্রির প্রাসাদগুলিকে 'পাথরের রোমান্স' (romance in stone) আখ্যা দিয়াছেন। আকবর স্থাপত্য শিল্প ছাড়াও চিত্রকলা, সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে পারস্য ও ভারতীয় চিত্রকলার মিশ্রণে নূতন মুঘল চিত্রকলার উদ্ভব হয়। শিল্পী আব্দুল সামাদের নেতৃত্বে তিনি চিত্রকর ও চিত্রশিল্পের জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন।

নির্মাতা আকবর

সংস্কৃতির অন্যান্য দিক

আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি শুধু পাঞ্জাব লাভ করেন। নিজ বিচক্ষণতা, সমরকুশলতা, সাহস ও কূটবুদ্ধিবলে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সমর্থ হন। শাসনদক্ষতা, দূরদৃষ্টি ও সমদর্শী নীতিবলে তিনি সেই সাম্রাজ্যকে সংহতি দান করেন। আকবর শুধু মুঘল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি ইহার সুশাসনের জন্য বিস্তৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন। বাবর বা হুমায়ুন কেহই একাজ করিবার সময় পান নাই। হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্র গঠন ছিল আকবরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি অনেকাংশে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। উদারতা, মানবিকতা ও সমদর্শিতার জন্য তিনি সম্রাট অশোকের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য।[১] সম্রাট অশোকের মত তিনিও জাতির মনোরাজ্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন।

আকবরের কৃতিত্ব

সম্রাট জাহাঙ্গীর (Jahangir) ঃ ১৬০৫ খ্রীঃ সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সলিম 'জাহাঙ্গীর' উপাধি লইয়া সিংহাসনে বসেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার মত রাজকীয় গুণে ভূষিত ছিলেন না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিতে ভালবাসিতেন না। তিনি পিতার মত সাহসী যোদ্ধা, কূটনীতিজ্ঞ বা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে পারস্য সম্রাট শাহ্ আব্বাস কান্দাহার দখল করিয়া নেন। জাহাঙ্গীর তাহা পুনরুদ্ধার

সম্রাট জাহাঙ্গীর
১৬০৫ ১৬২৭

(১) এইচ. জি. ওয়েলস্ সম্রাট আকবরকে অশোকের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলার আফগান দলপতি ওসমান বিদ্রোহ করিলে মুঘল সুবাদার ইসলাম খান তাহা দমন করেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে এক উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য হইল মেবার বিজয়। মেবারের রাণা অমর-সিংহ ও পুত্র করণ-সিংহ মুঘলবাহিনীর নিকট নতি স্বীকার করেন। মেবার নতি স্বীকার করায় রাণাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। পাঞ্জাবের কাংড়া দুর্গটিও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অধিকার করা হয়। ১৬২২ খ্রীঃ শাহজাদা খুররমের নেতৃত্বে এক মুঘলবাহিনী আহম্মদনগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। এই সাফল্যের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর পুত্র খুররমকে 'শাহ্জাহান' বা জগতের অধিপতি উপাধি দেন।

জাহাঙ্গীরের সামরিক সাফল্য



জাহাঙ্গীর

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও রাজপুত্রদের বিদ্রোহ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। রাজত্বের শুরুতে জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু বিদ্রোহী হন। জাহাঙ্গীর এই বিদ্রোহ দমন করিয়া খসরুকে বন্দী করেন। জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসা বা নুরজাহান নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করিবার পর রাজপরিবারে দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়। নুরজাহান তাঁহার পূর্ব স্বামীর কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ দেন। ইহার পর সম্রাজ্ঞী শাহরিয়ারকে পরবর্তী সম্রাট মনোনীত করিবার জন্য স্বামীর উপর চাপ দিতে থাকেন। ইহাতে জাহাঙ্গীরের অপর পুত্র খুররম বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। অভিজ্ঞ সেনাপতি মহাব্বত খান এই বিদ্রোহ দমন করেন। তবে নুরজাহানের চক্রান্তে ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে অতিষ্ঠ হইয়া মহাব্বত খান নিজেই বিদ্রোহী হন। এই বিদ্রোহ দমন করিবার পূর্বেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, রাজপুত্রদের বিদ্রোহ ও নুরজাহানের প্রভাব বিস্তার



নুরজাহান

শাসক হিসাবে সম্রাট জাহাঙ্গীর ব্যর্থ হন নাই। পিতার প্রতিষ্ঠিত শাসন কাঠামো তিনি বজায় রাখিয়াছিলেন। প্রজাগণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তিনি নজর দিতেন। কৃষকদের উপর বাড়তি কর চাপানোর তিনি বিরোধিতা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। বিদেশী পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজগণ এই সময় সুরাট, মসুলিপট্টম, হুগলী ও চট্টগ্রামে বাণিজ্য করিত। ইংরেজ রাষ্ট্রদূত স্যার টমাস রো-র অনুরোধে সম্রাট ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দেন। আহমেদাবাদ, বুরহানপুর, আজমীর ও আগ্রায় ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। শাসক হিসাবে সম্রাটের এক বিশেষ কৃতিত্ব হইল দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ সম্রাট। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ করিতেন না। জনগণ যাহাতে ন্যায়বিচার পায় সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। বিচার ঘণ্টি (Bell of Justice) বাজাইয়া জনসাধারণ তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। সমসাময়িক সকল লেখক জাহাঙ্গীরের ন্যায়বিচার-পরায়ণতা ও সমদর্শিতার প্রশংসা করিয়াছেন।

শাসন ও বিচার

ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে সম্রাট তাঁহার পিতার প্রদর্শিত পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। সমস্ত ধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। বিদেশী পর্যবেক্ষক টেরি ও টমাস রো তাঁহার ধর্মীয় উদারতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত ধর্মের মানুষ তাঁহার নিকট ন্যায়বিচার পাইত। যোগ্যতা অনুযায়ী সকলকে রাজকার্যে নিয়োগ করা হইত। হিন্দুদের উপর তিনি বাড়তি কর আরোপ করেন নাই। ডঃ বেণীপ্রসাদ মন্তব্য করিয়াছেন যে সম্রাট জাহাঙ্গীর হিন্দুদের হোলি, দশেরা, দেওয়ালী ও রাখীবন্ধন উৎসবে অংশ গ্রহণ করিতেন।[১] খ্রীষ্টান পাদরিদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ ছিল।

ধর্মীয় নীতি

সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন মার্জিত রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি। তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি আরবী ও হিন্দীও জানিতেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত তাঁহার আত্মজীবনী 'তুজুক-ই জাহাঙ্গীরী' তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদ, প্রাণী-বিজ্ঞান ও শিল্পে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সম্রাট পণ্ডিত ও শিল্পীদের সমাদর করিতেন। তাঁহার সময়ে শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে উন্নতি ঘটিয়াছিল। সম্রাট নিজে একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন। মুঘল চিত্রকলা তাঁহার সময়ে উন্নতির শীর্ষে উঠিয়াছিল। স্থাপত্য শিল্পেরও সম্রাট অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি, আগ্রার নিকট নূরজাহানের পিতা ইতিমাদ্দোলার সমাধি, লাহোরের জামি মসজিদ জাহাঙ্গীরের আমলের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। সম্রাট সুষমামণ্ডিত উদ্যানেরও অনুরাগী ছিলেন। লাহোর ও কাশ্মীরের সুদৃশ্য মুঘল উদ্যানগুলি তাঁহার আমলে নির্মিত হয়।

শিল্প ও সংস্কৃতির সমাদর

মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ভারত ইতিহাসের এক জটিল চরিত্র। কোমলে-কঠোরে

(১) ডঃ বেণীপ্রসাদ, হিস্ট্রি অব জাহাঙ্গীর।

মিশ্রিত এই সম্রাটের অহিফেন ও সুরায় আসক্তি ছিল। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি অনেক নিষ্ঠুর কাজ করিতেন। তবে সাধারণভাবে তাঁহার চরিত্রে দয়া, মানবিকতা, বিনয় ও সরলতার অভাব ছিল না। শেষ জীবনে সুরার প্রভাবে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি শাসনব্যবস্থার উপর ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণ হারাইতে থাকেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করেন। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও বলা যায় সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটদের অন্যতম। শাসক হিসাবে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁহার আমলে দেশে শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়।[১]

চরিত্র ও কৃতিত্ব

শাহ্ জাহান (Shah Jahan) ঃ ১৬২৭ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া জাহাঙ্গীরের দুই পুত্র শাহজাদা খুর্‌রম ও শাহরিয়ারের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। শাহজাদা খুর্‌রম শ্বশুর আসফ খান ও সেনাপতি মহাব্বত খানের সহায়তায় শাহরিয়ারকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (১৬২৮)। বাদশাহ হইয়া তিনি উপাধি নেন 'শাহজাহান পাদশাহ্ গাজী'। সিংহাসন লাভের পর শাহজাহান বুন্দেলখণ্ডের শাসক জুঝর সিংহের বিদ্রোহ দমন করেন। দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাদার খানজাহান লোদী বিদ্রোহী হইলে শাহ্জাহান সেই বিদ্রোহও দমন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলায় পর্তুগীজরা লুণ্ঠন ও অত্যাচার করিত। এদেশীয়দের জোর করিয়া খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষা দিত। সম্রাট শাহ্জাহানের আদেশে সেনাপতি কাশিমখান হুগলী দখল করিয়া পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেন। পারস্য কান্দাহার অধিকার করিলে উত্তর-পশ্চিমে ভারত সীমান্ত বিপন্ন হয়। শাহ্জাহান পুত্র আরঙ্গজেব ও দারাশিকোর নেতৃত্বে তিনবার সামরিক অভিযান পাঠাইয়া কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হন। মধ্য-এশিয়ার উজবেগ রাজত্বে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া সম্রাট পিতৃপুরুষের আদিনিবাস বল্‌খ দখল করিবার চেষ্টা করেন। মুরাদ ও আরঙ্গজেব পরিচালিত এই অভিযানগুলিও ব্যর্থ হয়। তবে দাক্ষিণাত্যে মুঘল

শাহ্জাহান, ১৬২৮-১৬৫৮ ঃ বিদ্রোহ দমন ও সাম্রাজ্য বিস্তার



শাহজাহান

(১) 'Under his enlightened patronage there was an all-round progress in industry and commerce, while painting, literature and architecture also flourished during his reign.' R.C. Majumder ed. The Mughal Empire.

সৈন্যবাহিনী সাফল্যলাভ করে। দাক্ষিণাত্যে শাহ্‌জাহানের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সহিত ধর্মীয় গোঁড়ামি যুক্ত হয়। সুন্নী সম্রাট দাক্ষিণাত্যের তিনটি শিয়া রাজ্য আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। আহম্মদনগর দখল করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিজামশাহী রাজবংশের অবসান ঘটে। আহম্মদনগর জয়ের পর মুঘল সৈন্যবাহিনী গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী ও বিজাপুরের আদিলশাহী রাজ্য দুইটি আক্রমণ করে। এই রাজ্য দুইটি করদানে ও মুঘল সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকারে রাজী হয়। দাক্ষিণাত্যে সম্রাট শাহজাহানের সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি অনেকখানি সাফল্যলাভ করে।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফীখানের মতে আকবর বিজেতা ও আইন-প্রণেতা হিসাবে অনেক বড় ছিলেন। তবে সাম্রাজ্যের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শাহ্‌জাহান মুঘল সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সম্রাট শাহ্‌জাহান ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী শাসক। শাসনব্যবস্থার সর্বদিকে তাঁহার নজর ছিল। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও চরিত্রবান ব্যক্তিদের তিনি মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে দেশে কোন বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই। সারা দেশে শান্তি অব্যাহত ছিল। সম্রাটের দীর্ঘ রাজত্বকালে দেশে কোন বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে নাই। ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড লিখিয়াছেন

শাসন

সারা দেশে কৃষির অর্থনীতিতে কোন গোলযোগ দেখা দেয় নাই। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করিত। সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে সুরাট, কালিকট, মসুলিপট্টম, মাদ্রাজ, হুগলী ও চট্টগ্রাম ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়। সমকালীন পর্যটকদের মতে, শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। ঐতিহাসিক এলফিনস্টোনের মতে, শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল 'ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ যুগ ('the most prosperous ever known to India.')। সাম্রাজ্যবিস্তার, শাসন, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁহার রাজত্বকালে চরম উন্নতি দেখা গিয়াছিল। এইজন্য অনেক ঐতিহাসিক শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালকে মুঘল রাজবংশের 'সুবর্ণ যুগ' আখ্যা দিয়াছেন।

শাহ্‌জাহান ছিলেন কাব্য, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের অনুরাগী। তাঁহার দরবারে কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সমাদর পাইতেন। তাঁহার রাজত্বকালে ফার্সী, সংস্কৃত ও হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি হয়। সংস্কৃত কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁহার উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করেন। পণ্ডিত জগন্নাথ, কবি চিন্তামণি আচার্য সরস্বতী ও সুন্দরদাস ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। ফার্সী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হয়। শাহ্‌জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ছিলেন সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী ভাষায় অনুবাদ হয়। ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও জ্যোতিষ, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি

ঘটিতে দেখা যায়। সম্রাট নিজে ছিলেন সমস্ত রকম চারুশিল্পের অনুরাগী। তাঁহার রাজত্বকালে চিত্রকলার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। শাহ্‌জাহান সঙ্গীত ভালবাসিতেন। তানসেনের জামাতা সঙ্গীতজ্ঞ লালখান, সুখসেন, সুরসেন ও জগন্নাথ তাঁহার আনুকূল্য লাভ করেন। স্থাপত্য শিল্পে তাঁহার রাজত্বকাল অবশ্যই ভারত ইতিহাসের সুবর্ণযুগ। তিনি শুধু অনেক প্রাসাদ, মসজিদ, দুর্গ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা নয়। শিল্প-রীতি, কৌশল ও সৌকর্যে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। অপূর্ব শিল্প-সুষমামণ্ডিত বহু প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ তাঁহার আমলে নির্মিত হয়। দিল্লীর লালকেল্লা ও জামি মসজিদ, আগ্রার মোতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস ও বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল মুঘল স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এগুলি ছাড়া শাহ্‌জাহান লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর ও আজমীরে আরও অনেক প্রাসাদ, মসজিদ ও সৌধ নির্মাণ করেন। শ্বেতপাথরে নির্মিত তাজমহল পৃথিবীর সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। মণিমুক্তাখচিত ময়ূর সিংহাসনও তাঁহার আমলে নির্মিত হয়। সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অসাধারণ উন্নতির যুগ তাহাতে সন্দেহ নাই।[১]

সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক উন্নতি

সম্রাট শাহ্‌জাহানের কৃতিত্ব বিচারে শুধু তাঁহার প্রশাসনিক সাফল্য ও শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতির উপর জোর দিলে চলিবে না। তাঁহার ত্রুটি ও ব্যর্থতাও মনে রাখিতে হইবে। বাহিরের জাঁকজমক ও আড়ম্বরের অন্তরালে তাঁহার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা লক্ষ্য করা যায়। শাহ্‌জাহানের আমলে মুঘল সৈন্যবাহিনী বারবার অভিযান চালাইয়াও কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হয়। মধ্য এশিয়ার বল্‌খ জয়ের চেষ্টাও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। তাঁহার জীবিতকালে পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। জীবনের শেষ আট বৎসর তাঁহাকে বন্দীদশায় কাটাইতে হয়। তাঁহার সময়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ বপন করে। দাক্ষিণাত্যে শিয়া রাষ্ট্রগুলিকে দুর্বল করিয়া তিনি মারাঠাদের উত্থানের পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। শাহ্‌জাহান পিতা বা পিতামহের মত ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সমদর্শিতা বা উদারতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটিলেও কৃষক ও শ্রমিকদের উপর নূতন কর স্থাপিত হয়। সংগৃহীত সম্পদ জনগণের সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতিতে ব্যয় করা হয় নাই। সম্রাটের বিলাস-ব্যসন, দরবারের জাঁকজমক ও অভিজাতদের বিলাসিতায় তাহা ব্যয় হয়। তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পর্যটক পিটার মাণ্ডির মতে, সরকার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষকে সাহায্যের চেষ্টা করে নাই। যেটুকু সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল তাহা অবশ্যই প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই কম। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে, শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে রাজসভার ঐশ্বর্য, আড়ম্বর ও জাঁকজমক আমাদের বিভ্রান্ত করে। প্রকৃতপক্ষে এই যুগে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়।

শাহ্‌জাহানের কৃতিত্ব বিচার

(১) B.P. Saksena, History of Shah Jahan of Delhi.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্রাট আরঙ্গজেব (Aurangzeb) ১৬৫৮-১৭০৭

১৬৫৭ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট শাহ্‌জাহান অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ছিলেন সম্রাটের মনোনীত উত্তরাধিকারী। দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন বাংলার সুবাদার, তৃতীয় পুত্র আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের এবং কনিষ্ঠ মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা। জ্যেষ্ঠ দারাশিকো ছিলেন উদার, পণ্ডিত ও পরধর্মসহিষ্ণু এবং পিতার প্রিয়পাত্র। তবে তিনি রণনিপুণ সেনাপতি বা সুযোগ্য শাসক ছিলেন না। দ্বিতীয় সুজা বুদ্ধিমান ও সাহসী যোদ্ধা হইলেও আরামপ্রিয় ও অলস ছিলেন। কনিষ্ঠ মুরাদ ছিলেন সরল, উদার ও সাহসী। তবে মদ্যপানে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। সম্রাট শাহ্‌জাহানের চার পুত্রের মধ্যে আরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে যোগ্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন রণকুশল সেনাপতি, কূটনীতিজ্ঞ ও সুদক্ষ শাসক। শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া মুরাদ গুজরাটে এবং সুজা বাংলাদেশে নিজেদের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য হইতে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইয়া মালবে মুরাদের সহিত মিলিত হন। আরঙ্গজেব দারার বিরুদ্ধে যৌথভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য মুরাদকে নিজদলে টানিতে সক্ষম হন। ঠিক হয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের অবসানে মুরাদ আফগানিস্তান, সিন্দু, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর লাভ করিবেন; আরঙ্গজেব পাইবেন সাম্রাজ্যের বাকী অংশ। আরঙ্গজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মাতে সম্রাটের অনুগত বাহিনীর সম্মুখীন হয়। মুঘল সৈন্যবাহিনীর নেতা যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খানের মধ্যে বিরোধের সুযোগ লইয়া আরঙ্গজেব ও মুরাদ ধর্মাতের যুদ্ধে জয়ী হন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আরঙ্গজেবের ক্ষমতা ও সুনাম বৃদ্ধি পায়।

উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ ১৬৫৭-৫৮



আরঙ্গজেব

ধর্মাতের যুদ্ধের (১৬৫৮) পর আরঙ্গজেব আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। দারা আরঙ্গজেবকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলে আগ্রার নিকট সামুগড়ে (১৬৫৮) উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও ভাগ্য আরঙ্গজেবের উপর সুপ্রসন্ন হয়। দারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। আরঙ্গজেব আগ্রা দখল করিয়া সম্রাট শাহ্‌জাহানকে বন্দী করেন। আগ্রা দখল করিবার পর আরঙ্গজেব কৌশলে মুরাদকেও বন্দী করেন। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের নিষ্পত্তি হইয়া যায়। আরঙ্গজেব দিল্লী অধিকার করিয়া নিজেকে সম্রাট বলিয়া

আরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভ, ১৬৫৮

ঘোষণা করেন (জুলাই, ১৬৫৮)। পরের বৎসর জানুয়ারী মাসে আরঙ্গজেব এলাহাবাদের কাছে খাজওয়ার যুদ্ধে সুজাকে পরাস্ত করেন। সুজা আরাকানে পলাইয়া যান। সম্ভবতঃ সেখানে আরাকানরাজের হস্তে তিনি সপরিবারে নিহত হন। আজমীরের নিকট দেওয়াইয়ের যুদ্ধে (১৬৫৯) দ্বিতীয়বার পরাজিত হইবার পর দারাও পলাইয়া যান। পরে পুত্র সুলেমানসহ ধৃত এবং আরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হন। বন্দী মুরাদকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আরঙ্গজেব নিষ্কণ্ট হন। তিনি 'আলমগীর পাদশাহ্ গাজী' উপাধি লইয়া সিংহাসনে বসেন।

উত্তর-পূর্বে সাম্রাজ্য বিস্তার ও উত্তর পশ্চিমে শান্তি-স্থাপন

সম্রাট আরঙ্গজেব তাঁহার পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাম্রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। বিহারের মুঘল সুবাদার দাউদ খান ১৬৬১ খ্রীঃ পালামৌ অধিকার করেন। ঐ বৎসর বাংলার সুবাদার মীরজুম্‌লা আসাম ও কোচবিহার আক্রমণ করিয়া উত্তর-পূর্বে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করেন। মীরজুম্‌লার মৃত্যুর পর বাংলার পরবর্তী সুবাদার শায়েস্তা খান পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করেন। আরাকানের রাজাকে পরাস্ত করিয়া তিনি চট্টগ্রাম মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতি ইউসুফজাই ও আফ্রিদীরা বিদ্রোহ করে। ইহার ফলে পাঞ্জাব ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুঘলশাসন বিপন্ন হয়। আরঙ্গজেব সৈন্যবাহিনী ও কূটনীতির সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন।

আরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধের সময় তিনি সুন্নী মুসলমান ও রক্ষণশীল উলেমাদের সমর্থন লাভ করেন। এই গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলমানগণ দারাশিকোর উদার ও ধর্মসমন্বয়ের চিন্তাকে পছন্দ করিতেন না। ইঁহারা মনে করিতেন ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হইল ইসলাম। সুতরাং ইসলামধর্মের রক্ষা ও প্রসার মুঘল বাদ্‌শাহের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য। মৌলনা আহমদ সরহিন্দী এইরূপ আদর্শ প্রচার করিতেন। সম্রাট আরঙ্গজেব নিজে বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী পবিত্র ও সরল জীবনযাপন করিতেন। তিনি উলেমাদের ন্যায় মনে করিতেন ইসলাম ও রাষ্ট্রের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। ভারতবর্ষকে দার উল ইসলাম ও ইসলামের আবাসস্থলে পরিণত করা তাঁহার রাজনৈতিক কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। ইহা ছিল পূর্ববর্তী মুঘল শাসকগণের ধর্মীয় নীতিবিরোধী। নূতন আদর্শ অনুসরণ করিয়া আরঙ্গজেব একে একে রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন শুরু করেন। হিন্দু-সংস্কৃতি ও ধর্মের সহিত যুক্ত সমস্ত প্রথা তিনি রহিত করেন। নওরোজ, ঝরোকাদর্শন দেওয়ালী, হোলী, তুলাদান প্রভৃতি প্রথা বন্ধ হয়।[১] সম্রাটের দরবার হইতে সঙ্গীত,, সঙ্গীতকার ও জ্যোতিষীদের বিদায় দেওয়া হয়। হিন্দুদের উপর তিনি জিজিয়া, তীর্থকর ও বৈষম্যমূলক বাণিজ্য শুল্ক স্থাপন করেন। নূতন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ হয়। অনেকের মতে, আরঙ্গজেব কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির, মথুরার

আরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি

(১) ঝরোকাদর্শন - সম্রাটের দর্শনদান। তুলাদান—স্বর্ণ ও রৌপ্যে সম্রাটের দেহ ওজন।

কেশবদেবের মন্দির, গুজরাটের সোমনাথ মন্দির এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। রাজপুত ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর হিন্দুর ঘোড়া ও পাল্কী চড়া নিষিদ্ধ হয়। আরঙ্গজেব পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের উদার নিয়োগ-নীতিরও পরিবর্তন করেন। রাজস্ব, সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনে হিন্দুদের নিয়োগ করিবার নীতি তিনি রহিত করেন। তিনি দেশের মুসলমান জনগণের নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতির দিকে নজর দেন। তাহারা যাহাতে ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলে সেইজন্য মুহতাসিব' নামক রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হয়। 'ফুতুহাত-ই-আলমগিরী' নামক গ্রন্থে মুসলমানদের পালনীয় ইসলামী আইনগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। সম্রাট আরঙ্গজেব হিন্দু মুসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন। তিনি ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন।

আরঙ্গজেবের একদেশদর্শী রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী, শিখ ও মারাঠারা বিদ্রোহ করে। মথুরার জাঠরা বাক্‌লা, রাজারাম ও চুড়ামণের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়। আরঙ্গজেব এই বিদ্রোহ দমন করিলেও জাঠশক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে পারেন নাই। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাহারা আবার বিদ্রোহী হয়। বুন্দেলা নেতা চম্পতরায় ও ছত্রশাল মালবের বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহ দমিত হইলেও বুন্দেলারা আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। পাঞ্জাবের পাতিয়ালা অঞ্চলের সৎনামী সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইলে আরঙ্গজেব তাহাদের দমন করেন। পাঞ্জাবের শিখগণ গুরুদের নেতৃত্বে আগেই সংগঠিত হইয়াছিল। শিখগুরু তেগবাহাদুর আরঙ্গজেবের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। সম্রাট তাঁহাকে মৃত্যু ও ইসলামের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে বলেন। গুরু তেগবাহাদুর 'শির' দিলেন কিন্তু 'সর' বা ধর্ম দিলেন না। বলাবাহুল্য, এই ঘটনার পর সমগ্র শিখজাতি আরঙ্গজেবের শত্রুতে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলির দুর্বলতা ও আরঙ্গজেবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যুদ্ধের সুযোগ লইয়া শিবাজী মহারাষ্ট্রে জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন করেন। আরঙ্গজেব আফগান যুদ্ধের অবসানে সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খানকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠান। মুঘল সৈন্যবাহিনী শিবাজীর অনেকগুলি দুর্গ দখল করিলেও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। ১৬৬৫ খ্রীঃ আরঙ্গজেব ও শিবাজীর মধ্যে সম্পাদিত পুরন্দরের চুক্তিতে মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। তবে এই শান্তি স্থায়ী হয় নাই। শিবাজী রাজধানীতে আসিলে আরঙ্গজেব তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করেন। তাঁহাকে বন্দী করা হয়। শিবাজী কৌশলে বন্দীদশা হইতে মুক্ত হন। তিনি মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া নূতন উদ্যমে রাজ্যবিস্তারে মন দেন এবং নিজেকে 'ছত্রপতি' বা স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৬৮০ খ্রীঃ শিবাজীর মৃত্যু পর্যন্ত আরঙ্গজেব তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই।

জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী, শিখ ও মারাঠা বিদ্রোহ

মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংগঠনে রাজপুতদের অবদান কম নয়। আকবর সাহসী যোদ্ধা রাজপুত জাতির সাহায্যের তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া তাহাদের প্রতি

মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করেন। রাজপুত পরিবারে নিজে বিবাহ করেন এবং পুত্রের বিবাহ দেন। রাজপুত রাজাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করিয়া তিনি তাহাদের হৃদয় জয় করেন। সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে তাহাদের নিয়োগ করা হয়। আরঙ্গজেব এই নীতির পরিবর্তন ঘটান। তিনি রাজপুত রাজাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন। প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদে রাজপুতদের নিয়োগের নীতি পরিত্যক্ত হয়। আরঙ্গজেবের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এবং অনুদার ধর্মীয় নীতি রাজপুতদের বিরক্তি উৎপাদন করে। এইরূপ অবস্থায় আরঙ্গজেব কৌশলে মাড়ওয়ার রাজ্যটি গ্রাস করিবার পরিকল্পনা করিলে রাজপুতদের সহিত মুঘলদের সংঘর্ষ শুরু হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কর্মরত অবস্থায় মাড়ওয়াররাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে আরঙ্গজেব তাঁহার বিধবা ও শিশুপুত্রকে বন্দী করেন। মাড়ওয়ার রাজ্যটিকে মুঘল শাসনভুক্ত করা হয়। এই মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাজপুতবীর দুর্গাদাস রাঠোর রুখিয়া দাঁড়ান। অসীম সাহসিকতায় তিনি রাজা যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্নী ও শিশুপুত্র অজিত সিংহকে মুক্ত করেন। মেবারের রাণা রাজসিংহ মাড়ওয়ারের পক্ষ গ্রহণ করেন। আরঙ্গজেবকে সম্মিলিত মাড়ওয়ার-মেবার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয়। ১৬৮১ খ্রীঃ আরঙ্গজেব মেবারের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলেন। জিজিয়া করের পরিবর্তে মেবার তাঁহাকে কয়েকটি জেলা ছাড়িয়া দেয়। তবে রাঠোর বীর দুর্গাদাস ও রাজা অজিত সিংহ মাড়ওয়ারের স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইয়া যান। আরঙ্গজেব তাঁহাদের পরাস্ত করিতে পারেন নাই। পুত্র আকবর বিদ্রোহী হইয়া মারাঠা রাজ্যে আশ্রয় লইলে আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হন।

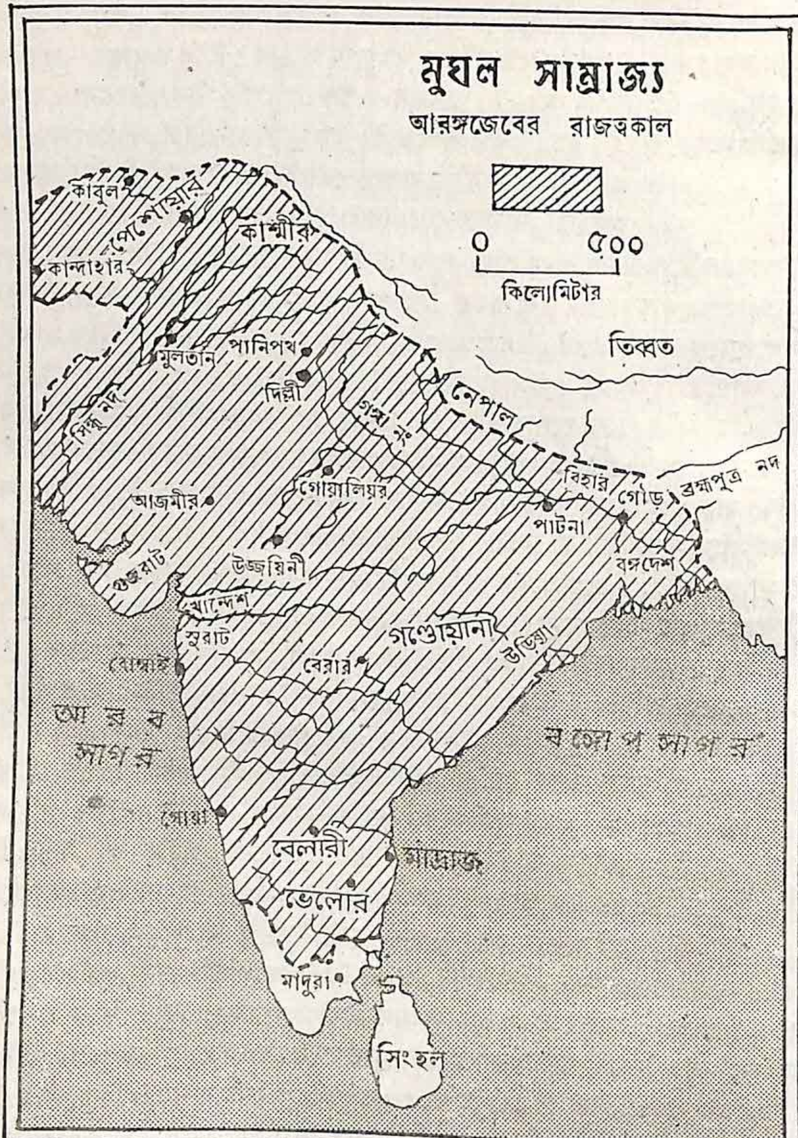
রাজপুত-নীতি

আরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতির উদ্দেশ্য ছিল তিনটি ঃ (১) দাক্ষিণাত্যের শিয়া রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার, (২) মারাঠাদের বিদ্রোহ দমন এবং (৩) বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে বন্দী করা। এই তিন উদ্দেশ্য লইয়া এবং রাজপুত যুদ্ধ অসমাপ্ত রাখিয়া ১৬৮২ খ্রীঃ আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে আসেন। জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসর (১৬৮২-১৭০৭) সম্রাট এখানেই কাটান এবং এখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গোড়া সুন্নী আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের শিয়ারাষ্ট্র দুইটি দখল করিবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁহার ধর্মান্ধ রাজনীতি এজন্য অনেকখানী দায়ী। ১৬৮৬ খ্রীঃ বিজাপুরের শেষ আদিলশাহী সুলতান সিকান্দর আরঙ্গজেবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। বিজাপুরকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। পরের বৎসর গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশের পতন ঘটে। গোলকুণ্ডাও মুঘল শাসনাধীনে স্থাপিত হয়। তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপলীর হিন্দু রাজারা আরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহারা কর দিতে স্বীকৃত হন। ১৬৯০ খ্রীঃ নাগাদ কাবেরী নদীর দক্ষিণে সামান্য কিছু অঞ্চল ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষ আরঙ্গজেবের অধিকারে আসে। কাবুল হইতে চট্টগ্রাম ও কাশ্মীর হইতে কাবেরী পর্যন্ত আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। তাঁহার আগে আর কোন ভারতীয় শাসক এতবড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই।

আরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি

আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল করিবার পর আরঙ্গজেব মারাঠাদের দমন করিতে উদ্যোগী হন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিয়া তিনি আংশিক



সাফল্যলাভ করেন। ১৬৮৯ খ্রীঃ শম্ভুজী ধৃত ও আরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হন। মুঘল সৈন্যবাহিনী মারাঠাদের রাজধানী রায়গড় দখল করিয়া লয়। শম্ভুজীর পরিবার ও তাঁহার শিশুপুত্র সাহু আরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হন। বিদ্রোহী-পুত্র আকবর

মারাঠাদের আস্থা ও সমর্থন হারাইয়া পারস্যে পলাইয়া যান। আপাতদৃষ্টিতে ১৬৯০ খ্রীঃ আরঙ্গজেব সাফল্যের শীর্ষে উঠিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময় হইতে তাঁহার পতনের সূচনা হয়।[১] আরঙ্গজেব মারাঠাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করিতে পারেন নাই। শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম ও পুত্রবধূ তারাবাঈয়ের নেতৃত্বে মারাঠারা মুঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইয়া যায়। আরঙ্গজেবের মারাঠা-নীতি ব্যর্থ হয়। স্পেনের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা 'স্পেনীয় ক্ষত' (Spanish ulcer) নেপোলিয়নের পতনের কারণ হয়। সেইরূপ 'দাক্ষিণাত্য ক্ষত' আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। এলফিনস্টোন ও ভিনসেণ্ট স্মিথ মনে করেন দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্য দুইটি ধ্বংস করিয়া আরঙ্গজেব মহা ভুল করেন। ইহাতে মারাঠাদের পক্ষে শক্তিশালী হইবার পথে আর কোন বাধা রহিল না। স্যার যদুনাথ সরকার এ মত সমর্থন করেন নাই। তাঁহার মতে, দুর্বল সুলতানী রাজ্যগুলির পক্ষে মারাঠাদের বাধাদান সম্ভব হইত না। তাছাড়া মুঘল ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত তিক্ত। তাহাদের পক্ষে একযোগে মারাঠাদের বাধাদান ছিল একেবারে অসম্ভব কার্য।

আরঙ্গজেব ও মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ

আরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি তাঁহার সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয়, প্রাশাসনিক অব্যবস্থা ও বিশৃংখলার জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ চালাইবার ফলে রাজকোষে শূন্যতা দেখা দেয়। সম্রাটের অনুপস্থিতির দরুন উত্তর ভারতের প্রশাসনে বিশৃংখলা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। উত্তর ভারতে সম্রাটের অনুপস্থিতি ও দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের জন্য সম্রাটের আয় কমিয়া যায়। বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান শুধু সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত পাঠাইতেন। ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার ফলে সৈন্যবাহিনীর মনোবল ও শৃংখলা ভাঙ্গিয়া পড়ে। আরঙ্গজেব নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর বেতন দিতে পারিতেন না বলিয়া তাহারা বিদ্রোহ করে। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল মধ্যে বাংলা অযোধ্যা ও দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফল

সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘলশাসনের চরিত্রগত কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই। সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। আরঙ্গজেব সমগ্র সাম্রাজ্যকে মোট একুশটি সুবায় ভাগ করেন। তিনি নিজে সুবাদার ও দেওয়ানদের নিযুক্ত করিতেন। সুবাদার ও দেওয়ানগণ তাহাদের কাজকর্মের জন্য সম্রাটের নিকট সরাসরি দায়ী থাকিত। মুঘলদের শাসন ছিল কেন্দ্রীভূত স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা। তবে সম্রাটের অধীনস্থ পদস্থ কর্মচারীরা কিছু কিছু কাজকর্মের স্বাধীনতা ভোগ করিত। আরঙ্গজেব এই ব্যবস্থা রদ করিয়া সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলিয়া লন। তাঁহার আমলে কেন্দ্রীভূত শাসন হয় অতিকেন্দ্রীভূত। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। সন্দেহ নাই আরঙ্গজেবের এই ব্যবস্থার ফলে

প্রশাসনিক ও সামরিক সংগঠন

(১) J. N. Sarkar, History of Aurangzeb, Vol—V.

প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাস পায়। আরঙ্গজেব ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন সন্দিগ্ধমনা ও অবিশ্বাসী। কাহাকেও সহজে বিশ্বাস করিতেন না। শাসনব্যবস্থায় নিজের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তিনি কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেন। একজন লোকের পক্ষে যে এতবড় বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয় আরঙ্গজেব তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মুঘল সৈন্যবাহিনীতেও আরঙ্গজেব কিছু কিছু পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। মুঘল সৈন্যবাহিনীতে সবচেয়ে দুর্বল শাখা ছিল গোলন্দাজ বাহিনী। আরঙ্গজেব প্রচুর পরিমাণে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ-কামান সজ্জিত নূতন গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। এই গোলন্দাজ বাহিনী ছিল সম্রাটের অধীনস্থ এবং নিয়মিত বেতনভোগী। মুঘল সৈন্যবাহিনীর প্রশাসন, নিয়োগ ও শিক্ষণে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে নাই। আরঙ্গজেব শুধু সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সম্রাট আরঙ্গজেব ছিলেন একজন আদর্শ সুন্নী মুসলমান। ধর্মভীরু এই সম্রাট পবিত্র, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন। ভোগবিলাস, পানাসক্তি বা ইন্দ্রিয়পরায়ণতার কোন কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। টুপি প্রস্তুত বা কোরাণ নকল করিয়া তিনি নিজে যা উপার্জন করিতেন তাহা তাঁহার অন্ত্যেষ্টির জন্য রাখিয়া যান। তাঁহার পবিত্র ধর্মীয় জীবন ও ইসলামের গৌরব বৃদ্ধিতে অক্লান্ত সাধনার জন্য সমকালীন মুসলমানদের নিকট তিনি ছিলেন 'জিন্দাপীর' (living saint)। আরঙ্গজেব ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা, সমরকুশল সেনাপতি ও দক্ষ শাসক। তিনি ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী ও ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ্। সাহস, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, তীক্ষ্ম বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন মুঘল যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। শুধু মুঘল বংশের নয়, তিনি ছিলেন ঐ যুগের এশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ শাসক। স্যার যদুনাথ সরকার আরঙ্গজেবের চারিত্রিক গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।[১] বহু গুণ-সমন্বিত এই মুঘল সম্রাট ভারতীয় রাজনীতিতে সাফল্যের মূল সূত্রটি অনুধাবন করিতে পারেন নাই। এই সূত্রটি হইল উদারতা, সহিষ্ণুতা, ঐক্য ও সমন্বয়। তাঁহার একদেশদর্শিতা, ধর্মীয় অহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামি তাঁহার রাজনৈতিক ব্যর্থতার জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল একথা স্বীকার করিতে হইবে।

আরঙ্গজেবের চরিত্র

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে আরঙ্গজেবের দায়িত্ব :

সম্রাট আরঙ্গজেবের শাসনের পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর। বিশাল ব্যর্থতায় (colassal failure) তাঁহার শাসনকাল শেষ হয়।[২] সম্রাটের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আরঙ্গজেবকে সম্পূর্ণ-

(১) 'This king was one of the greatest rulers of Asia in intelligence, character and enterprise. He was, in an extra-ordinary degree, hard working, active, moral and inspired by the sense of duty.' J. N. Sarkar, History of Aurangzeb, Vol V.

(২) Ibid.

ভাবে দায়ী করা ঠিক নয়। আরঙ্গজেবের ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতি ছাড়া আরও অনেক কারণে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। তবে আরঙ্গজেবের পঞ্চাশ বৎসরের ব্যর্থ শাসন যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথকে প্রশস্ত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আরঙ্গজেবের সময়কালেই সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়। উত্তর ভারতে তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে অভিজাতশ্রেণী অত্যন্ত ক্ষমতালোলুপ ও স্বার্থান্বেষী হইয়া উঠে। ইহাদের উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হইয়া যায়। অভিজাতদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের হানাহানিতে রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রাদেশিক শাসকগণ একে একে স্বাধীন হইয়া যান। আরঙ্গজেবের শাসন-নীতি এই ট্র্যাজেডির জন্য অনেকখানি দায়ী। স্যার যদুনাথ সরকার আরঙ্গজেবের জীবন ও সাধনাকে ট্র্যাজেডি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় মূল সুরটি হইল সংহতি ও সমন্বয়ের। প্রাচীনকাল হইতে আরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত দেখা যায়, যে ভারতীয় রাজা বা সম্রাট সমন্বয় ও ঐক্যের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সফল হইয়াছেন। জনগণের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা পাইয়াছেন। আরঙ্গজেব তাঁহার স্বধর্ম ও স্বধর্মীদের স্বার্থে রাষ্ট্র ও শাসন পরিচালনার নীতি গ্রহণ করেন। ফলে দেশের বৃহত্তর অংশের শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও সমর্থন তিনি পান নাই। বরং বৃহত্তর অংশ তাঁহার শাসনের বিরোধিতা করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে একাংশ মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। উদাহরণস্বরূপ পাঞ্জাবের শিখদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজপুত ও মারাঠারাও আরঙ্গজেবের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। মারাঠা রাজা শিবাজী সম্রাট আরঙ্গজেবকে লিখিত একখানি পত্রে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। জাঠ, সৎনামী ও বুন্দেলা বিদ্রোহও কম শক্তিশালী ছিল না। এতগুলি বিদ্রোহ দমন করিতে মুঘল সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া যায়। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে আরঙ্গজেবের দায়িত্ব নেহাত কম নয়।

শিবাজী (Shivaji) ১৬২৭—১৬৮০

সপ্তদশ শতকে শিবাজীর নেতৃত্বে স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ভারত ইতিহাসের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ শিবাজীর উত্থানের পটভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। পর্বত ও নদ-নদী বেষ্টিত মহারাষ্ট্র প্রাকৃতিক দিক হইতে সুরক্ষিত। অনুর্বর পার্বত্যময় মহারাষ্ট্রের মানুষ পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, সরল ও আত্মবিশ্বাসী। মারাঠী ধর্মগুরু ও সন্ন্যাসী একনাথ, তুকারাম, রামদাস ও বামনপণ্ডিত দেশে ভক্তি ধর্মের প্রচার করেন। একেশ্বরবাদ, ঈশ্বরভক্তি, সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়া তাঁহারা মহারাষ্ট্রে জাতিভেদের কুফল ও সামাজিক অসাম্য অনেকখানি দূর করিতে সক্ষম হন। ধর্মগুরু ও সমাজ-সংস্কারকদের প্রচারের ফলে মহারাষ্ট্রে এক নবজাগরণের সূত্রপাত

পটভূমি

হয়। শিবাজীর গুরু রামদাস ও তাঁহার শিষ্যরা সামাজিক সংস্কার ও নবজাগরণের আদর্শ প্রচার করিয়া এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করিয়া তোলেন। মারাঠী ভাষা ও সাহিত্য এই অঞ্চলের মানুষের মনে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। মারাঠী সাধু ও সন্ন্যাসীদের ধর্মসঙ্গীতগুলি মারাঠী ভাষার উন্নতিতে যেমন সহায়তা করে তেমনি দেশে জাতীয়তাবোধও জাগ্রত হয়। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, শিবাজীর আবির্ভাবের পূর্বে মহারাষ্ট্রে জীবন, ধর্ম ও ভাষার ক্ষেত্রে এক ভাবগত ঐক্য সৃষ্টি হয়। শিবাজী রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি করিয়া এই ঐক্য আন্দোলনকে পূর্ণতা দান করেন।

মহারাষ্ট্রে জুন্নারের নিকট শিবনের দুর্গে ১৬২৭ খ্রীঃ (মতান্তরে ১৬৩০ খ্রীঃ) শিবাজীর জন্ম হয়। শিবাজীর পিতার নাম শাহজী, মাতার নাম জিজাবাঈ। বিজাপুর সুলতানের কর্মচারী পিতা শাহজী অন্যত্র বাস করিতেন। পুত্র শিবাজী তাঁহার মাতা জিজাবাঈ ও অভিভাবক ব্রাহ্মণ দাদাজী কোণ্ডদেবের অধীনে বড় হন। মাতা ও দাদাজী শিবাজীর মনে সততা, ন্যায় নিষ্ঠা, বীরত্ব ও দেশপ্রেমের সঞ্চার করেন। দাদাজী তাঁহাকে অস্ত্রশিক্ষা দেন ও সাহসী যোদ্ধায় পরিণত করেন। শিশু বয়সে তিনি বিদেশীর কবল হইতে স্বদেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখিতেন। তিনি পার্বত্য উপজাতি মাওলীদের সামরিক শিক্ষা দিয়া দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত করেন। উচ্চাভিলাষী তরুণ শিবাজীর সামনে দুইটি পথ খোলা ছিল। মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া জায়গীরদার হিসাবে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন অথবা মুঘলের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া মহারাষ্ট্রে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। শিবাজী বিপদসংকুল দ্বিতীয় পথটি বাছিয়া লন।

জন্ম ও শৈশব



শিবাজী

দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্যগুলির দুর্বলতা এবং মুঘল সৈন্যের উত্তর ভারতে সামরিক কার্যে নিযুক্তির সুযোগে শিবাজী তাঁহার রাজ্য স্থাপনের কার্য শুরু করেন। ১৬৪৭ খ্রীঃ তিনি তোর্ণা দুর্গটি অধিকার করিয়া লন। ইহার পর শিবাজী স্থানীয় জায়গীরদার ও বিজাপুরী অফিসারদের দুর্গগুলি একে একে অধিকার করিতে থাকেন। নিজেও কয়েকটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন। শিবাজীর কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন হইয়া বিজাপুর সরকার তাঁহার পিতাকে বন্দী করায় শিবাজী ১৬৪৯—১৬৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত সমস্ত রকম আক্রমণাত্মক কাজকর্ম হইতে বিরত থাকেন। এই অবসরে তিনি অধিকৃত অঞ্চলগুলির সংগঠনে মন দেন। ১৬৫৬ খ্রীঃ মারাঠা রাজা চন্দ্ররাওকে নিহত করিয়া তিনি ক্ষুদ্র জাবলী রাজ্যটি অধিকার করেন। ১৬৫৭ খ্রীঃ তিনি মুঘলদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মুঘল সুবাদার

মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

আরঙ্গজেব এই সময়ে বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। এই সুযোগে শিবাজী আহম্মদনগর ও জুন্নার লুণ্ঠন করেন। আরঙ্গজেব কর্তৃক প্রেরিত মুঘলবাহিনীর নিকট তিনি পরাস্ত হন। মুঘল ও বিজাপুরের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে শিবাজীও মুঘলদের সহিত বিরোধ মিটাইয়া লন। সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হইলে শিবাজী উত্তর কঙ্কনের দিকে দৃষ্টি দেন। একে একে কল্যাণ, ভিবান্দী ও মাহুলী অধিকার করিয়া তিনি দক্ষিণে মাহাদ পর্যন্ত অগ্রসর হন।

শিবাজী বিজাপুর ও শিবাজী-মুঘল সংঘর্ষ, ১৬৫৯ ১৬৬৫

শিবাজীর কার্যকলাপে ভীত হইয়া বিজাপুর সুলতান ১৬৫৯ খ্রীঃ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য অভিজ্ঞ সেনাপতি আফজল খানের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পাঠান। শিবাজীকে পরাস্ত করিতে ব্যর্থ হইয়া আফজল খান তাঁহাকে ধ্বংস করিবার চক্রান্ত করেন। সন্ধির জন্য আলাপ-আলোচনার জন্য ডাকিয়া সেনাপতি আফজল খান শিবাজীকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। শিবাজী আফজল খানের মনোভাব আগেই টের পাইয়াছিলেন। অতর্কিত আক্রমণে তিনি আফজল খানকে 'বাঘনখ' দ্বারা হত্যা করেন। বিজাপুর সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। সম্রাট আরঙ্গজেব তাঁহার মাতুল অভিজ্ঞ সেনাপতি ও দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শায়েস্তা খানকে শিবাজীকে দমন করিবার জন্য মহারাষ্ট্রে পাঠান। সেই সময় শিবাজী বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি বিজাপুরের সহিত বিরোধ মিটাইয়া ফেলেন। পুনাতে শায়েস্তা খানের শিবির অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া (১৬৬৩) শিবাজী তাঁহার পুত্র ফত খানকে হত্যা করেন। মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খান তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলীটি হারাইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া যান। ১৬৬৪ খ্রীঃ শিবাজী মুঘল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ বন্দর সুরাট লুণ্ঠন করিয়া প্রায় এককোটি টাকা লাভ করেন।

সম্রাট আরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খানকে দাক্ষিণাত্যে পাঠান। জয়সিংহ কৌশলে শিবাজীকে ঘিরিয়া ফেলেন। মুঘল-বাহিনীকে বাধা দেওয়া নিরর্থক জানিয়া শিবাজী ১৬৬৫ খ্রীঃ মুঘলদের সহিত পুরন্দরের সন্ধি করেন। বারটি দুর্গ নিজের জন্য রাখিয়া শিবাজী বাকী তেইশটি দুর্গ মুঘলদের হাতে ছাড়িয়া দেন। পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া মুঘলবাহিনীকে দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দেন। সেনাপতি জয়সিংহের আশ্বাসে শিবাজী আরঙ্গজেবের সহিত আগ্রায় দেখা করিতে আসেন। সম্ভবতঃ মুঘল সম্রাটের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের সহিত পরিচিত হইবার জন্য শিবাজী রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। সম্রাট আরঙ্গজেব শিবাজীর প্রতি দুর্ব্যবহার করায় তিনি ক্ষুণ্ণ হন। তাঁহাকে মাত্র পাঁচ হাজারী মনসবদারের সম্মান দেওয়া হয়। শিবাজী প্রতিবাদ করিলে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। শিবাজী অসুখের ভান করিয়া কৌশলে মুঘল রক্ষীদের দৃষ্টি এড়াইয়া পুত্র শম্ভুজীসহ পলাইয়া যান। মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া শিবাজী পরবর্তী তিন বৎসর নিজের শাসনব্যবস্থার উন্নতিতে মন দেন। মুঘলদের সহিত সংঘর্ষ এড়াইয়া চলেন। আরঙ্গজেব তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি ও

মুঘল-শিবাজী লড়াই ও শিবাজীর সাফল্য

বেরারের জায়গীর দেন। ১৬৭০ খ্রীঃ শিবাজী মুঘলদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার সমস্ত হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। ঐ বৎসর তিনি সুরাট বন্দর দ্বিতীয়বার লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন। সুরাট লুণ্ঠনের পর শিবাজী মুঘল প্রদেশগুলি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে থাকেন। আরঙ্গজেব এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতি যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘল সেনাপতিরা সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ১৬৭৪ খ্রীঃ রাজধানী রায়গড়ে শিবাজী নিজের অভিষেক সম্পন্ন করেন। তাঁহার উপাধি হয় 'ছত্রপতি'। তিনি 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রজাপালক' উপাধিও গ্রহণ করেন। গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া ১৬৭৭ খ্রীঃ শিবাজী জিঞ্জি, ভোলোর ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি দখল করেন। উত্তরে সুরাট হইতে দক্ষিণে কারওয়ার পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। ১৬৮০ খ্রীঃ মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা ঃ

শিবাজী শুধু রাজ্যস্থাপন করেন নাই, তিনি ইহার সুশাসনেরও ব্যবস্থা করেন। ভারতের মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ শাসকদের মত শিবাজী ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত স্বেচ্ছাচারী শাসক। শিবাজীর শাসনব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজাকে শাসনকার্যে সহায়তা করিবার জন্য অষ্টপ্রধান বা আটজন মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা হইলেন পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী, অমাত্য বা রাজস্বমন্ত্রী, সুমন্ত বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব, সেনাপতি, মন্ত্রী, পণ্ডিতরাও ও দানাধ্যক্ষ এবং ন্যায়াধীশ বা প্রধান বিচারপতি। মন্ত্রীরা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনা ভার পাইতেন।

শাসনকার্য ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য শিবাজী তাঁহার রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ বা 'প্রান্তে' ভাগ করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা রাজার ন্যায় আটজন প্রধান কর্মচারীর সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। প্রদেশগুলিকে 'তরফ' বা পরগণা এবং তরফগুলিকে গ্রামে ভাগ করা হইত। শিবাজী ইজারাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহের নীতি ত্যাগ করেন। জমি জরীপ করাইয়া উৎপন্ন ফসলের তিরিশ শতাংশ তিনি রাজস্ব ধার্য করেন। পরে রাজস্বের হার বাড়াইয়া চল্লিশ শতাংশ করা হয়। কৃষকরা শস্যে বা টাকায় রাজস্ব দিতে পারিত। কৃষকদিগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজ পর্যটক ফ্রায়ার (Fryer) মন্তব্য করিয়াছিলেন যে শিবাজীর রাজস্বব্যবস্থায় কৃষকদের উপর অত্যাচার হইত। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে শিবাজীর রাজস্বব্যবস্থা ছিল দক্ষ ও কৃষকদের স্বার্থের অনুকূল। রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার মিটাইবার জন্য শিবাজী পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি হইতে চৌথ (এক-চতুর্থাংশ) ও সরদেশমুখী (এক-দশমাংশ) আদায় করিতেন। অনুর্বর মহারাষ্ট্রের রাজস্ব হইতে শাসন ও সৈন্যবাহিনীর সমস্ত খরচ মেটানো সম্ভব হইত না। সুতরাং শিবাজীকে বাধ্য হইয়া প্রতিবেশী রাজ্যগুলি হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিতে হয়।

শাসন-বিভাগ

শিবাজী ছিলেন সহজাত সামরিক প্রতিভার অধিকারী। তিনি মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে সংস্কার প্রবর্তন করিয়া ইহাকে নববলে বলীয়ান করিয়া তোলেন। মারাঠা সৈন্যবাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। এই বাহিনী বর্গী বা নিয়মিত এবং শিলাদার বা অনিয়মিত এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। নিয়মিত বর্গীদের অশ্ব, অস্ত্র ও বেতন যোগাইত রাষ্ট্র। অনিয়মিত শিলাদারদের নিজেদের অস্ত্র ও অশ্ব যোগাড় করিতে হইত। শুধু যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র তাহাদের বেতন দিত। শিবাজীর অশ্বারোহী বাহিনীতে তিরিশ হইতে চল্লিশ সহস্র সৈন্য থাকিত। দুর্গগুলি ছিল শিবাজীর সামরিক শক্তির অপর প্রধান স্তম্ভ। সারা রাজ্যে দুর্গ নির্মাণ ও সংস্কার করিয়া তিনি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র-সজ্জিত নূতন গোলন্দাজ বাহিনীও গঠন করা হয়। এছাড়া শিবাজীর সৈন্যবাহিনীতে পদাতিক, হস্তী ও উট বাহিনী ছিল। তিনি একটি ক্ষুদ্র নৌবাহিনীও গঠন করিয়াছিলেন। প্রতিরক্ষার কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক শিবাজীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। শিবাজী সৈন্যবাহিনীতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলা স্থাপন করিতে সমর্থ হন। সৈন্যশিবিরে বা যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলা বা নর্তকীদের কোন স্থান ছিল না।

সামরিক সংস্কার

মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শিবাজী ভারত ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়া তিনি আপন প্রতিভাবলে স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের রাজা হন। তাঁহার অসাধারণ সাহস, রণকুশলতা ও কূটনৈতিক জ্ঞান তাঁহাকে সাফল্য আনিয়া দেয়। তাঁহার আগে শের শাহ্ ও পরে হায়দার আলি ও রঞ্জিৎ সিংহ সামান্য অবস্থা হইতে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে শিবাজী যখন রাজ্যস্থাপন করেন তখন মুঘল ভাগ্যরবি মধ্যগগনে। তিনি একই সঙ্গে মুঘল, বিজাপুর, পর্তুগীজ ও আবিসিনীয় প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন।[১] সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে জয় করিয়া শিবাজী আপন প্রতিভা ও সাধনায় মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও মারাঠা জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডাফের মতে, শিবাজীর রাজ্যস্থাপন বড় কথা নয়। মারাঠা জাতির মনে তিনি যে নবপ্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করেন তাহা মারাঠা জাতি গঠনে অত্যন্ত সহায়ক হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মারাঠাগণ অধিক শক্তিশালী হইয়া সাম্রাজ্য গঠনের পথে অগ্রসর হন।

শিবাজীর মূল্যায়ন

সমকালীন ঐতিহাসিক কাফী খান এবং আধুনিককালে ভিনসেণ্ট স্মিথ শিবাজীকে 'লুণ্ঠনকারী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাজ্যস্থাপনের প্রয়োজনে শিবাজী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ধনলাভ বা উৎপীড়নের জন্য তিনি লুণ্ঠন করেন নাই। শিবাজী ছিলেন সুশাসক ও সুসংগঠক। তাঁহার শাসনব্যবস্থা ও সামরিক সংস্কারগুলি তাহার সংগঠন ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। সৈন্যবাহিনী সংগঠনে বা শাসন সংস্থাপনে তিনি রঞ্জিৎ সিংহের মত বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ব্যক্তিগত

(১) জাঞ্জিরার সৈয়দগণ এই সময় পশ্চিম উপকূলে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

জীবনে শিবাজী ছিলেন নিষ্কলুষ। সমকালীন ভোগ-বাসনার পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। জাতি ও ধর্মের রক্ষকরূপে কাজ করিলেও পরধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন উদার ও সহিষ্ণু। শিবাজী বিদ্বেষী কাফী খান তাঁহার ও পরধর্ম-সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়াছেন। মস্‌জিদ ও পবিত্র কোরাণকে তিনি শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিতেন। সুরাট লুণ্ঠনের সময় তিনি খ্রীষ্টান পাদরিদের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন। মহিলা, শিশু ও ব্রাহ্মণদের তিনি আঘাত করিতেন না। অন্যান্য দিকে সাফল্যলাভ করিলেও শিবাজী জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ-মুক্ত ভেদাভেদহীন ঐক্যবদ্ধ মারাঠাজাতি গঠন করিতে পারেন নাই। চিতপবন-কোঙ্কনী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-মারাঠা ও ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের মধ্যে সামাজিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব শিবাজী প্রতিষ্ঠিত মারাঠা রাজ্যের অনৈক্য ও দুর্বলতার কারণ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের কার্যাবলী

(European Trading Companies and their activities)

১৪৯৮ খ্রীঃ ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক ইউরোপ হইতে ভারতে জলপথ আবিষ্কার আধুনিক ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতের মালাবার উপকূলের কালিকট বন্দরে আসিয়া হাজির হন। ভাস্কো-ডা-গামার পূর্বে আরব বণিকগণ ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের যোগসূত্র ছিল। এই সময় হইতে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে সরাসরি বাণিজ্য শুরু হয়। পর্তুগীজ বণিকগণ প্রথম হইতে এদেশে নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ও প্রতিপত্তি স্থাপনে তৎপর হন। বাণিজ্যের সহিত লুণ্ঠনও চলিতে থাকে। ইহাতে দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত তাহাদের বিরোধ দেখা দেয়। ১৫১০ খ্রীঃ পর্তুগীজ গভর্ণর আলফানসো দ্য আলবুকুয়ার্ক (Alfonso de Albuquerque) বিজাপুরের সুলতানের অধীন গোয়া দখল করিয়া ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশের সূত্রপাত করেন।



ভাস্কো-ডা-গামা

পর্তুগীজ বাণিজ্য

আলবুকুয়ার্কের উত্তরাধিকারীগণ সমুদ্রোপকূলে আরও অনেক উপনিবেশ গড়িয়া তোলেন। গোয়া, দমন, দিউ, শলসেট, বেসিন, চাউল, বোম্বাই, মাদ্রাজের নিকট সান টম (San Thome) এবং বাংলাদেশে হুগলীতে পর্তুগীজদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। সিংহলের একাংশের উপর তাহাদের অধিকার স্থাপিত হয়। এদেশ হইতে সূতীবস্ত্র, রেশম, মসলা, মণিমুক্তা ও ক্রীতদাস তাহারা দেশে লইয়া

যাইত। দেশ হইতে সোনা, রূপা, ঔষধ, কাঁচের জিনিস ও নানা শৌখিন দ্রব্য তাহারা এদেশে আমদানী করিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় বাণিজ্যে পর্তুগীজদের প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। পর্তুগীজরা বাণিজ্য অপেক্ষা লুন্ঠন ও দস্যুবৃত্তিতে বেশী আগ্রহী ছিল। তাহারা এদেশীয়দের বলপ্রয়োগে খ্রীষ্টান করিত এবং সুযোগ পাইলে এদেশীয়দের ধরিয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলির সহিত বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা ক্রমশঃ পিছু হটিতে থাকে। পর্তুগীজদের লুণ্ঠন, উৎপীড়ন, জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগে বাণিজ্যের রীতি তাহাদের ভারতীয় বাণিজ্যের অবনতির অন্যতম কারণ। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিল অধিকৃত হইবার পর পর্তুগীজরা ভারতীয় বাণিজ্যে ক্রমশঃ আগ্রহ হারায়। এই বাণিজ্য নামমাত্র টিকিয়া থাকে।

অন্যান্য ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম

১৬০০ খ্রীঃ ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে প্রাচ্যদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি পায়। ১৬০২ খ্রীঃ গঠিত হয় ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্গ নির্মাণ ও রাজ্যস্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। ১৬১৬ খ্রীঃ দিনেমার কোম্পানী এবং ১৬৬৪ খ্রীঃ ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য গঠিত হয়। ১৭২২ খ্রীঃ বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড কোম্পানী বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে ভারতে আসে। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে পর্তুগীজ-ওলন্দাজ, পর্তুগীজ-ইংরেজ এবং ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ১৭৫৯ খ্রীঃ বিদারার যুদ্ধে ক্লাইভের নিকট পরাস্ত হইবার পর ওলন্দাজদের ইংরেজ বিরোধিতা দূর হয়। তবে সারা অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে।

ওলন্দাজ বাণিজ্য

১৬০৫ খ্রীঃ ওলন্দাজগণ পর্তুগীজদের নিকট হইতে মালয় দ্বীপপুঞ্জের এ্যামবোইনা (Amboyna) দখল করিয়া 'মসলাদ্বীপে' নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। পরে একে একে জাভা, মালক্কা ও অন্যান্য দ্বীপ দখল করিয়া বাটাভিয়া উপনিবেশ গড়িয়া তোলে। ভারতে পর্তুগীজদের সহিত তাহাদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। গুজরাট, করমণ্ডল, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ওলন্দাজ বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। ভারতে পুলিকট, সুরাট, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, বরানগর, পাটনা, বালাশোর, নেগাপতম ও কোচিন ছিল তাহাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজদের সরাইয়া ওলন্দাজগণ মসলা-বাণিজ্যে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বাণিজ্যের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিত ওলন্দাজগণ। এই দেশ হইতে তাহারা নীল, কাঁচা রেশম, সূতীবস্ত্র, সোরা, চাউল ও আফিম রপ্তানী করিত। ওলন্দাজ ছাড়া ইংরেজরাও ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্যের বিরোধিতা করিত। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। পর্তুগীজগণ ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সাহায্যের আশ্বাস পায়,

তবে এসময় হইতে পর্তুগীজগণ ভারতীয় বাণিজ্যে ক্রমশঃ পিছু হটিতে থাকে। ভারতে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়া যায়। ইউরোপে উভয় জাতির মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই সূত্র ধরিয়া ভারতে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা দেখা দেয়। ওলন্দাজগণ সুযোগ পাইলে ইংরেজ জাহাজ আটক করিত এবং বাণিজ্যে নানারকম বিঘ্ন সৃষ্টি করিত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজ-ওলন্দাজ বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থায়ী হয়।

১৫৯৯ খ্রীঃ ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় এবং পরের বৎসর সরকারী অনুমোদন লাভ করে। ১৬০৮ খ্রীঃ কোম্পানী ভারতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করে। পরের বৎসর ক্যাপ্টেন হকিন্স সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত দেখা করিয়া বাণিজ্যকেন্দ্র খুলিবার অনুমতি লাভ করেন। ১৬১২ খ্রীঃ ক্যাপ্টেন বেস্ট (Best) পর্তুগীজ নৌবহরকে পরাস্ত করিয়া সুরাট বন্দরে আসিয়া হাজির হন। পরের বৎসর সম্রাট জাহাঙ্গীর সুরাটে ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ স্যার টমাস রোকে (Thomas Roe) জাহাঙ্গীরের দরবারে দূত হিসাবে পাঠান। ১৬১৫-১৬১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ইংরেজ দূত টমাস রো মুঘল দরবারে ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজ কোম্পানীকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। প্রথমে সুরাট, আগ্রা, আহমেদাবাদ ও ব্রোচে ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৬৮ খ্রীঃ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস বার্ষিক দশ পাউণ্ড রাজস্বের বিনিময়ে পর্তুগালের নিকট হইতে বিবাহের যৌতুক হিসাবে প্রাপ্ত বোম্বাই কোম্পানীকে হস্তান্তর করেন। ১৬৮৭ খ্রীঃ নাগাদ বোম্বাই পশ্চিম উপকূলে কোম্পানীর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে মসুলিপত্তমে ইংরেজ কোম্পানীর নূতন বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। বার্ষিক পাঁচশত প্যাগোডা বা স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তাহারা গোলকুণ্ডার সুলতানের নিকট হইতে এই অঞ্চলে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। ১৬৩৯ খ্রীঃ ফ্রান্সিস ডে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে মাদ্রাজ লাভ করেন। এইখানে নির্মিত ফোর্ট সেণ্ট জর্জ তাহাদের পূর্বাঞ্চল বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হয়। ইংরেজরা ওলন্দাজদের মত এই দেশ হইতে সূতীবস্ত্র, রেশম, সোরা, আফিম ইত্যাদি রপ্তানী করিত। ইউরোপ হইতে আমদানী করিত সোনা, রূপা, শৌখিন দ্রব্য, নানাপ্রকার ধাতবদ্রব্য, কাঁচ, ঔষধপত্র ইত্যাদি।

ইংরেজ বাণিজ্য

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতের উত্তর-পূর্বে উড়িষ্যার হরিহরপুর ও বালাশোরে ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। শতকের মধ্যভাগে পাটনা, হুগলী ও কাশিমবাজারে নূতন ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি গড়িয়া উঠে। সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে ভারতে ইংরেজ বাণিজ্যের তেমন উন্নতি হয় নাই। দেশে গৃহযুদ্ধ, মুঘল-মারাঠা-দক্ষিণী সুলতানদের মধ্যে লড়াই ও ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা এইজন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। ১৬৬৯ খ্রীঃ হইতে ইংরেজ কোম্পানী শক্তি প্রয়োগে নিজেদের বাণিজ্যিক অধিকার রক্ষা করিবার নীতি গ্রহণ করে। ১৬৮৭ খ্রীঃ হইতে কোম্পানী নিজেকে সামরিক

ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। কোম্পানী একে একে হুগলী, বালাশোর, হিজ্‌লী ও চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। প্রত্যুত্তরে সম্রাট আরঙ্গজেব ইংরেজ কোম্পানীর সমস্ত বাণিজ্যিক অধিকার বাতিল করিয়া দেন। ইংরেজ নৌবহর পশ্চিম উপকূলের মুঘল জাহাজগুলি আটক করিতে থাকে। ১৬৯০ খ্রীঃ আরঙ্গজেব ও ইংরেজদের মধ্যে আপোষ হয়। ইংরেজরা সমস্ত পুরাতন বাণিজ্যিক অধিকারগুলি ফেরত পায়। জোব চার্ণক কলিকাতায় ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। কলিকাতার জন্ম হয় (১৬৯০)। ১৬৯৬ খ্রীঃ শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপিত হয়। কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী স্বত্ব কোম্পানী ক্রয় করে। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কোম্পানীর বাংলা তথা পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যের সদর কেন্দ্র হয় (১৭০০)। সম্রাট আরঙ্গজেব বার্ষিক তিন সহস্র টাকা রাজস্বের বিনিময়ে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার মানিয়া লন। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা কোম্পানীর ভারতীয় বাণিজ্যের সদর দপ্তর হয়। ১৬৯৮ খ্রীঃ ইংলণ্ডে এক নূতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইলে ভারতে কোম্পানীর বাণিজ্য কিছুকাল মন্থর হইয়া পড়ে। ইংরেজ বণিকগণ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্যও ভারতে আসেন। ১৭০২ খ্রীঃ পুরাতন ও নূতন কোম্পানী মিলিত হইলে ইংরেজ বাণিজ্যে আবার অগ্রগতি দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য দ্রুত বাড়িতে থাকে। ১৭১৫ খ্রীঃ নূতন বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কোম্পানী জন সুরমানের (John Surman) নেতৃত্বে সম্রাট ফারুখসিয়ারের দরবারে প্রতিনিধি দল পাঠায়। ১৭১৭ খ্রীঃ এক বাদশাহী ফারমান বা আদেশ জারী করিয়া ফারুখসিয়ার কোম্পানীর বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করেন। বাংলায় বার্ষিক তিন সহস্র টাকার বিনিময়ে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার বজায় থাকে। কোম্পানী কলিকাতার আশেপাশে আরও আটত্রিশখানি গ্রাম কিনিবার অধিকার পায়। ১৭১৭ খ্রীঃ হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত পশ্চিম উপকূলে কোম্পানীর বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পর্তুগীজ ও মারাঠা নৌবহরের আক্রমণ এজন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। তবে মাদ্রাজে কোম্পানীর বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে।

ভারত-বাণিজ্যের ভাগ লইতে ফরাসীরা আসে সকলের শেষে। ১৬৬৪ খ্রীঃ ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্ম হয়। ১৬৬৮ খ্রীঃ সুরাটে প্রথম ফরাসী বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। পরের বৎসর মসুলিপত্তমে তাহাদের দ্বিতীয় বাণিজ্য কুঠি গড়িয়া উঠে। ১৬৭৩ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কোয়েজ মার্টিন মাদ্রাজের নিকট পণ্ডিচেরীতে ফরাসী বাণিজ্য কুঠির পত্তন করেন। ইহা ফরাসী বাণিজ্যের সদরকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৬৭৪ খ্রীঃ বাংলার মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খান চন্দননগরে ফরাসী বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। ভারতে ফরাসী বাণিজ্যের শুরুতে ওলন্দাজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ফরাসী-ওলন্দাজ দ্বন্দ্বে ইংরেজরা ওলন্দাজদের পক্ষ নেয়। ১৬৯৩ খ্রীঃ ওলন্দাজরা ফরাসী ঔপনিবেশ পণ্ডিচেরী দখল করিয়া লয়। ১৬৯৭ খ্রীঃ ওলন্দাজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে

ফরাসী বাণিজ্য

পণ্ডিচেরী ফরাসীদের ফেরত দেওয়া হয়। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে ফরাসী বাণিজ্যে দুরবস্থা দেখা দেয়। বাটাম, সুরাট ও মসুলিপত্তমে ফরাসী বাণিজ্য-কুঠি বন্ধ হইয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে ফরাসী বাণিজ্যের আরও অবনতি ঘটে। ১৭২০ খ্রীঃ ফরাসী কোম্পানীর পুনর্গঠনের পর লেনো (Lenoir) ও ডুমা (Dumas)-র নেতৃত্বে ফরাসী বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। ১৭২০—১৭৪২ খ্রীঃ মধ্যে ফরাসীরা ভারত মহাসাগরে ও পশ্চিম উপকূলে মরিশাস, মাহে ও কারিকল দখল করিয়া লয়। এই পর্বে ফরাসী কোম্পানীর ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোন ইচ্ছা ছিল না। শান্তিপূর্ণভাবে বাণিজ্যের উন্নতি করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য।

দিনেমার ও অস্টেণ্ড কোম্পানী

দিনেমারগণ চন্দননগরের নিকট গোঁদলপাড়ায় ও পরে শ্রীরামপুরে এবং অস্টেণ্ড কোম্পানী বারাকপুরের নিকট বাঁকীবাজারে কুঠি নির্মাণ করিয়া বাণিজ্য করিত। ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের বিরোধিতার ফলে অস্টেণ্ড কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্য বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। তবে দিনেমারদের বাণিজ্য চলিতে থাকে।

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ**—(ক) মির্জামহম্মদ হায়দারের গ্রন্থের নাম কি? (খ) 'হুমায়ুননামার' রচয়িতা কে? (গ) আবদুল কাদের বদায়ুনীর গ্রন্থের নাম কি? (ঘ) 'তবাকৎ-ই-আকবরী' কাহার রচনা? (ঙ) 'পাদশাহনামার' লেখক কে? (চ) আবুল ফজলের দুইখানি গ্রন্থের নাম কি? (ছ) ফৈজী কে ছিলেন? (জ) তানসেন কিজন্য বিখ্যাত? (ঝ) 'আহকাম-ই-আলমগিরী' কাহার রচনা? (ঞ) সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর নাম কি? (ট) 'আখবরাত' কি? (ঠ) খানুয়ার যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কাহাদের মধ্যে হয়? (ড) ঘর্ঘরার যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়? (ঢ) ধর্মাতের যুদ্ধ কবে এবং কোথায় হয়? (ণ) সামুগড়ের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (ত) ১৪৯৮ খ্রীঃ যে পর্তুগীজ নাবিক কালিকটে পেঁাছিয়াছিলেন তাঁহার নাম কি? (থ) হলদিঘাটের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (দ) দীন-ই-ইলাহী কে প্রবর্তন করেন? (ধ) কত খ্রীঃ আরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়? (ন) পুরন্দরের সন্ধি কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (প) কোন্ বৎসর শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হয়?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**—(ক) মুঘলরা কোথাকার লোক? (খ) 'বাবর-নামায়' সম্রাট বাবর ভারত সম্পর্কে কি লিখিয়াছেন? (গ) শের শাহ্ কিভাবে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করেন? (ঘ) আকবর রাজপুতদের প্রতি উদার-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন কেন? (ঙ) আকবরের রাজসভার বর্ণনা দাও। (চ) জাহাঙ্গীর ও শাহ্জাহানের রাজত্বকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের কিরূপ উন্নতি ঘটিয়াছিল? (ছ) সম্রাট শাহ্জাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও। (জ) আরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। (ঝ) আরঙ্গজেবের সময়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিচয় দাও। (ঞ) আরঙ্গজেবের সময়ে হিন্দু বিদ্রোহের কারণ কি? (ট) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে

আরঙ্গজেবের দায়িত্ব কতখানি ছিল? (ঠ) আরঙ্গজেবের চরিত্র বিচার কর। (ড) শিবাজীর চরিত্র আলোচনা কর।

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর:**—(ক) মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদান-গুলির উপর একটি প্রবন্ধ লিখ। (খ) ১৫২৬-৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণ দাও। (গ) শের শাহের শাসনব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দাও। (ঘ) সম্রাট আকবরের রাজ্যজয় সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ঙ) আকবর প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থার পরিচয় দাও। (চ) আকবরের দীন ই-ইলাহী ধর্মমতের বৈশিষ্ট্যগুলি কি? (ছ) সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালকে মুঘল আমলের স্বুবর্ণ যুগ বলা যায় কি? (জ) আরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতির পরিচয় দাও। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতখানি দায়ী ছিল? (ঝ) শিবাজী কিভাবে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন করেন? (ঞ) শিবাজীর শাসনব্যবস্থার পরিচয় দাও। (ট) মুঘল যুগে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বাণিজ্যের পরিচয় দাও।

৪। **টীকা লিখ:**—(ক) জাবতি (খ) তোডরমল (গ) আকবরের 'নবরত্ন' (ঘ) 'দাক্ষিণাত্য ক্ষত' (ঙ) অষ্টপ্রধান (চ) চৌথ ও সরদেশমুখী (ছ) রাণা প্রতাপ।

৫। **ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ কর:**—(ক) কাবুল (খ) মুলতান (গ) খান্দেশ (ঘ) আহম্মদনগর (ঙ) মালব (চ) বেরার (ছ) অযোধ্যা (জ) চিতোর (ঝ) বিজাপুর (ঞ) গোলকুণ্ডা (ট) কলিকাতা (ঠ) বোম্বাই (ড) মাদ্রাজ (ঢ) চন্দননগর (ণ) পণ্ডিচেরী (ত) গোয়া।

৬। **শূন্যস্থান পূরণ কর:**—(ক) মুঘলরা ছিল মধ্য এশিয়ার — লোক। (খ) সেবাস্তিয়ান মানরিক, ফ্রাঙ্কোয়েজ বার্ণিয়ে ও বাপটিস্ট তাভার্ণিয়ে — ভারত ভ্রমণে আসেন। (গ) বাবর ছিলেন তুর্কিস্তানের — রাজ্যের অধিপতি। (ঘ) বাবর প্রথম পানিপথের যুদ্ধে — পরাস্ত করিয়া ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। (ঙ) শের শাহ্‌ ভূমিব্যবস্থায় — প্রথার প্রচলন করে। (চ) শের শাহের হিন্দু সেনাপতির নাম —। (ছ) আকবরের সেনাপতি আসফ খান মধ্যপ্রদেশের — রাজ্যটি অধিকার করেন। (জ) আকবর — খ্রীঃ দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত প্রচার করেন। (ঝ) শিবাজী স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া উপাধি নেন—।

৭। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও:**—(ক) মেবাররাজ উদয়সিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন / করেন নাই। (খ) আকবর / জাহাঙ্গীর / শাহ্‌জাহান ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে জাবতি, নাসাক, বাঁটাই ব্যবস্থা চালু করেন। (গ) জাহাঙ্গীর / শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে পারস্য সম্রাট শাহ্‌ আব্বাস কান্দাহার দখল করিয়া লন। (ঘ) জাহাঙ্গীর / শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্য শিল্পের চরম উন্নতি ঘটে। (ঙ) শাহ্‌জাহান / আরঙ্গজেব উত্তর-পশ্চিমের উপজাতি বিদ্রোহ দমন করেন। (চ) মুঘল সুবাদার ইসলাম খান / শায়েস্তা খান শিবাজীকে আক্রমণ করেন। (ছ) চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ / ফরাসীদের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। (জ) গোয়া, দমন, দিউ ছিল পর্তুগীজ / ওলন্দাজ / ফরাসীদের উপনিবেশ।

একাদশ অধ্যায়

মুঘল যুগে ভারতের অবস্থা

(India under the Mughals)

ভারতে মুঘল সম্রাটদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল দেশে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ভারতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়া তাঁহারা সারা দেশে সংহতি ও ঐক্য আনয়ন করেন। সম্রাট বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করিয়া যান। হুমায়ূন সাম্রাজ্য স্থাপনে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। আকবরই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সমগ্র উত্তর ভারত অধিকার করেন এবং দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া যান। সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় মুঘল সাম্রাজ্য-বিস্তার সম্পূর্ণ হয়। উত্তর-পশ্চিমে কাবুল হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী এবং পশ্চিমে গুজরাট হইতে পূর্বে আসাম ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগ মুঘল শাসনের আওতায় আসে। বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে এতবড় ভারতীয় সাম্রাজ্য আর কেহ স্থাপন করিতে পারে নাই। মারাঠা রাজপুত ও সুদূর দক্ষিণের হিন্দু রাজাদের অধীনে ভারতের কিয়দংশ স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন থাকিলেও বলা যায় মুঘল সম্রাটগণ দেশের বৃহত্তর অংশে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজনৈতিক ঐক্য

এই বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্য মুঘল সম্রাটগণ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুঘলরা ছিলেন বিদেশী। ভারতবর্ষ দখল করিয়া এই দেশে নিজেদের শাসনাধিকার সুদৃঢ় করিবার জন্য তাঁহারা নিজেদের শাসনব্যবস্থার কাঠামোটি বজায় রাখিয়াছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে মুঘল শাসনব্যবস্থার মৌল চরিত্র পারস্য ও আরবদেশের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ (Perso-Arabic system in an Indian setting)। শুধু স্থানাভেদে ইহার কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছিল। পারস্য বা আরবদেশের শাসনব্যবস্থায় আমীর বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ছিলেন প্রধান। তাঁহারা খলিফা বা বাদশাহের প্রতিনিধি হিসাবে দেশরক্ষা, নূতন দেশ জয় এবং শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন। মুঘল সম্রাটগণ অনুরূপ শাসনব্যবস্থা ভারতে চালু করেন। মুঘলদের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সম্রাটগণ। তাহাদের অধীনে প্রাদেশিক শাসকগণ বা সুবাদারগণ দেশ শাসন করিতেন। আকবরের সময়ে সুবাদার ও দেওয়ান স্বাধীনভাবে নিজামত বা সামরিক বাহিনী ও ফৌজদারী বিচার-বিভাগ এবং দেওয়ানী বা রাজস্ব ও দেওয়ানী বিচার-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে সুবাদারগণ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। দেওয়ান প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হন। মুঘল সম্রাটগণ সমগ্র শাসনব্যবস্থার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে সক্ষম হন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও দেওয়ানদের তাঁহারা নিযুক্ত করিতেন। প্রাদেশিক প্রধান

শাসনব্যবস্থা

বিচারক বা কাজী তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত হইত। মুঘল সম্রাটগণ প্রাদেশিক শাসকদের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ন নজর রাখিতেন। গুপ্তচর বিভাগ প্রাদেশিক শাসনের সমস্ত খুঁটিনাটি সম্রাটের কর্ণগোচর করিত। বাবর হইতে আরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্রাটগণ এই কেন্দ্রীভূত শাসন বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালের দুর্বল মুঘল সম্রাটদের অধীনে শক্তিশালী প্রাদেশিক সুবাদারগণ এই ব্যবস্থার পতন ঘটান। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শাসনের উপর ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণ হারাইতে থাকে।

মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থার বনিয়াদ হইল ভূমি-রাজস্ব। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের একাংশ রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল নগণ্য। সম্রাট আকবর মুঘল রাজস্বব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন। এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জমি জরীপ করিয়া রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব ধার্য করা। সাধারণতঃ মুঘল যুগে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য করা হইত। কৃষকগণকে টাকায় রাজস্ব দিতে হইত। রাষ্ট্র কৃষকের অধিকার স্বীকার করিয়া 'পাট্টা' দিত। রাষ্ট্র জমি ও উৎপন্ন শস্যের হিসাবসহ ভূমি-রাজস্বের বিস্তৃত 'হস্তবুদ' তৈয়ারী করিত। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে স্থাপিত রাজস্ব-ব্যবস্থা ছিল 'রায়তওয়ারী'। তবে কোন কোন অঞ্চলে জমিদার ও ইজারাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। বাংলাদেশে জমিদার ও ইজারাদাররা রাজস্ব-সংগ্রহ করিত। এইজন্য তাহারা কমিশন পাইত। আকবর প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা 'জাবতি' বা 'দহসলা' নামে পরিচিত। জাবতি পদ্ধতির অনুসরণে দেশের ১৭০টির উপর সার্কেলে জমি জরীপ করিয়া রাজস্ব ধার্য করা হয়। ইহা ছাড়া নাসাক ও বাঁটাই ব্যবস্থার মাধ্যমেও রাজস্ব সংগৃহীত হইত। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন শস্যের একাংশ রাষ্ট্র পাইত।

ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা

মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জাগীরব্যবস্থা। মুঘল সৈন্য-বাহিনী ছিল রাষ্ট্রের স্তম্ভরূপ। সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের বেতনের পরিবর্তে জাগীর দেওয়া হইত। সুতরাং মুঘল যুগে জমি ছিল দুই ভাগে বিভক্ত— খালসা ও জাগীর। খালসা জমির আয় সরাসরি রাজকোষে জমা পড়িত এবং সম্রাটের প্রয়োজনে ব্যয় হইত। আর জাগীর জমির আয় মনসবদার এবং সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা পাইতেন। আকবরের সময় রাষ্ট্র খালসা ও জাগীর জমির তদারকি করিত। জাহাঙ্গীরের সময় হইতে ক্রমশঃ জাগীর ও জাগীরদারদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং খালসা জমির পরিমাণ কমিতে থাকে। ডঃ বি. পি. সাক্সেনার মতে, এই সময় দেশের সত্তর শতাংশ জমি জাগীরদারদের হাতে চলিয়া যায়। জাগীরদাররা রাষ্ট্রের পরিবর্তে নিজেদের জাগীর নিজেরাই তত্ত্বাবধান করিতে শুরু করে। রাষ্ট্রের সহিত কৃষকদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়। মুঘল শাসনের শেষদিকে জাগীরব্যবস্থায় আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। (১) জাগীরদারদের সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া যায়। জাগীরদারদের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অথচ সেই হারে জাগীর হইতে আয় বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা ছিল না। (২) জাগীরের সংখ্যা সীমিত থাকায় অনেকে জাগীরদার হইয়াও

জাগীর ও জাগীরদার

সারা জীবন জাগীরের অধিকার পাইত না। জাগীরব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থায় প্রায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। সৈন্যবাহিনী ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে। (৩) কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী জাগীরদারের সৃষ্টি হয়। জাগীরদার নিজের আয় বাড়াইবার জন্য কৃষকের উপর নূতন নূতন কর স্থাপন করে। কৃষকদের অসন্তোষ হইতে সারা ভারতে কৃষক প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। (৪) সীমিত সংখ্যক জাগীরের অধিকার লইয়া মুঘল অভিজাতদের মধ্যে কলহ ও হানাহানি দেখা দেয়। লাভজনক, ভাল জাগীরের অধিকার পাইবার জন্য প্রতিযোগিতা তীব্র হয়। জাগীরদারদের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। জাগীরদাররা পরবর্তীকালে জমির মালিক বা জমিদার হইয়া বসেন।

মুঘল ভূমি-রাজস্ব
ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য

মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ : (১) জমি জরীপ করিয়া ভূমি-রাজস্বের বিস্তৃত হিসাব বা হস্তবুদ তৈয়ারী করা হইত। ইহার পর রাজস্ব ধার্যের ব্যবস্থা ছিল। (২) মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় রাজস্বের হার ছিল বেশ উচ্চ; উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ। ইহার সহিত আবওয়াব, সেস প্রভৃতি বাড়তি কর আদায় করা হইত। (৩) জমিদার ও ইজারাদাররা রাজস্ব-সংগ্রহ ব্যবস্থার সহিত যুক্ত ছিলেন। কোন কোন অঞ্চলে রাজকর্মচারীরা সরাসরি রাজস্ব আদায় করিত। (৪) জাগীরদারী ব্যবস্থা হইতে সরকারের রাজস্ব হ্রাস, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও প্রশাসনিক শিথিলতা দেখা দেয়। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব ঘটে।

বিদেশীদের চোখে
গ্রামীণ ভারত

মুঘল যুগে বহু বিদেশী নানারকম উদ্দেশ্য লইয়া ভারতে আসেন। ইঁহাদের রচনা হইতে মুঘল যুগের গ্রামীণ চিত্রটি পাওয়া যায়। সম্রাট আকবরের সময় খ্রীষ্টান পাদরী মনসেরাট (Monserrate) ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। আগ্রা হইতে লাহোর পর্যন্ত যে বিস্তৃত অঞ্চল তিনি ভ্রমণ করেন সেখানকার গ্রামীণ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেশে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রাচুর্য ও নিম্নমূল্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে র‍্যাল্‌ফ ফিচ (Ralph Fitch) ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি সর্বত্র খাদ্যশস্য, আহার্য সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহজলভ্য ও সস্তা দেখিয়াছিলেন। সর্বত্র ছিল প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমকালীন পর্যটক উইলিয়ম ফিন্‌চ (William Finch) এই দেশের মানুষের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অনুরূপ-ভাবে পর্তুগীজ পর্যটক পায়েস (Paes) দক্ষিণ ভারতের শহর ও গ্রামাঞ্চলের সমৃদ্ধির কথা লিখিয়াছেন। এডওয়ার্ড টেরি (Edward Terry) সারা দেশে আহার্য সামগ্রী সস্তা ও সহজলভ্য ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। একথা মনে রাখিতে হইবে জিনিসপত্রের দাম সস্তা হইলেই মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আসে না। মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বা আয় কিরূপ ছিল তাহা দেখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, মুঘল যুগে সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

আবার বিদেশীদের বিবরণী হইতে জানা যায় সারা দেশে অভিজাত ও ধনী বণিকগণ বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন করিতেন। উচ্চতলার মানুষের তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বেশ কষ্টকর ছিল। জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক আগ্রায় ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ ফ্রান্সিসকো পেলসার্ট (Francisco Pelsaert) মন্তব্য করিয়াছেন যে এদেশের শ্রমিক, পিওন, দোকানদার ও ভৃত্যদের অবস্থা ছিল প্রায় ক্রীতদাসদের অনুরূপ। তাহাদের বলপ্রয়োগে কাজ করিতে বাধ্য করা হইত। এই শ্রেণীর মানুষের মজুরি, বাসস্থান ও আহার্য সামগ্রী অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। শাহ্‌জাহানের রাজত্বের শেষদিকে কৃষকদের উপর নানাপ্রকার বাড়তি কর স্থাপন করা হয়। তাহাদের দুর্দশা বাড়িতে থাকে। বার্নিয়ে ও পেলসার্ট উভয়েই শিল্পী ও কারিগরদের নির্যাতন দেখিয়াছিলেন। অভিজাত ও সরকারী কর্মচারীগণ জোর করিয়া অল্প দামে তাহাদের উৎপন্ন শিল্প সামগ্রী লইয়া যাইত। জোর করিয়া উৎকোচও আদায় করিত। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে আরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত দেশে কয়েকটি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইহাতে কৃষক ও সাধারণ মানুষের দুর্দশার সীমা ছিল না।

মুঘল সম্রাটগণ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় থাকায় এযুগে দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি দেখা দেয়। মুঘল সম্রাটগণ রাজধানীতে ও বড় বড় শহরে 'কারখানা' স্থাপন করিয়া নিজেদের প্রাসাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সৈন্যবাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ারী করাইতেন। ইহা ছাড়া দেশের সর্বত্র বহু শিল্পপণ্য উৎপন্ন হইত। ইহার একাংশ বিদেশে রপ্তানী হইত এবং বাকী অংশ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাইত। মুঘল যুগে দেশে সবচেয়ে বড় শিল্প ছিল বয়ন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সুতী, রেশম ও পশমের বস্ত্র তৈয়ারী হইত। তাহা ছাড়া কার্পেট ও শালও তৈয়ারী হইত। আবুল ফজল লিখিয়াছেন আকবর লাহোরে এক হাজার পশম বস্ত্রের কারখানা খুলিয়াছিলেন। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে পশম, গুজরাটে রেশম ও বাংলা ও দক্ষিণ ভারতে সুতীবস্ত্র শিল্প খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বার্নিয়ে বাংলার উন্নত সুতীবস্ত্র ও রেশম শিল্পের প্রশংসা করিয়াছেন। বাংলার অতি সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র মস্‌লিন বিদেশে রপ্তানী হইত। বাংলা, গুজরাট ও পাঞ্জাবে চিনি শিল্প উন্নতি করিয়াছিল। দিল্লী, বাংলা ও কাশীতে তামা, পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র তৈয়ারী হইত। জাহাজ নির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্র, মণিমুক্তা ও অলঙ্কার শিল্প মুঘল যুগে উন্নতি করিয়াছিল। মুঘল সম্রাটগণ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর সাড়ে তিন শতাংশ হারে রাজস্ব ধার্য করা হইত। স্থল ও জল পথে বাণিজ্য চলিত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সম্রাটরা বড় বড় রাস্তা ও সরাইখানা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। মুঘল রাজত্বের শেষদিকে দেশে অভ্যন্তরীণ শান্তি বিঘ্নিত হইলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

মুঘল সম্রাটগণ বৈদেশিক বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির ফলে দেশের ধনবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। এইজন্য তাঁহারা বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দান

করিতেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর শুল্কহারও কম ছিল। কোন ক্ষেত্রেই বিদেশী বণিকদের সাড়ে তিন শতাংশের অধিক বাণিজ্য শুল্ক দিতে হইত না। দেশে শান্তি অব্যাহত থাকায় এবং লাভের পরিমাণ অধিক হওয়ায় বহু বিদেশী বণিক ও সংস্থা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পর্তুগাল, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স মুঘল যুগে ভারতে বাণিজ্য করিত। এই যুগে চীন, পারস্য, আরব, মধ্য-এশিয়া, মিশর, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। মুঘল যুগে বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট পশম, রেশম কাপড়, ভেলভেট, কাঁচ, মদ্য, সোনা-রূপা, ধাতব দ্রব্য, শাঁখ, ঘোড়া ইত্যাদি আমদানী করা হইত। এই দেশ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইত নানাধরনের সূতী ও রেশম বস্ত্র, মসলা, লাক্ষা, মণিমুক্তা, হীরা, নীল, চিনি, চাউল ইত্যাদি। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সবচেয়ে উন্নতি হয়। পশ্চিম ভারতে সিন্ধুর লাহারী বন্দর, সুরাট, গোয়া, বোম্বাই, কালিকট এবং পূর্ব ভারতের হুগলী, বালাশোর, পুলিকট, মসুলিপত্তম ও চট্টগ্রাম হইতে বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানী-রপ্তানী কাজকর্ম পরিচালিত হইত। মুঘল যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল আমদানী কম ও রপ্তানী বেশী। ডঃ রাধাকমল মুখার্জীর মতে, লাভজনক বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে মুঘল যুগে দেশে ক্রমশঃ ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুরাটের বিরজী বোহরা (Virji Bohra) ও আবদুর গফ্ফার প্রভৃতি বণিকগণ অতিশয় ধনশালী হইয়া উঠেন।

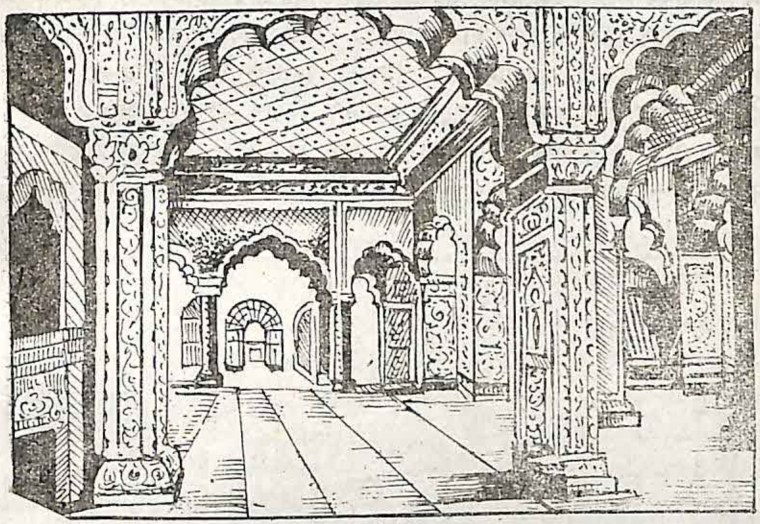
বৈদেশিক বাণিজ্য

মুঘল যুগের সংস্কৃতি :

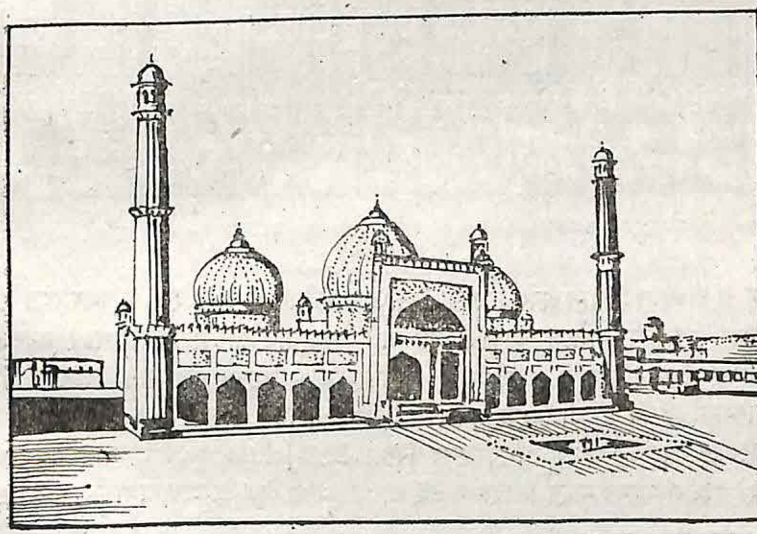
ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুঘল যুগের দান অসাধারণ। স্থাপত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতে নূতন নূতন সৃষ্টি এই যুগকে ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে। মুঘল সম্রাটগণ এই নব্য সংস্কৃতির স্রষ্টা, ধারক ও বাহক। আরঙ্গজেব ছাড়া আর সকল মুঘল সম্রাট স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের সমাদর করিতেন। ইঁহাদের উৎসাহে ও আনুকুল্যে সংস্কৃতির এই সমস্ত বিভাগে নূতন সৃজনী প্রতিভা ও নূতন সৃষ্টি দেখা দেয়। বাবর ও হুমায়ুন মুঘল স্থাপত্যের সূত্রপাত করেন। আকবরের উৎসাহে মুঘল স্থাপত্য-শিল্পের নিজস্ব রীতি গড়িয়া উঠে। ইহা অবশ্যই মধ্য এশিয়া ও পারস্যের শিল্প রীতির সহিত হিন্দু-রীতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এই মিশ্র-রীতি মুঘল স্থাপত্য রীতি নামে পরিচিত। উদার হৃদয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের অক্লান্ত সাধক সম্রাট আকবর এই উন্নত রীতির প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার আমলে নির্মিত ফতেপুরসিক্রির প্রাসাদগুলিতে হিন্দু ও জৈন অলংকরণ রীতির ছাপ আছে। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি, আগ্রা দুর্গের 'জাহাঙ্গীরী মহল', ফতেপুরসিক্রির যোধবাই প্রাসাদ, জামি মসজিদ, বুলন্দদরওয়াজা ও পাঁচমহল আকবরের যুগের উৎকৃষ্ট স্থাপত্য-নিদর্শন। শিল্প সমালোচক ফার্গুসনের মতে, ফতেপুরসিক্রি এক মহান হৃদয়ের প্রতিফলন (a reflex

স্থাপত্য

of the mind of a greatman) এলাহাবাদের চেহেলস্তুন প্রাসাদও (palace of forty pillars) তাঁহার সময়ে নির্মিত হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সবচেয়ে



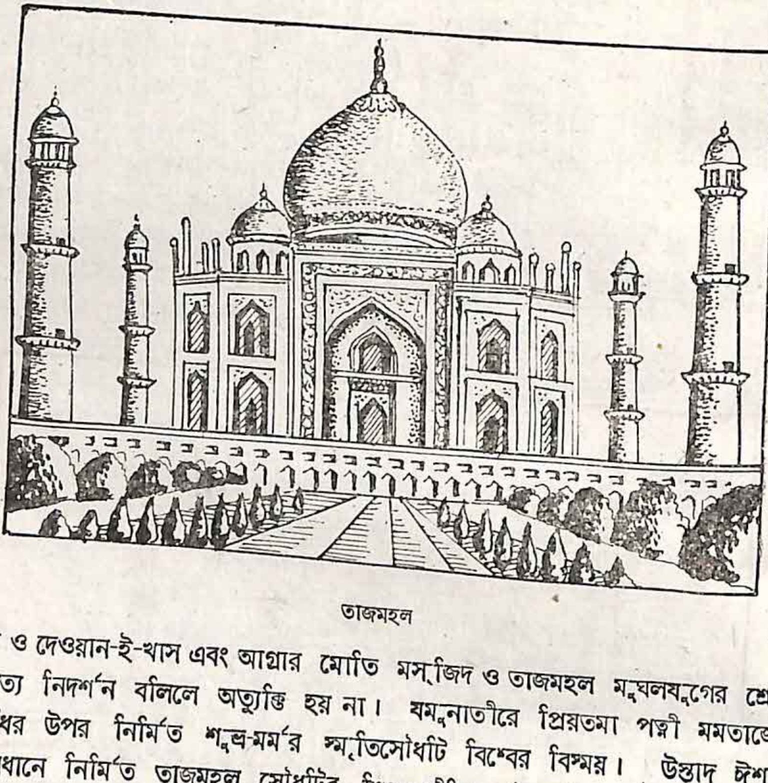
দেওয়ান-ই-খাস



জামি মস্‌জিদ

উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-নিদর্শন হইল সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি। ইহাতে বৌদ্ধ ও ইন্দোচীন শিল্প-রীতির প্রভাব আছে। আগ্রায় নূরজাহানের পিতা ইতিমাদ্দৌলার

সমাধি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের অপর বিশিষ্ট স্থাপত্য শিল্পকর্ম। শ্বেতপাথরে নির্মিত এই সমাধিতে অনেক সূক্ষ্ম কারুকাজ আছে। সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল মুঘল স্থাপত্যের স্বর্ণ যুগ। মুঘলযুগের এই শ্রেষ্ঠ নির্মাতার শাসনকালে দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর, কান্দাহার, আজমীর, আহমেদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে অসংখ্য প্রাসাদ, মস্‌জিদ, দুর্গ, উদ্যান ও স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। শাহ্‌জাহানের সময়ে মুঘল স্থাপত্য-রীতির মৌল চরিত্রে বা আঙ্গিকে বিশেষ কোন পরিবর্তন বা অগ্রগতি দেখা যায় না। তবে গঠন সৌকর্যের বিশালতা ও সূক্ষ্ম অলংকরণ তাহার স্থাপত্য নিদর্শনগুলিকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। তাঁহার সময়ে নির্মিত দিল্লীর দেওয়ান-ই-



তাজমহল

আম ও দেওয়ান-ই-খাস এবং আগ্রার মোতি মস্‌জিদ ও তাজমহল মুঘলযুগের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যমুনাতীরে প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের সমাধির উপর নির্মিত শুভ্র-মর্মর স্মৃতিসৌধটি বিশ্বের বিস্ময়। উস্তাদ ঈশার তত্ত্বাবধানে নির্মিত তাজমহল সৌধটির শিল্প-রীতি, গঠনকৌশল, সূক্ষ্ম কাজ ও অলংকরণ আজও বিশ্বের রসিকজনের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া থাকে। মণিমাণিক্যখচিত সম্রাট শাহ্‌জাহানের ময়ূর সিংহাসন এই যুগের অপর এক উল্লেখযোগ্য শিল্প-কীর্তি।

মুঘলযুগে স্থাপত্য শিল্পের মত চিত্রকলা ও সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হয়। বাবর ও হুমায়ুন মধ্য এশিয়া ও পারস্যের চিত্র-রীতি ভারতে চালু করিবার চেষ্টা করেন। আকবরের সময়ে প্রকৃতপক্ষে মুঘল চিত্রকলার আবির্ভাব ও উন্নতি ঘটে। আকবর বহু চিত্রশিল্পীকে আশ্রয় দেন এবং তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁহার উৎসাহে এইসব

শিল্পীরা এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন চিত্র-রীতির সহিত মধ্য এশিয়া ও পারস্য রীতির মিশ্রণ ঘটাইয়া মুঘল-রীতির সৃষ্টি করেন। পারস্যদেশীয় শিল্পী মীর সৈয়দ আলি ও আব্দুল সামাদ এই নূতন রীতির প্রতিষ্ঠাতা। আকবর আব্দুল সামাদের নেতৃত্বে চিত্রকলার জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। ফারুকবেগ, খুরসাওকুলি, জামশেদ, বসবান, লাল, তারাচাঁদ, জগন্নাথ, কেসু, মুকুন্দ, হরিবংশ ও দসবন্ত আকবরের আমলের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর নিজে শিল্পরসিক ও সমালোচক ছিলেন। তাঁহার সময়ে মুঘল চিত্রকলার উন্নতি অব্যাহত থাকে। আগা রেজা, আবুল হাসান, মহম্মদ নাদির, মুহম্মদ মুরাদ, উস্তাদ মনসুর, বিশান দাস, মনোহর ও গোবর্ধন তাঁহার আমলের নামকরা শিল্পী। জাহাঙ্গীরের মত তাঁহার পুত্র শাহ্‌জাহান চিত্রশিল্পের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন না। স্থাপত্য ছিল তাঁহার নেশা। উৎসাহের অভাবে এই সময় হইতে মুঘল চিত্রকলার উন্নতি ব্যাহত হয়। আরঙ্গজেব চিত্রশিল্পের বিরোধিতা করেন।

চিত্রকলা

আরঙ্গজেব ছাড়া আর সকল মুঘল সম্রাট সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান সঙ্গীত ভালবাসিতেন। ইঁহারা সঙ্গীত শিল্পীদের সমাদর করিতেন। আবুল ফজল লিখিয়াছেন আকবরের সভায় ছত্রিশজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সঙ্গীতকার তানসেন ও বাজবাহাদুর ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান। বাবা রামদাস, সুরদাস, বৈজুবাওরা, জাহাঙ্গীরদাদ, হামজান, সুখসেন, সুরসেন, লালখান ও দুরাঙ্গখান ছিলেন মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার। সঙ্গীতচর্চার সহিত এই যুগে নৃত্য শিল্পেরও উন্নতি ঘটিয়াছিল।

সঙ্গীত ও নৃত্য

তৈমুরবংশীয় শাসকগণ সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। বাবর ও জাহাঙ্গীর আত্মজীবনী লেখেন। বাবর-কন্যা গুলবদন বেগম রচনা করেন হুমায়ুনের জীবনী। মুঘল যুগে ফার্সী, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য, কাব্য ও ইতিহাস রচনা করা হয়। ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ইতিহাসই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আবুল ফজলের 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী', বদায়ুনীর 'মুন্তাখাব-উৎ-তাওয়ারিখ', ফৈজী সরহিন্দীর 'আকবর নামা', আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'পাদশাহনামা', কাফী খানের 'মুন্তাখাব-উৎ-লুবাব', ঈশ্বরদাসের 'ফুতুহাত-ই-আলমগিরী' ও ভীমসেনের 'নুস্‌কা-ই-দিলকুসা' মুঘলযুগের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। এই গ্রন্থগুলিতে বাবর হইতে আরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্রাটগণের শাসনকালের পরিচয় পাওয়া যায়। মুঘলযুগে রামায়ণ, মহাভারত ও অথর্ববেদের ফার্সীভাষায় অনুবাদ হয়। শাহ্‌জাহান-পুত্র দারাশিকো গীতা ও উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ করান। মুঘলযুগে ফার্সী কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন ফৈজী, গিজালী ও উরফি। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নুরজাহান কবিতার অনুরাগী ছিলেন। শাহজাহান-কন্যা জাহানারা ও আরঙ্গজেব-দুহিতা জেবুন্নিসা কবিতা লিখিতেন।

ফার্সী সাহিত্য

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মুঘল সম্রাটদের আনুকূল্যে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি হয়। আকবর হিন্দী কাব্য ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। আকবরের সভাসদ

বীরবল ও মানসিংহ হিন্দীতে কবিতা লিখিতেন। আব্দুর রহিম খান-ই-খানান, নরহরি, হরিনাথ, নন্দদাস, বিত্থলনাথ, পরমানন্দদাস ও কুম্ভনদাস মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দী সাহিত্যিক। মালিক মহম্মদ জ্যায়সী হিন্দীতে 'পদ্মাবত' কাব্য রচনা করেন। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' ও সুরদাসের ভজনসংগ্রহ 'সুরসাগর' এই যুগের রচনা। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্য রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন। সুন্দর কবিরায় ('সুন্দর শৃঙ্গার'), কবীন্দ্র আচার্য ('কবীন্দ্র কল্পতরু'), সেনাপতি ('কবিতা রত্নাকর'), সুরাজ সিংহ, বিষাণদাস, মনোহরলাল, শিরোমণি মিশ্র ও বারাণসীদাস প্রভৃতি হিন্দী কবি ও সাহিত্যিকগণ ইঁহাদের উৎসাহ লাভ করেন। মুঘল যুগে হিন্দী সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত ও উর্দু সাহিত্যের উন্নতি হয়। আবুল ফজল লিখিয়াছেন অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত আকবরের আনুকূল্য লাভ করেন। মহেশঠাকুর, পদ্মসুন্দর, সিদ্ধচন্দ্র উপাধ্যায়, কবীন্দ্র আচার্য সরস্বতী, পণ্ডিত জগন্নাথ মুঘল যুগের খ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিত। মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-১৭৪৮) উর্দু সাহিত্যের প্রচার ও উন্নতির চেষ্টা করেন। উপরি-উক্ত ভাষাগুলি ছাড়া মুঘল যুগে বাংলা, গুজরাতী, তামিল তেলেগু, মারাঠী ও পাঞ্জাবী ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সুফী সাধক ও ভক্তি আন্দোলনের প্রচারকগণ প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ধর্ম আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার ফলে এইগুলির বিশেষ উন্নতি ঘটে।

হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দু ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য

আরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শুরু হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান পর্যন্ত মুঘল শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নতি ব্যাহত হয়। সম্রাট আরঙ্গজেব চিত্রকলা ও সঙ্গীতের বিরোধিতা করেন। স্থাপত্য ও সাহিত্যেরও তিনি বিশেষ সমাদর করেন নাই। মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন শুরু হইলে প্রাদেশিক শাসকগণ কাব্য, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। জয়পুর, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও বাংলায় নূতন প্রাদেশিক সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। স্থানীয়-রীতির সহিত মুঘল-রীতির সংমিশ্রণে নূতন নূতন শৈলী গড়িয়া উঠে। কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও চিত্রকলার নিজস্ব রীতি ও শৈলী সমৃদ্ধ প্রাদেশিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়।

বিশিষ্ট প্রাদেশিক সংস্কৃতির উদ্ভব

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ**—(ক) তাজমহল নির্মাণে প্রধান শিল্পী কে ছিলেন ? (খ) দেওয়ানী-ই আম ও দেওয়ানী-ই খাস কোথায় অবস্থিত ? (গ) ফতেপুরসিক্রি কাহার আমলে নির্মিত হয় ? (ঘ) ময়ূর সিংহাসন কাহার রাজত্বকালে নির্মিত হয় ? (ঙ) আকবরের সমাধি কোথায় ? (চ) আবদুস সামাদ কে ছিলেন ? (ছ) মুঘল যুগের পাঁচজন চিত্র শিল্পীর নাম কর। (জ) মুঘল যুগের শেষদিকে যে প্রাদেশিক শিল্প ও সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠে তাহাদের নাম কর। (ঝ) সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত দুইটি বিখ্যাত স্থাপত্যকর্মের নাম কর।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**—(ক) মুঘল শাসকগণ দেশে কিরূপে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ? (খ) মুঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (গ) মুঘল যুগে জায়গীরদারী ব্যবস্থায় কি ধরনের সঙ্কট দেখা দেয় ? (ঘ) মুঘল স্থাপত্য-শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ঙ) মুঘল যুগের চিত্রকলার পরিচয় দাও। (চ) মুঘল যুগে সাহিত্যের অগ্রগতির উপর একটি প্রবন্ধ লিখ।

৩। **বিশদ ভাবে আলোচনা কর ঃ**—(ক) মুঘল শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও। (খ) মুঘল যুগে গ্রামীণ ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল ? বিদেশীদের অভিমতসহ আলোচনা কর। (গ) মুঘল যুগের শিল্প ও বাণিজ্যের পরিচয় দাও।

৪। **টীকা লিখ ঃ**—(ক) নাসাক (খ) বাঁটাই (গ) নিজামত ও দেওয়ানী (ঘ) মুঘল যুগের উর্দু সাহিত্য (ঙ) সংস্কৃতচর্চা (চ) উর্দু সাহিত্যের উন্নতি।

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**—(ক) সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় মুঘল সাম্রাজ্য-বিস্তার — হয়। (খ) চরিত্রে মুঘল শাসনব্যবস্থা ছিল আরব-পারস্য শাসনব্যবস্থার —। (গ) মুঘল যুগে দেশের সমস্ত জমি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল —। (ঘ) র‍্যালফ ফিচ — রাজত্বকালে ভারতে আসেন। (ঙ) বিরজী বোহরা ছিলেন — ধনী বণিক। (চ) চেহেল স্তুন — অবস্থিত।

৬। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও ঃ**—(ক) জাহাঙ্গীর / শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মুঘল চিত্রকলার উন্নতি হয়। (খ) শাহ্‌জাহান / আরঙ্গজেব কন্যা জাহানারা কবিতা লিখিতেন। (গ) শাহ্‌জাহান পুত্র দারাশিকো / সুজা / মুরাদ গীতা ও উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ করান। (ঘ) ফুতুহাত-ই-আলমগিরী ঈশ্বরদাস / ভীমসেন রচনা করেন। (ঙ) নুসকা ই-দিলকুসা ঈশ্বরদাস / ভীমসেন রচিত আরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস। (চ) দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস জাহাঙ্গীরের / শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। (ছ) মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌ / আহম্মদ শাহ্‌ উর্দু সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

(Decline and disintegration of the Mughal Empire)

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঃ

ইতিহাসে কোন সাম্রাজ্যকে চিরস্থায়ী হইতে দেখা যায় না। বিশাল ও শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অনেক পণ্ডিত মনে করেন[১] মানুষের মত সাম্রাজ্য ও সভ্যতার জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। প্রাকৃতিক নিয়মের মত নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে, বিস্তৃত হয় এবং পরে এক সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে। মুঘল সাম্রাজ্য এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ইহাও একদিন ধ্বংস হইয়া যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাখ্যা লইয়া আধুনিককালে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ভারতীয় সমাজের নৈতিক অধঃপতনই প্রধানত দায়ী ছিল। রাজতন্ত্র, অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের নৈতিক অবক্ষয় সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। সতীশচন্দ্র, ইরফান হাবিব ও নোমান আহমদ সিদ্দিকী প্রভৃতি ঐতিহাসিক-গণ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ইহার অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে প্রধানত দায়ী করিয়াছেন। মুঘল জাগীরদাররা সাম্রাজ্যের রাজস্বের 'সিংহভাগ' দখল করিয়া লয়। অথচ তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব তাহারা যথাযথভাবে পালন করিত না। মুঘল সম্রাটগণ তাহাদের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ও কৃষককে ইহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইয়া নূতন আয়ের উৎস সৃষ্টি করিতেও তাঁহারা ব্যর্থ হন। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দৈন্য ইহার পতনকে তরান্বিত করে। এই দুইটি কারণকে প্রাধান্য দিয়াও বলা যায় মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আরও অনেক কারণ দায়ী ছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ

শাহ্‌জাহান ছিলেন জাঁকজমক ও আড়ম্বরপ্রিয় সম্রাট। বিলাস-ব্যসনের জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। দিল্লীর লালকেল্লা, জামি মস্‌জিদ, আগ্রার মোতি মস্‌জিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস ও বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল তাঁহার রাজত্বকালে নির্মিত হয়। এগুলি ছাড়া শাহ্‌জাহান লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর ও আজমীরে আরও অনেক প্রাসাদ, মস্‌জিদ ও সৌধ নির্মাণ করেন। মণিমুক্তা-খচিত ময়ূর সিংহাসনও তাঁহার আমলে নির্মিত হয়। সম্রাট সঙ্গীত ভালবাসিতেন। এজন্যও তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিজাত শ্রেণী বিলাস-ব্যসনে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া উঠে। ইহার ফল হয় মারাত্মক। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে সামরিক দুর্বলতা দেখা দেয়। সম্রাট বারবার অভিযান পাঠাইয়া পারস্যের নিকট

শাহজাহানের জাঁকজমক প্রিয়তা—পতনের সূত্রপাত

---

(১) আরব ঐতিহাসিক ইবন্‌ খলদুন, জার্মান ঐতিহাসিক ওসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্ণল্ড টয়েনবী।

হইতে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হন। সম্রাটের জাঁকজমক ও আড়ম্বরের ব্যয় মিটাইবার জন্য কৃষক ও শ্রমিকদের উপর নূতন কর স্থাপিত হয়। সংগৃহীত অর্থ সম্রাটের বিলাস-ব্যসনে, দরবারের জাঁকজমক ও অভিজাতদের বিলাসিতায় ব্যয় হয়। তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সম্রাট দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে, শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে রাজসভার ঐশ্বর্য, আড়ম্বর ও জাঁকজমক আমাদের বিভ্রান্ত করে। আপাত সমৃদ্ধির অন্তরালে বহুক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্যতা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই যুগে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়।

আরঙ্গজেবের সময়ে পতনের সূচনা

সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিক হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। তাঁহার মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, হিন্দুমন্দিরের উপর আক্রমণ, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ও অন্যান্য বিধি-নিষেধ স্থাপন দেশের মধ্যে বিভেদ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতিতে ফাটল ধরে। তাঁহার রাজপুত, মারাঠা ও দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে টানিয়া লয়। জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসর (১৬৮২-১৭০৭) আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে সুলতানী রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় ও মারাঠাদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি মারাঠাদের সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন নাই। কার্যতঃ তাঁহার মারাঠা-নীতি ব্যর্থ হয়। আরঙ্গজেবের অনুদার ও অদূরদর্শী রাষ্ট্রনীতি রাজপুত, জাঠ, বুন্দেলা ও সৎনামীদের মুঘল সাম্রাজ্যের শত্রুতে পরিণত করে। উত্তর ভারতে তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতি সাম্রাজ্যের প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হয় অথচ ঐ অঞ্চল হইতে রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয়। উত্তর ভারতে প্রশাসনিক অব্যবস্থার জন্য ঠিকমত রাজস্ব আদায় হইত না। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা দিত না। শুধু বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত পাঠাইতেন।

ভূমি রাজস্ব ও জাগীর ব্যবস্থায় সংকট

ভূমি-রাজস্ব ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস। মুঘল যুগের শেষদিকে অভিজাত শ্রেণী সম্রাটদের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া নূতন নূতন জাগীর সৃষ্টি করিতে বাধ্য করে। অভিজাত শ্রেণীর সংখ্যা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ইহার আসল কারণ। নূতন জাগীর সৃষ্টির ফলে রাষ্ট্রের 'খালসা' বা খাস জমির পরিমাণ ও আয় দুইই কমিয়া যায়। অপরদিকে জাগীরদাররা নিজেদের আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের উপর নূতন নূতন কর আরোপ ও উৎপীড়ন শুরু করে। জাগীরগুলি বংশানুক্রমিক করিবার চেষ্টা হয়। মুঘল ভূমি-রাজস্বের নিয়ম-রীতি ভঙ্গ করা হয়। অনেক সময় ইজারাদারদের মাধ্যমে জাগীর ও খালসা জমি হইতে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত। করভারে পিষ্ট ও অন্যান্য নানাভাবে উৎপীড়িত কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। দেশে সম্পদের প্রধান উৎস কৃষি ও কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে।

স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুঘল অভিজাতশ্রেণীর নৈতিক অধঃপতন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী। অভিজাতশ্রেণী মুঘল

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বিস্তার ও প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে যে যোগ্য ব্যক্তিত্বের অভাব দেখা দিয়াছিল তাহা নয়; অভিজাতশ্রেণীর মানসিকতা ও চরিত্রে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এই যুগে মুঘল অভিজাতগণ রাষ্ট্র বা মুঘল রাজবংশের স্বার্থের কথা চিন্তা করিত না। তাহাদের লক্ষ্য হয় নিজেদের গোষ্ঠী বা উপদলের স্বার্থপূরণ। দলাদলি ও চক্রান্ত ইহাদের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বার্থপর এই অভিজাতশ্রেণী সাম্রাজ্যের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া লাভজনক জাগীরগুলি দখল করিবার জন্য তৎপর হয়। অভিজাতদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র ও কলহ প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করিয়া দেয়।[১]

মুঘল অভিজাত শ্রেণীর অবনতি

আরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ সকলেই ছিলেন অপদার্থ, দুর্বল, আরামপ্রিয় ও বিলাসী। একমাত্র আরঙ্গজেব-পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১২) কিছুটা যোগ্যতার পরিচয় দেন। জাহান্দার শাহ (১৭১২-১৩), ফারুখশিয়ার (১৭১৩-১৭১৯), মুহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮), আহমদ শাহ (১৭৪৮-৫৪), দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯) ও দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) কেহই যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। দুর্বল সম্রাটগণের রাজত্বকালে শক্তিশালী অভিজাতশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা করিতে থাকে। মুঘল রাজবংশে নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার আইন ছিল না। সম্রাটের মৃত্যুর পর পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার লইয়া লড়াই বাধিত। আরঙ্গজেব পর্যন্ত যোগ্য মুঘল সম্রাটগণ ক্ষমতা দখল করিবার পর অভিজাতদের আধিপত্য খর্ব করিতে পারেন। আরঙ্গজেবের পরে দুর্বল সম্রাটগণ উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধে সাহায্যের বিনিময়ে অভিজাতদের হাতে 'পুতুল সম্রাটে' পরিণত হন।

আরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণের দুর্বলতা ও উত্তরাধিকার যুদ্ধ

মুঘল যুগের শেষ পর্বে অভিজাতগণ ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও কুক্ষিগত করিবার প্রচেষ্টা চালায়। এইগুলিকে আধুনিক রাজনৈতিক দলের সহিত তুলনা করা যায় না। দেশ বা রাষ্ট্রের নয়, দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থপূরণ ছিল ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্ম ও জাতিগত বন্ধন থাকিলেও, ধর্ম ও জাতির বাহিরের লোকও এই দলগুলিতে স্থান পাইত।[২] জনমানসে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা কাজে লাগাইবার জন্য ইহারা মুঘল রাজবংশের একজনকে সিংহাসনে বসাইত। আসল রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে এই রকম মোট চারটি দল বা গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়: (১) আরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত উজীর আসাদ খান ও তাঁহার পুত্র জুলফিকার

রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি

(১) 'The Mughal Empire fell because of the rottenness at the core of Indian society. This rottenness showed itself in the shape of military and political helplessness. The country could not defend itself; the royalty was hopelessly depraved and imbecile; the nobles were selfish and short-sighted; corruption, inefficiency and treachery disgraced all branches of the public service.' J. N. Sarkar, Fall of the Mughal Empire, Vol IV.

(২) Satish Chandra, Parties and Politics at the Mughal court.

খান ছিলেন ইরানী দলের নেতা। ১৭০৭-১৭১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ইঁহারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া রাখিতে সক্ষম হন। (২) ১৭১৩ খ্রীঃ ইঁহাদের সরাইয়া হিন্দুস্তানী দলের নেতা সৈয়দবংশীয় আবদুল্লা খান ও হোসেন আলি ক্ষমতা দখল করেন। ইঁহারা ইতিহাসে 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়' নামে পরিচিত। এদেশীয় মুসলিম, আফগান ও হিন্দুদের লইয়া তাহাদের দল গড়িয়া উঠে। (৩) ১৭২০ খ্রীঃ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন ঘটাইয়া তুরানী দলের নেতা চিন কিলিচ খান (নিজাম-উল-মুল্‌ক) ও আমিন খান ক্ষমতা হাতে নেন। (৪) নাদির শাহের ভারত আক্রমণের পর (১৫৩৯) এই দেশে একটি আফগান গোষ্ঠীও গড়িয়া উঠে। আহমদ শাহ্‌ আবদালীর বারংবার ভারত আক্রমণে এই দল পুষ্টি লাভ করে। নাজিবুদ্দৌলা ছিলেন এই দলের নেতা।

মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন ছিল কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী ব্যবস্থা। এই রকম শাসনব্যবস্থায় সম্রাটের যোগ্যতার উপর দেশের ঐক্য, সংহতি ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে। আরঙ্গজেবের দুর্বল বংশধরদের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন শাসনব্যবস্থার পত্তন করেন। কেন্দ্রীয় শাসন বা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য নষ্ট হয়। বাংলা, অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদ স্বাধীন হইয়া যায়। মারাঠা, রাজপুত ও শিখগণ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। মুঘল সাম্রাজ্য দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। ১৮০৩ খ্রীঃ ইংরেজগণ যখন দিল্লী অধিকার করেন তখন বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক ছিলেন।

সাম্রাজ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা

যুগে যুগে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা ভারতে বিদেশী আক্রমণকারীদের আকৃষ্ট করিয়াছে। মুঘল সম্রাটগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে পারস্য কর্তৃক কান্দাহার জয়ের পর ভারত ও পারস্যের মধ্যে প্রাকৃতিক ব্যবধান দূর হয়। ইহার পর পারস্যের পক্ষে ভারত আক্রমণ সহজ হয়। ভারতের ধনসম্পদের খ্যাতি পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্‌কে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করে। তিনি ভারতের রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতার সংবাদ রাখিতেন। ১৭৩৮ খ্রীঃ নাদির শাহ্‌ গজনী, কাবুল ও লাহোর অধিকার করিয়া লন। পরের বৎসর কর্ণালের যুদ্ধে (১৭৩৯) মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌কে পরাস্ত করিয়া তিনি দিল্লী দখল করেন। দিল্লীর ক্রুদ্ধ জনতার হাতে তাঁহার কয়েকজন সৈনিকের মৃত্যু ঘটিলে নাদির নির্বিচারে দিল্লীর অধিবাসীদের হত্যার নির্দেশ দেন। দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া প্রায় সত্তর কোটি টাকা, মণিমাণিক্য-খচিত ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনুর মণি লইয়া নাদির শাহ্‌ পারস্যে ফিরিয়া যান। আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব দিল্লীর হস্তচ্যুত হয়। নাদির শাহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার সেনাপতি ও আফগানিস্তানের শাসক আহম্মদ শাহ্‌ আবদালী ১৭৪৮-১৭৬৭ খ্রীঃ মধ্যে বারবার উত্তর ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন।

নাদির শাহ্‌ ও আহমদ শাহ্‌ আবদালীর ভারত আক্রমণ—১৭৩৯-১৭৬৭

বৈদেশিক আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হইয়া পড়ে। দেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়। রাজকোষে শূন্যতা দেখা দেয়। মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতা দেশীয় ও বিদেশী শক্তিগুলিকে নূতন উৎসাহ জোগায়। মারাঠারা সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়। রাজপুত, শিখ ও জাঠ

জাতিগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে অনুপ্রেরণা লাভ করে। বিদেশী ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীগণও মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্দশা দেখিয়া রাজ্য স্থাপনের কথা ভাবিতে থাকে। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আহম্মদ শাহ্ আবদালীর বারংবার আক্রমণে উত্তর ভারতের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে।

বৈদেশিক আক্রমণের ফলাফল

উইলিয়ম আরভিন (W. Irvine) মন্তব্য করিয়াছেন যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ইহার ত্রুটিপূর্ণ সামরিক সংগঠন ও দুর্বল সৈন্যবাহিনী অনেকখানি দায়ী ছিল।[১] বিশাল, মন্থরগতি মুঘল সৈনাবাহিনী ছিল নানা ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত। মনসবদারী ব্যবস্থার উপর মুঘল সৈন্যবাহিনী প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুঘল শাসনের শেষদিকে এই ব্যবস্থায় নানা অসঙ্গতি দেখা দেয়। সম্রাট ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়িয়া উঠে। সৈন্যবাহিনীর নিয়োগ, শিক্ষা, বেতন ও শৃংখলা ক্ষেত্রে নানারকম দুর্নীতি ও দুর্বলতা প্রবেশ করে। আরভিন শেষদিকের মুঘল সৈন্যবাহিনীর চরিত্র বিচার করিয়া ইহাকে 'একটি চলমান বাজার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গতিহীন, দুর্বল ও বিশৃংখল এই সৈন্যবাহিনী দ্রুতগতিসম্পন্ন মারাঠা অশ্বারোহী বা আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র-সজ্জিত বিদেশীদের মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু, মুঘল সম্রাটগণ তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত ভারতবর্ষের বিশাল উপকূল ভাগ রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ইহার রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য অনুধাবন করিবার মত রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তাহাদের ছিল না। আধুনিক নৌবিদ্যায় পারদর্শী ইউরোপীয় জাতিগুলি ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে—সুরাট, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা—ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। মুঘল নৌশক্তির ইহাদের বাধাদানের সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং বলা যায় মুঘলদের সামরিক ব্যর্থতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল।

সামরিক ত্রুটি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব

(Growth of Regional Powers)

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মুঘল অনুকরণে অনেকগুলি আঞ্চলিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। এইগুলির কয়েকটি মুঘল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কেন্দ্রীয় শাসন অগ্রাহ্য করিবার ফলে স্থাপিত হয়। হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা ও বাংলা এই রকম আঞ্চলিক স্বাধীন রাষ্ট্র। অপরগুলি বিদ্রোহের ফলে সৃষ্টি হয়। মারাঠা ও শিখ রাজ্য দুইটি মুঘলশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের ফল বলা যাইতে পারে। এইসব রাষ্ট্র পরবর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তারে বাধাদান করিয়াছিল।

(১) William Irvine, Army of the Indian Mughals.

হায়দ্রাবাদ ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে নিজাম-উল-মুল্‌ক ছিলেন একজন বিশিষ্ট ওমরাহ্‌। তুরানী দলের নেতা হিসাবে তিনি ও আমিন খান মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহের সহায়তায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন ঘটান। সৈয়দদের পতনের পর সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌ নিজামকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার বিরোধী আমীরদের পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭২২—১৭২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত নিজাম-উল-মুল্‌ক মুঘল সাম্রাজ্যের উজীর বা প্রধানমন্ত্রীর পদেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অভিজাতগণের ষড়যন্ত্রে এবং সম্রাটের অপদার্থতায় তাঁহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উত্তর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া নিজাম দাক্ষিণাত্যে চলিয়া আসেন। এইখানে তিনি **হায়দ্রাবাদ রাজ্যের** প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ শক্তিকে সংহত করিয়া ১৭২৪ খ্রীঃ তিনি দাক্ষিণাত্যের মুঘল রাজপ্রতিনিধি মুবারিজ খানকে পরাজিত ও নিহত করেন। সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌ নিজামকে দাক্ষিণাত্যের মুঘল রাজপ্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তাঁহাকে আসফজা উপাধিও দেওয়া হয়। কার্যতঃ ঐ সময় হইতে হায়দ্রাবাদে নিজামশাহী বংশের অধীনে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। নিজাম-উল-মুল্‌ক কখনও প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই। তবে শাসন পরিচালনায় তিনি পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁহাকে স্বাধীন শাসক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নিজাম দাক্ষিণাত্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কাফী খান তাঁহার শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের জমিদার ও জাগীরদারদের পরাস্ত করিয়া নিজাম নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। শক্তিশালী মারাঠাদের আক্রমণ তিনি প্রতিহত করিতে সক্ষম হন। দেশের রাজস্বব্যবস্থায় দুর্নীতি দূর করিবার জন্য তিনি চেষ্টা চালাইয়া যান। শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ করিতেন না।

নিজামের রাজত্বের শেষদিকে দাক্ষিণাত্যেও মুঘল শাসনের সমস্ত কুফলগুলি একে একে দেখা দিতে থাকে। আমীর ও অভিজাতদের কলহ ও রাজপুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব শুরু হয়। নিজামের অধীনস্থ কর্ণাটকের নবাব কার্যতঃ স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৪৮ খ্রীঃ হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হইলে ঐ রাজ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দেয়। কর্ণাটকেও ঐ একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিদেশী ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানীগুলি ভারতীয় রাজনীতির এই দুর্বলতাকে নিজেদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে মনস্থ করে। দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে ইউরোপীয় অনুপ্রবেশের দুয়ার উন্মুক্ত হয়।

অযোধ্যা ঃ স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাদাত খান। তাঁহার উপাধি ছিল বুরহানমুল্‌ক। ১৭২২ খ্রীঃ তিনি অযোধ্যার সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ঐ সময় অযোধ্যা অঞ্চলের জমিদারগণ বিদ্রোহ করেন। সাদাত খান সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। সাদাত খান ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া রাজকোষে আয় বাড়ান। প্রজাদের দেয় খাজনা তিনি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ইহাতে দরিদ্র প্রজারা জমিদারদের অত্যাচার হইতে রেহাই পায়। ক্রমশঃ কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটিতে থাকে। বলা

যায় তাঁহার ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তে দেশে সুখ ও শান্তি ফিরিয়া আসে। নবাব সাদাত খান ছিলেন সাহসী, উদ্যমী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি দেশে এক দক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে সক্ষম হন। তিনি প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। মুঘল সম্রাট তাঁহার শাসনে হস্তক্ষেপ করিতেন না। অযোধ্যার নবাবী তাঁহার বংশধরদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যায়। সাদাত খান একটি সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীও গঠন করেন। মুঘলযুগের শেষ পর্বে এইটাই ছিল সেরা বাহিনী। শাসনব্যবস্থায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের সমান অধিকার দিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না।

১৭৩৯ খ্রীঃ সাদাত খানের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সফদর জঙ্গ অযোধ্যার নবাব হন। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের উজীর বা প্রধানমন্ত্রীর পদটিও লাভ করেন। এই সূত্রে এলাহাবাদ প্রদেশটি অযোধ্যার সহিত যুক্ত হয়। ১৭৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সফদর জঙ্গ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দেশে সুখ ও শান্তি অব্যাহত ছিল। তিনি উত্তর প্রদেশের শক্তিশালী জমিদার, রোহিলা ও বাঙ্গাশ পাঠানদের পরাস্ত করিয়া দেশে শান্তি বজায় রাখেন। মারাঠা রাষ্ট্রনায়কদের সহিত তিনি যে বোঝাপড়া করেন তাহার ফলে অযোধ্যা মারাঠা আক্রমণ হইতে রেহাই পায়। মুঘল সাম্রাজ্যকে আহম্মদ শাহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি পেশোয়ার সহিত এক গোপন চুক্তি করেন। তাঁহার বিরোধী গোষ্ঠীর সহিত পেশোয়া যোগ দেওয়ায় এই চুক্তি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। নবাব সফদর জঙ্গ তাঁহার রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনব্যবস্থায় উদার ও সহিষ্ণুতার নীতি অনুসৃত হয়। শাসনব্যবস্থা ও সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি পাইত। সফদর জঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দোলা অযোধ্যার নবাব হন। তিনি ১৭৭৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের উজীরের পদটিও নিজের হাতে রাখেন। তবে এ পদের কোন কার্যকরী ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার সময়ে অযোধ্যার নবাব বংশকে কেন্দ্র করিয়া রাজধানী লক্ষ্মৌতে মুঘল সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক যথা—সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প চর্চা ইত্যাদি চলিতে থাকে।

বাংলা ঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিলে বাংলা কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া যায়। বাংলার স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭)। ১৭০০ খ্রীঃ সম্রাট আরঙ্গজেব কর্তৃক দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া তিনি বাংলায় আসেন। তখন ঢাকা ছিল বাংলার রাজধানী। ঐ সময় হইতে তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলার প্রধান শাসক। ১৭১৭ খ্রীঃ তিনি বাংলার সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মুর্শিদকুলী কখনও প্রকাশ্যে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন নাই। তিনি নিয়মিত সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠাইতেন। তবে তিনি বাংলায় বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তাঁহার পর হইতে বাংলার নবাবরা প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দিন খানও (১৭২৭-৩৯) দিল্লীর রাজস্ব পাঠাইতেন। তবে সুজাউদ্দিনের পর সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০), আলিবর্দী (১৭৪০-৫৬) ও সিরাজুদ্দোলা (১৭৫৬-৫৭) কেহই দিল্লীর রাজস্ব পাঠান নাই।

নবাব মুর্শিদকুলী খান ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদের পরাস্ত করিয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী বাংলাদেশে জমি জরীপ করাইয়া ভূমি-রাজস্বের বিস্তৃত হিসাব বা 'হস্তবুদ' তৈয়ারী করেন। মুর্শিদকুলীর নূতন ভূমি বন্দোবস্তে (১৭২২) খালসা বা খাস জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। জাগীরের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহাতে রাষ্ট্রের আয় বাড়িয়া যায়। জমিদার ও ইজারাদাররা হস্তবুদ অনুযায়ী ভূমি-রাজস্ব-আদায় করিত। তাঁহার সময়ে বাংলায় কয়েকটি নূতন জমিদারীর প্রতিষ্ঠা হয়। ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলী ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তাঁহার শাসনকালে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। তিনি বহু হিন্দুকে শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন।

মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলার নবাব হন। তিনি বার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে তাঁহার শাসনকালে দেশে সুখ ও সমৃদ্ধি দেখা দেয়।[১] পরবর্তীকালে জন শোর এই মতকে সমর্থন করিয়াছেন। সুজাউদ্দিন ছিলেন একজন সুশাসক ও ন্যায় বিচারক। ১৭৩৯ খ্রীঃ নবাব সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাবী লাভ করেন। সরফরাজ খান ছিলেন গোঁড়া, ধর্মভীরু মানুষ এবং রাজকার্যে উদাসীন। ১৭৪০ খ্রীঃ গিরিয়ার যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বিহারের শাসক আলিবর্দী খান বাংলার নবাব হন। আলিবর্দীর সময়ে সবচেয়ে বড় ঘটনা হইল বাংলাদেশে মারাঠা বা বর্গী আক্রমণ (১৭৪২-১৭৫১)। দীর্ঘ নয় বৎসর ধরিয়া আলিবর্দী অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তিনি একজন সাহসী, দক্ষ, উদ্যমী শাসক ও সেনানায়ক ছিলেন। মারাঠা আক্রমণের অবসানে তিনি দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নের চেষ্টা করেন। তবে বাংলার নবাবগণ বিদেশী ইউরোপীয় বণিকদের চরিত্র ও কার্যক্রম বুঝিতে পারেন নাই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির তাঁহারা খোঁজ-খবর রাখিতেন না। বিদেশী কোম্পানীগুলি যে শুধু বাণিজ্যিক সংস্থা নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিনিধি ইহা তাঁহারা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর পরে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌল্লা বাংলার নবাব হন। নবাব হিসাবে সিরাজ ছিলেন দুর্বল ও অস্থির চিত্ত। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সেনাপতিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে। বাংলাদেশে ইংরেজদের ক্ষমতালাভের পথ উন্মুক্ত হয়।

মহীশূর ঃ অষ্টাদশ শতকে দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদের পাশাপাশি অপর যে রাজ্যটি স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে সেটি হইল মহীশূর। হায়দার আলি স্বাধীন ও শক্তিশালী মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ১৬১২ খ্রীঃ হিন্দু রাজবংশের অধীনে মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর

(১) গোলাম হোসেন, সিয়ার মুতাক্ষরীণ।

দুইজন মন্ত্রী নানজরাজ ও দেবরাজ রাজা চিক্কা কৃষ্ণরাজকে প্রায় 'পুতুল রাজায়' পরিণত করেন। আসল রাষ্ট্রক্ষমতা এঁদের হস্তগত হয়। হায়দার আলি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লেখা-পড়া না শিখিলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। সাহসী, দক্ষ ও রণকুশল হায়দার মহীশূর সৈন্যবাহিনীতে চাকুরি নেন এবং দ্রুত উন্নতি করেন।

মহীশূরের রাজনীতি তখন অস্থির। হায়দার প্রথমদিকে নানজরাজের পক্ষে যোগ দেন। হায়দারের সহায়তায় নানজরাজ মহীশূর রাজ্যের সর্বাধিকারী হন। হায়দার ক্রমশঃ সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদে উঠেন। পাশ্চাত্য রণকৌশল আয়ত্ত করিয়া তিনি মহীশূরের সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। ১৭৬১ খ্রীঃ নানজরাজকে পরাজিত করিয়া হায়দার মহীশূর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে অস্থিরতার সুযোগ লইয়া সুচতুর হায়দার একে একে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি দখল করিয়া নেন। বিদনুর, সুণ্ডা, সেরা, কানাড়া ও মালাবার অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। অভ্যন্তরীণ কলহে দুর্বল ও বিশৃঙ্খল একটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে হায়দার অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি সুগঠিত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

ক্ষমতা দখলের পর হায়দার আলিকে মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজদের সহিত লড়াই করিতে হয়। কূটকৌশলী হায়দার কখনও একাকী তিন শক্তির সহিত লড়াই করেন নাই। তিনি মারাঠাদের সহিত সন্ধি করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। প্রথম মহীশূর যুদ্ধে (১৭৬৭-৬৯) ইংরেজরা তাঁহার নিকট পরাস্ত হয়। ১৭৮২ খ্রীঃ দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ চলাকালীন হায়দার আলির মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র টিপু মহীশূরের সুলতান হন। ১৭৯৯ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত টিপু ইংরেজদের বিরোধিতা করিয়া যান। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে একমাত্র টিপু সুলতানই ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সৈন্যবাহিনীর সংস্কার ও নৌবহর গঠন তাঁহার অপর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য টিপু আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ফ্রান্স, তুরস্ক, ইরান ও পেগুতে তিনি রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন। স্যার জন শোর মন্তব্য করিয়াছেন যে 'টিপুর রাজ্য মধ্যে প্রজাবৃন্দের স্বার্থ ছিল সুরক্ষিত, কাজ করিতে তাহারা উৎসাহিত হয় কারণ শ্রমের ফল তাহারা ভোগ করিতে পায়'।

শিখরাজ্য ঃ পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে গুরু নানকদেব (১৪৬৯-১৫৩৮) শিখধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমত পাঞ্জাবের জাঠ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হয়। তাঁহার প্রচারিত ঈশ্বর ভক্তি, প্রেম, দয়া ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শে পাঞ্জাব অঞ্চলের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। গুরু নানকদেবসহ দশজন শিখগুরু শিখধর্মকে কেন্দ্র করিয়া নূতন জাতি ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। নানকদেবের পরবর্তীকালের তিনজন গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২),

অমরদাস (১৫৫২-৭৪) ও রামদাস (১৫৭৪-৮১) ছিলেন নির্বাচিত। গুরু রামদাসের সময় হইতে গুরুপদ বংশানুক্রমিক হইয়া যায়। সম্রাট আকবর শিখগুরুদের সম্মান করিতেন। তিনি গুরু রামদাসকে শিখ স্বর্ণমন্দির নির্মাণের জন্য অমৃতসরে জমিদান করেন। ইহার উপর পরবর্তীকালের শিখ স্বর্ণমন্দির নির্মিত হয়। পঞ্চম গুরু অর্জুনমল (১৫৮১—১৬০৬) ছিলেন দক্ষ সংগঠক। তাঁহার সময়ে শিখগণ সংখ্যা ও শক্তিতে বাড়িয়া উঠে। পাঞ্জাবের সর্বত্র শিখগণ ছড়াইয়া পড়ে। গুরু অর্জুন শিখদের ধর্মগ্রন্থ আদিগ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেব সংকলন করেন। শিখদের ধর্মীয় আচরণ ও রীতি-নীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি 'শিখ সঙ্গত' ও ধর্মীয় কর স্থাপন করিয়া শিখ ধর্মীয় রাষ্ট্রের সূত্রপাত করিয়া যান। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইলে গুরু অর্জুন তাঁহাকে সাহায্য দেন। এই অপরাধে জাহাঙ্গীর গুরু অর্জুনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বলাবাহুল্য, ইহাতে শিখগণ ক্ষুব্ধ হয়। অর্জুনের পুত্র গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫) শিখদের সামরিক মন্ত্রে সঞ্জীবিত করেন।[১] তিনি নিজে একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। গুরু হরগোবিন্দ মুঘল সৈন্যবাহিনীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই সময় হইতে মুঘল-শিখ সংঘর্ষের শুরু হয়। পরবর্তী গুরু হররায় (১৬৪৫-৬১) ও হরকিষাণের (১৬৬১-৬৪) সময়ে মুঘলদের সহিত শিখদের বড় রকমের সংঘর্ষ দেখা দেয় নাই। নবম গুরু তেগবাহাদুর (১৬৬৪-৭৫) প্রকাশ্যে আরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ-নীতির বিরোধিতা করেন। আরঙ্গজেব তেগবাহাদুরকে বন্দী করিয়া ইসলামধর্ম অথবা মৃত্যুকে বাছিয়া লইতে বলেন। গুরু 'শির' দিলেন, কিন্তু 'সর' বা ধর্ম দিলেন না (শির দিয়া, সর না দিয়া)।

তেগবাহাদুরের আত্মত্যাগ শিখজাতিকে এক ঐক্যবদ্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত করে। তেগবাহাদুরের পুত্র দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫—১৭০৮) এই পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হন। শিখজাতির আচরণীয় বিধি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সামরিক সংগঠন গুরু গোবিন্দ সিংহের অবদান। তিনি আজীবন আরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ-নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধে তিনি বাহাদুর শাহকে সমর্থন করেন। বাহাদুর শাহের সহিত দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে এক পাঠান অনুচর তাঁহাকে হত্যা করে। গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর বান্দা শিখদের নেতা হন। তিনি শিখদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী পাঞ্জাবের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করিয়া নেন। লোহগড় দুর্গ স্থাপন করিয়া তিনি শিখ রাজ্যের সূত্রপাত করেন। দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া তিনি মুঘলবাহিনীর সহিত লড়াই করিয়াছিলেন। ১৭১৫ খ্রীঃ মুঘলবাহিনীর হস্তে তিনি ধৃত ও নিহত হন। সন্দেহ নাই তাঁহার মৃত্যুতে শিখদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়।

শিখশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিবার মত শক্তি মুঘলদের আর ছিল না। নাদির শাহ্

(১) 'দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।'

ও আহম্মদ শাহ আবদালীর ভারত-আক্রমণ শিখশক্তির উত্থানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পাঞ্জাব হইতে মুঘল শাসনের অবসান ঘটে। এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামরিক শূন্যতার সুযোগ লইয়া শিখগণ নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বাড়াইয়া লয়। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে আবদালীর দুর্বল বংশধরদের সময়ে শিখগণ সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীর দখল করিতে সক্ষম হয়। শিখেরা নিজেদের অধিকৃত অঞ্চল বারটি 'মিশল' (misl) বা ছোট রাজ্যে ভাগ করিয়া নেন। এই বারটি মিশল লইয়া একটি শিথিল 'ধর্মভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার' (theocratic confederate feudalism) জন্ম হয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শিখ মিশলের সর্দারগণ যুক্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন। অভ্যন্তরীণ শাসনেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে শিখসর্দারগণ শিখ মিশলের গণতান্ত্রিক ধর্মীয় চরিত্র নষ্ট করিয়া আধুনিক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মারাঠাদের উত্থান ও পতন

(Growth and decline of the Marathas till 1761)

পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল মারাঠারা। শিবাজী প্রতিষ্ঠিত মারাঠা রাজ্য অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মুঘলদের পতনের পর এই দেশে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা একমাত্র তাহাদের ছিল। তবে মারাঠা নায়কদের মধ্যে কলহ, সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার মত কর্মসূচী ও দূরদৃষ্টির অভাব তাহাদের প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। শিবাজীর মৃত্যু হইতে আরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত সময়কাল (১৬৮০-১৭০৮) মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর্ব। এই সময়ে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া মারাঠা সর্দারগণ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন। মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন শিবাজী পুত্র শম্ভুজী। সম্রাট আরঙ্গজেব নিজে মারাঠাদের দমন করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে হাজির হন। শম্ভুজী পিতার মত দক্ষ, সমরকুশল সেনাপতি বা বিচক্ষণ রাজা ছিলেন না। তবে তিনি সাহসী ছিলেন। তিনি মুঘল শক্তির নিকট মাথা নত করেন নাই। তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠাগণ মুঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালাইতে থাকে। ১৬৮৯ খ্রীঃ শম্ভুজী আরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনীর হস্তে ধৃত ও সম্রাটের আদেশে নিহত হন। শম্ভুজীর পরিবার ও শিশু-পুত্র সাহু আরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হইয়া মুঘল শিবিরে আশ্রয় পান। আরঙ্গজেব মনে করেন কিছুকাল মুঘল শিবিরে থাকিলে সাহু মুঘলদের ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইবেন।

মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৬৮০—১৭০৭

ইহাতে মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া সম্ভব হইবে। রাজা শম্ভুজী নিহত হইবার পর মুঘলরা একের পর এক মারাঠা দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। রাজধানী রায়গড়ও অবরুদ্ধ হয়। মারাঠা জাতির এই ঘোর দুর্দিনে শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম মারাঠা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। মারাঠা সর্দারগণ গেরিলা যুদ্ধ নীতি অনুসরণ করিয়া মুঘল সৈন্যবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। শান্তাজী ঘোড়পাড়ে ও ধনজী যাদব মারাঠা জাতির সমরনেতা হিসাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দেন। দাক্ষিণাত্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। আরঙ্গজেব শত চেষ্টা করিয়াও ইহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৭০০ খ্রীঃ রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী অসাধারণ সাহসী মহিলা তারাবাঈ মারাঠাদের নেতৃত্ব দেন। তাঁহার শিশু-পুত্র তৃতীয় শিবাজীর নামে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মারাঠারা কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া যায়। আরঙ্গজেবের পুত্রগণ সিংহাসন লইয়া বিরোধে লিপ্ত হন। মারাঠাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার মত সময় তাঁহাদের ছিল না। মারাঠাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য ওমরাহ জুলফিকার খানের পরামর্শে বন্দী সাহুকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলাকালীন মারাঠা সর্দারগণ নিজেদের সৈন্যবাহিনী ও প্রভাবাধীন অঞ্চল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহারা সাহু ও তারাবাঈয়ের দলে যোগ দিয়া মারাঠাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি করেন। ১৭০৭-১৭১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কাল মারাঠাদের গৃহযুদ্ধের পর্ব। তারাবাঈ সাহুকে শম্ভুজীর পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে অস্বীকার করেন। ফলে উত্তরাধিকার প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে লড়াই বাধে। সাহুর ঘাঁটি ছিল সাতারা আর তারাবাঈয়ের কোলাপুর। শিবাজী পরিবারে এই বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ মারাঠা রাজ্যের রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটায়। গৃহযুদ্ধ চলাকালীন বালাজী বিশ্বনাথ নামক একজন তীক্ষ্ণধী ব্রাহ্মণ সাহুকে সাহায্য করেন। বস্তুতঃ বালাজী বিশ্বনাথের সাহায্য ও কূটকৌশলে সাহু গৃহযুদ্ধে জয়ী হন। ১৭১৩ খ্রীঃ রাজা সাহু বালাজী বিশ্বনাথকে মারাঠা রাজ্যের পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীর পদ দেন। ইহার পর হইতে পেশোয়ারা মারাঠারাজ্যে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হন। রাজা সাহু বা পরবর্তীকালে শিবাজীর বংশধরগণ নামেমাত্র রাজা হিসাবে টিকিয়া থাকেন।

মারাঠা রাজ্যে গৃহযুদ্ধ ১৭০৭-১৭১৩

পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০): কোঙ্কন প্রদেশের এক দরিদ্র চিতপবন ব্রাহ্মণ পরিবারে বালাজী বিশ্বনাথের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন রাজস্ব বিভাগের একজন সামান্য কর্মচারী। নিজ প্রতিভাবলে ধীরে ধীরে তিনি মারাঠা রাজ্যের উচ্চপদে উঠেন। সেনাপতি চন্দ্রসেন যাদবের অধীনে তিনি সৈন্যবাহিনীর সংগঠক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। মারাঠা রাজ্যে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন তিনি রাজা সাহুকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহারই পরামর্শে শক্তিশালী মারাঠা সর্দারগণ একে একে সাহুর পক্ষে যোগ দেন। ১৭১৩ খ্রীঃ পেশোয়া নিযুক্ত হইবার পর বালাজী

বিশ্বনাথ মারাঠা রাজ্যের সর্বত্র রাজা সাহু ও নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তবে কোলাপুর অঞ্চলে তারাবাঈ ও তাঁহার সহযোগী সর্দারদের প্রভাব বজায় থাকে।

বালাজী বিশ্বনাথ মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠা রাজ্যের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। মুঘল অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে তিনি পুরাপুরি কাজে লাগান। ১৭১৪ খ্রীঃ শক্তিশালী সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম হুসেন আলির সহিত তিনি এক চুক্তি করেন। পরে মুঘল সম্রাট ইহা অনুমোদন করেন। (১) এই চুক্তিবলে মারাঠারা শিবাজীর 'স্বরাজ্য' ফিরিয়া পায়। অর্থাৎ শিবাজীর রাজ্য মারাঠাদের ফেরত দেওয়া হয়। (২) ইহার সহিত পরবর্তীকালে মারাঠাদের অধিকৃত খান্দেশ, গণ্ডোয়ানা, বেরার, হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকের কতকাংশ যুক্ত করা হয়। (৩) দাক্ষিণাত্যের ছয়টি মুঘল প্রদেশ হইতে রাজা সাহুকে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। (৪) বিনিময়ে রাজা সাহু মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। মুঘল সম্রাটকে দশলক্ষ টাকার রাজস্ব ও পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহীর সাহায্য দিতেও তিনি সম্মত হন। সৈয়দ হুসেন আলির সহিত বালাজী বিশ্বনাথের এই চুক্তি মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তাহাতে সন্দেহ নাই। মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য অনেকে এই চুক্তির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। তবে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের উপর মারাঠাদের রাজস্বের দাবী সম্রাটের অনুমোদন লাভ করে। রাজস্বের সহিত রাজশক্তির সম্পর্ক অতি নিকট। ইহার ফলে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের রাজনৈতিক প্রভাব স্থাপিত হয়। বলা যায় এই সময় হইতে মারাঠা সাম্রাজ্যের সূচনা হয়। এইজন্য ১৭১৪ খ্রীঃ মুঘল-মারাঠা চুক্তিকে মারাঠা সাম্রাজ্যের 'মহাসনদ' (Magna Carta of the Maratha Empire) বলা হইয়া থাকে।

মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

১৭১৯ খ্রীঃ বালাজী বিশ্বনাথ এক মারাঠা সৈন্যবাহিনীর নেতা হিসাবে দিল্লীতে উপস্থিত হন। তাঁহার সহায়তায় সৈয়দ হুসেন আলি সম্রাট ফারুখশিয়ারকে পদচ্যুত করেন। বিশ্বনাথ ও অন্যান্য মারাঠা সর্দারগণ মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাদের মধ্যে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা জাগরিত হয়। দেশে ফিরিয়া বালাজী দাক্ষিণাত্যে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্য মারাঠা সর্দারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ঠিক হয় নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে সর্দারগণ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাইবেন। সংগৃহীত রাজস্বের একাংশ পেশোয়া পাইবেন। অনেকের মতে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ কর্তৃক মারাঠা সর্দারদের জন্য প্রবর্তিত এই আধা-স্বাধীন সামন্তব্যবস্থা মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। মারাঠা সর্দারগণ নিজেদের রাজপাট, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি গঠন করিয়া উত্তর ভারতে মারাঠা বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। তবে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ কর্তৃক স্থাপিত 'শিথিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' মারাঠাদের মধ্যে অনৈক্যের বীজও বপন করে। দেশের মধ্যে সামন্ত প্রথা ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়। শিবাজীর 'এক রাজা, এক রাজ্য ও এক জাতির আদর্শ" ক্ষুণ্ণ হয়।

পেশোয়া প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০) ঃ পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম বাজীরাও মারাঠাদের পেশোয়া হন। পেশোয়া পদ বালাজী পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যায়। এই সময় বাজীরাওয়ের বয়স মাত্র বিশ বৎসর। এই অল্পবয়সী যুবক পেশোয়া ছিলেন অসাধারণ উদ্যমী, সাহসী এবং একজন দক্ষ গেরিলা যুদ্ধ বিশারদ। তাহা ছাড়া ইনি ছিলেন কূটকৌশলী, উচ্চাভিলাষী এবং তীক্ষ্ন রাজনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী। বাজীরাওয়ের রাষ্ট্রনীতির দুইটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থাকে কাজে লাগাইয়া তিনি মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী হইতে উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু পর্যন্ত মারাঠা বিজয়কেতন উড়াইবার তিনি স্বপ্ন দেখিতেন।[১] দ্বিতীয়ত, মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলিকে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'হিন্দুপাদ-পাদশাহী'র আদর্শ প্রচার করেন। বাজীরাও অম্বররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ ও বুন্দেলারাজ ছত্রশালের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। মালব আক্রমণকালে তিনি স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন।

বাজীরাওয়ের রাষ্ট্রনীতি

পেশোয়া প্রথম বাজীরাও সারা জীবন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। তিনি উত্তর ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে মুঘল প্রদেশ গুজরাট, মালব ও বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করেন। মারাঠা আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া মুঘল শাসকগণ এই অঞ্চলে মারাঠাদের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার মানিয়া লন। এই সমস্ত প্রদেশের কিয়দংশ মারাঠা সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বাজীরাওয়ের সময়ে মারাঠাদের মধ্যে সিন্ধিয়া, হোলকার, গাইকোয়াড়, ভোঁসলে প্রভৃতি পরিবার শক্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। দাক্ষিণাত্যে নিজাম ছিলেন মারাঠাদের বড় শত্রু। তিনি মারাঠাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া বাজীরাওকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করেন। কোলাপুর রাজপরিবার ও সেনাপতি ত্রিম্বকরাও ধাবাড়ের সহায়তা লইয়া নিজাম বাজীরাওকে আক্রমণ করেন। তবে বাজীরাওয়ের নিকট তিনি পরাস্ত হন। বাজীরাও সৈন্যবাহিনী লইয়া দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলে মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ নিজামের সাহায্যপ্রার্থী হন। বাজীরাও দ্বিতীয়বার নিজামকে পরাস্ত করিয়া মালব ও মধ্যপ্রদেশের নর্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্তী বিশাল ভূখণ্ড লাভ করেন। পশ্চিমাঞ্চলে জাঞ্জিরার সিদ্দিদের (সৈয়দদের) বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া বাজীরাও মূল ভূখণ্ড হইতে উহাদের বিতাড়িত করেন। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া বাজীরাও সলসেত ও বেসিন নামক স্থান দুইটি অধিকার করিয়া লন। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়া বাজীরাও প্রকৃতপক্ষে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার

(১) 'Let us strike at the trunk of the withering tree. The branches will fall of themselves. Thus should the Maratha flag fly from the Krishna to the Indus.'

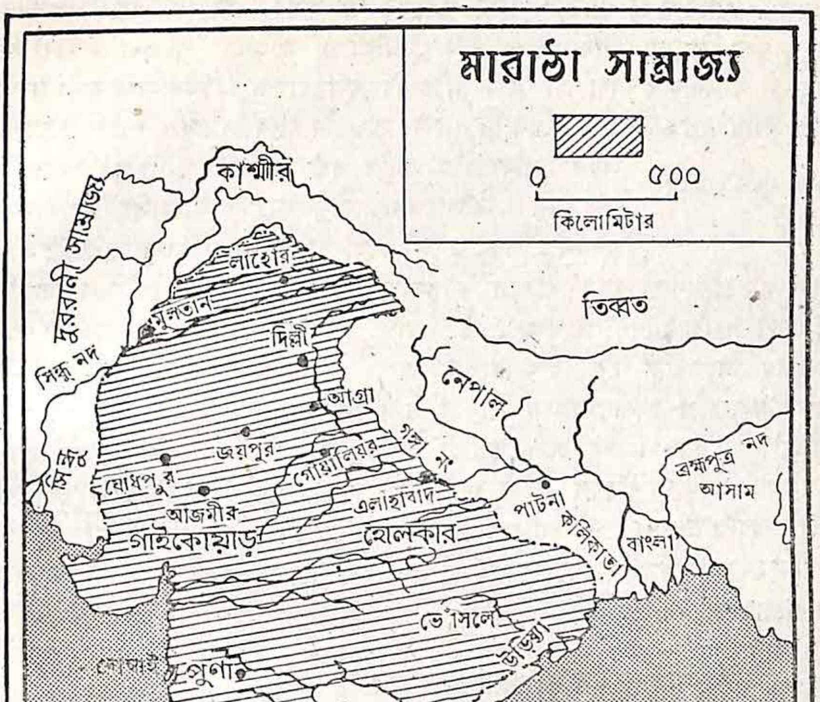
তাঁহাকে 'মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেও বাজীরাও ইহার সুশাসনের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। মারাঠা সেনানায়কগণ প্রায় স্বাধীনভাবেই নিজ রাজ্য শাসন করিতেন ইহাতে মারাঠা কেন্দ্রীয় শক্তির ক্ষমতা সঙ্কুচিত এবং জাতীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়।

১৭৪০ খ্রীঃ পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র **বালাজী বাজীরাও** (১৭৪০—১৭৬১) মারাঠা সাম্রাজ্যের পেশোয়া হন। বালাজী বাজীরাও দক্ষ ছিলেন তবে পিতার মত উদ্যমী ছিলেন না। তিনি পুনা বা পুনেতে পেশোয়াদের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত করেন। ১৭৪৯ খ্রীঃ রাজা সাহুর মৃত্যুর পর তাঁহার শেষ ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যশাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব পেশোয়া পান। তবে কোলাপুরে শিবাজীর বংশধররা রাজা হিসাবে টিকিয়া থাকেন। পেশোয়া বালাজী বাজীরাও তাঁহার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা চালাইয়া যান। রাষ্ট্রনীতিতে তিনি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করেন। প্রথমত, তিনি তাঁহার পিতার অনুসৃত হিন্দুরাজাদের প্রতি বন্ধুত্বের নীতি পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সময়ে মারাঠা সৈন্যবাহিনী নির্বিচারে হিন্দু ও মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে। দ্বিতীয়ত, তিনি মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটান। মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে বহু বিদেশীকে গ্রহণ করা হয়। ইহাতে মারাঠা সৈন্যবাহিনীর জাতীয় চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ছাড়া শিবাজী-প্রবর্তিত পুরাতন গেরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতিও ত্যাগ করা হয়।

রাষ্ট্রনীতি

পেশোয়া বালাজী বাজীরাও সমস্ত ভারতবর্ষকে মারাঠা সৈন্যবাহিনীর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করেন। গুজরাট, মালব ও বুন্দেলখণ্ডে মারাঠা শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলে বারবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। উড়িষ্যা তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। রাজপুত রাজারা মারাঠাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নজরানা দিতে বাধ্য হন। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক, মহীশূরের শাসক ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজারা মারাঠাদের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লন। অনেকে নজরানা দিতে বাধ্য হন। ১৭৬০ খ্রীঃ উদ্‌গীরের যুদ্ধে নিজাম মারাঠা বাহিনীর নিকট পরাস্ত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাষট্টি লক্ষ টাকা রাজস্বের বিশাল ভূখণ্ড মারাঠাদের হস্তগত হয়। উত্তর ভারতে মারাঠাদের সাফল্য ছিল আরও চমকপ্রদ। সেনাপতি রঘুনাথরাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠা সৈন্যবাহিনী রাজধানী দিল্লী অধিকার করে। রোহিলা নেতা নাজিবুদ্দৌলা ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মারাঠাদের নিকট পরাস্ত হন। বন্ধু আমীর ইমাদ-উল-মুলককে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মারাঠা সৈন্যবাহিনী আহম্মদ শাহ্ আবদালীর নিকট হইতে পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লয়। ইহার পর মারাঠা-আফগান দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়।

বালাজী বাজীরাওয়ের অধীনে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তার



তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ :

১৭৫৮ খ্রীঃ পাঞ্জাব অধিকার করিয়া মারাঠা সৈন্যবাহিনী দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যায়। পরের বৎসর আবদালী পুনরায় পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লন। আবদালী পাঞ্জাব অধিকার করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলে মারাঠা বাহিনী তাহার প্রতিরোধে আগাইয়া

আসে। পানিপথের প্রান্তরে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়। আবদালী মারাঠাদের বিরুদ্ধে রোহিলা নেতা নাজিবুদ্দৌলা ও অযোধ্যার নবাবের সাহায্য লাভ করে। অপরদিকে মারাঠারা আবদালীর বিরুদ্ধে রাজপুত, শিখ বা জাঠদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন। এইসব শক্তিগুলি মারাঠা-আফগান দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ থাকিবার সিদ্ধান্ত লয়। আবদালীর সহিত ষাট হাজার সৈন্য ছিল। আর ছিল আধুনিক ও উন্নত গোলন্দাজ বাহিনী। আবদালী নিজে ছিলেন একজন অভিজ্ঞ, কুশলী সেনানায়ক। মারাঠা সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার। শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, সৈন্য সন্নিবেশ ও সমর কৌশলে আফগান বাহিনী মারাঠা বাহিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। মারাঠা সৈন্যবাহিনীর নামমাত্র প্রধান ছিলেন পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাসরাও। আসল নেতা সদাশিবরাও ভাওয়ের সহিত অন্যান্য মারাঠা সেনানায়কদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। ১৭৬১ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারী মারাঠা ও আফগানদের মধ্যে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মারাঠা সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাসরাও ও সেনাপতি সদাশিবরাও ভাওসহ প্রায় আঠাশ হাজার মারাঠা সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। পানিপথের পরাজয়ের দুঃসংবাদ পাইবার অল্পকাল পরেই পেশোয়া বালাজী বাজীরাও প্রাণত্যাগ করেন।

উভয় পক্ষের শক্তি-সামর্থ্য

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল :

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ মারাঠাদের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে, (১) ইংলন্ডের ফ্লোডেনফিল্ড যুদ্ধের মত ইহা ছিল এক জাতীয় বিপর্যয়কারী ঘটনা। এই যুদ্ধে মারাঠাদের একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং নেতৃবর্গ ধ্বংস হইয়া যায়। সমগ্র মহারাষ্ট্রে এমন কোন পরিবার ছিল না যাহার একটি মানুষ এই যুদ্ধে প্রাণ দেয় নাই। (২) মারাঠা রাষ্ট্রনীতিতে এই যুদ্ধের প্রভাব ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। পানিপথে পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের বিজয় অভিযান শুধু ব্যাহত হয় নাই, পরিত্যক্ত হইয়াছিল। (৩) মারাঠাদের রাজনৈতিক ও সামরিক মর্যাদা নষ্ট হয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনে মারাঠাশক্তি সম্পর্কে যে শ্রদ্ধার মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা নষ্ট হইয়া যায়। পানিপথে মারাঠাদের পরাজয়ের পর মহীশূরের হায়দার আলি ও হায়দ্রাবাদের নিজাম নিজেদের শক্তিকে সংহত করিয়া লন। মারাঠাদের বন্ধু হিন্দু রাজারাও আর তাহাদের উপর আস্থা রাখিতে পারেন নাই। (৪) মারাঠা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের প্রভাব পড়িয়াছিল। মারাঠা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পেশোয়া পদের যে কর্তৃত্ব ও গৌরব ছিল তাহা আর অটুট রহিল না। পানিপথের পরে সিন্ধিয়া, ভোঁসলে, হোলকার প্রভৃতি মারাঠা নায়কগণ প্রায় স্বাধীনভাবে নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। (৫) যদিও পেশোয়া প্রথম মাধবরাও (১৭৬১-৭২) মারাঠাদের শক্তি ও প্রভুত্ব পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইয়াছিলেন, তথাপি মারাঠারা পূর্ব গৌরব ও ক্ষমতা আর ফিরিয়া পান নাই। মারাঠা

ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের সুদূর প্রসারী প্রভাবকে স্বীকার করেন নাই।[১] তাঁহার মতে, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যের কোন স্থায়ী ক্ষতি হয় নাই। মহাদজী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে তাহারা পুনরায় উত্তর ভারতে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। মুঘল সম্রাট তাহাদের ক্রীড়নকে পরিণত হন।

(৬) পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পরে আফগানরা উত্তর ভারতে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই। আবদালী পাঞ্জাব লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। পরে শিখরা তাঁহার বংশধরদের নিকট হইতে পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লয়। (৭) একথা অস্বীকার করা যায় না মারাঠা আফগান দ্বন্দ্বের ফলে এই দেশীয় দুইটি প্রধান শক্তির অনর্থক শক্তিক্ষয় হয়। স্থানীয় শক্তিগুলি প্রাধান্য অর্জন করে। (৮) ইহার ফলভোগ করে বিদেশী ইংরেজ শক্তি। ইতিমধ্যে কর্ণাটক ও বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্বের সূচনা হইয়াছিল। ইংরেজরা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। উত্তর ভারতের সামরিক ও রাজনৈতিক শূন্যতা ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ১৭৭৫ খ্রীঃ যখন ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় তখন ইংরেজরা যথেষ্ট শক্তিশালী। মারাঠাদের পক্ষে তাহাদের পরাস্ত করা সম্ভব হয় নাই। সন্দেহ নাই পানিপথ ইংরেজদের শক্তি সঞ্চয়ে সহায়তা করিয়াছিল।

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ—**(ক) কোন্ সময় হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়? (খ) আবদুল্লা ও হোসেন আলি কে ছিলেন? (গ) ইরানী দলের দুইজন নেতার নাম কর। (ঘ) তুরানী দল কাহারা গঠন করিয়াছিলেন? (ঙ) অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (চ) বাংলায় স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা কে? (ছ) শাহু কে ছিলেন? (জ) বালাজী বিশ্বনাথ কে? (ঝ) কত খ্রীঃ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ হয়? (ঞ) অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯) কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (ট) শিখদের প্রথম গুরু কে?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ—**(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অভিজাত শ্রেণী কতখানি দায়ী ছিল? (খ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বৈদেশিক আক্রমণকে কতখানি দায়ী করা যায়? (গ) হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁহার শাসনের পরিচয় দাও। (ঘ) সাদাত খান ও সফদর জঙ্গ কিভাবে অযোধ্যা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন? (ঙ) বাংলার নবাবদের ব্যর্থতার কারণ কি? (চ) স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়? (ছ) মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৬৮০—১৭০৭) পরিচয় দাও। (জ) মারাঠাদের গৃহযুদ্ধে (১৭০৭—১৭১৩) রাজা শাহুর সাফল্যলাভের কারণ কি?

---

(১) G. S. Sardesai, New History of the Marathas, Vol II.

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর :—**(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের উপর একটি প্রবন্ধ লিখ। (খ) স্বাধীন শিখ রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? (গ) প্রথম তিনজন পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিচয় দাও। (ঘ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল?

৪। **টীকা লিখ :—**(ক) নাদির শাহ (খ) আহম্মদ শাহ আবদালী (গ) গুরু অর্জুন (ঘ) গুরু গোবিন্দ (ঙ সগৌলির সন্ধি (১৮১৬)।

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর :—**(ক) আরঙ্গজেবের সময় হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের — সূচনা হয়। (খ) জাগীরব্যবস্থায় — মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। (গ) আরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ অভিজাতদের হাতে — সম্রাটে পরিণত হন। (ঘ) আবদুল্লা ও হোসেন আলি যে দল গঠন করেন তাহার নাম — দল। (ঙ) ১৮০৩ খ্রীঃ লর্ড — দিল্লী অধিকার করেন। (চ) হায়দার আলি প্রথম জীবনে মহীশূরের মন্ত্রী — অধীনে চাকুরি করিতেন। (ছ) পেশোয়া প্রথম বাজীরাও — ধারণা প্রচার করেন। (জ মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে দুইজন সেনাপতি — বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লন।

৬। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও :—**(ক) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাট ফারুখশিয়ার / মুহম্মদ শাহকে হত্যা করেন। (খ) নাদির শাহ, মুহম্মদ শাহ / আহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ভারত আক্রমণ করেন। গ) সম্রাট আকবর শিখগুরু অমরদাসকে / রামদাসকে স্বর্ণমন্দিরর নির্মাণের জন্য অমৃতসরে জমি দান করেন। (ঘ) হরগোবিন্দ / গুরুগোবিন্দ সিংহ ছিলেন শিখদের শেষ গুরু। (ঙ) সাহু / তারাবাঈ মারাঠাদের গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইওরোপীয় বাণিজ্যের অগ্রগতি এবং কোম্পানীগুলির মধ্যে সংঘর্ষ

(Growth of European commerce and conflict among European trading companies)

ইঙ্গ ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা—কর্ণাটকের যুদ্ধ ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দেশে রাজ্যজয় ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। সম্রাট আরঙ্গজেবের বাধাদানের ফলে তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম চার দশক ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানীগুলি শান্তিপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে নিযুক্ত ছিল। এই সময়কাল প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় বাণিজ্যের অগ্রগতির যুগ। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতীয় বাণিজ্যের ধরন অনেকটা একরকম। ইহারা ইউরোপ হইতে সোনা, রূপা, সৌখিন দ্রব্য, ঔষধপত্র, পশমের বস্ত্র, মদ্য ইত্যাদি আমদানী করিত। আর এই দেশ হইতে সূতীবস্ত্র, রেশম, সোরা, মসলা, আফিম ইত্যাদি নিজেদের দেশে লইয়া যাইত। এই যুগে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি ভারত-ইউরোপীয় বাণিজ্য ছাড়াও ভারত-এশিয়া বাণিজ্যেও অংশ গ্রহণ করিত। মুঘল সম্রাটগণ ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে নানারকম বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দিতেন। ইহারা প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে দুর্গ নির্মাণ ও সৈন্যস্থাপন করিয়া এইগুলিকে সুরক্ষিত করে। ইংরেজরা মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা, ফরাসীরা চন্দননগর ও পণ্ডিচেরী ও ওলন্দাজরা চুঁচুড়াতে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির ভারত বাণিজ্য বেশ লাভজনক হইল। ইহাদের মোট এশীয় বাণিজ্যের প্রায় সত্তর শতাংশ ছিল ভারতের সঙ্গে।

ইউরোপীয় বাণিজ্যের অগ্রগতি

অষ্টাদশ শতকের চল্লিশের দশক হইতে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। সারা অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীরা ছিল পরস্পরের শত্রু। ইউরোপের রাজনীতিতে নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য ফরাসীদেশ কয়েকবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। স্পেনীয় উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭০২-১৭১৩), অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮ , সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) ও আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ (১৭৭৬-১৭৮৩) ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত যুক্ত হইয়াছিল ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমেরিকা ও এশিয়ায় উপনিবেশ ও বাণিজ্যিক অধিকার সম্প্রসারণের প্রশ্ন লইয়া ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। উপনিবেশ স্থাপন করিয়া একচেটিয়া

ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব

বাণিজ্য করিবার ঝোঁক এই যুগের ইউরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানীগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে থাকিলে এইরকম বাণিজ্য নিষ্কণ্টক হয়। একচেটিয়া বাণিজ্যে মুনাফা বেশী। স্বাভাবিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করিবার জন্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি সর্বদাই তৎপর থাকিত। ইউরোপের 'মার্কেণ্টাইল' অর্থনীতি তাহাদের এইরূপ অতিলাভজনক একচেটিয়া বাণিজ্যের দিকে ঠেলিয়া দেয়।

নাদির শাহের আক্রমণের ফলে (১৭৩৯) মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় শিথিলতা দেখা দেয়। প্রাদেশিক শাসকগণ বস্তুতঃ স্বাধীন হইয়া যান। পূর্ব ভারতে আলিবর্দী খান শক্তিশালী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বারংবার মারাঠা আক্রমণে শাসনব্যবস্থা আরও দুর্বল হইয়া যায়। দেশীয় শক্তিগুলিকে রক্ষা করিবার মত কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। নিজামের নামমাত্র অধীন কর্ণাটকের সিংহাসনের অধিকার লইয়া বিরোধ দেখা দেয়। ঠিক একই সময়ে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইউরোপীয় সংঘর্ষের সূত্র ধরিয়া ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসীরা দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে জড়িত হইয়া পড়ে (১৭৪৪-১৭৬৩)। কর্ণাটক অঞ্চলে এই যুদ্ধ চলিয়াছিল বলিয়া ইহা কর্ণাটকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই বিরোধের মূল কারণ হইল উভয় কোম্পানীই এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন, বাণিজ্যিক অধিকারের সম্প্রসারণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিতে চাহিয়াছিল। ১৭৪৫ খ্রীঃ ইংরেজ নৌবহর ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ফরাসী জাহাজ আক্রমণ করিলে প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের সূচনা হয় (১৭৪৫-৪৮)।

মুঘল শাসনের শিথিলতা

সংঘর্ষের মূল কারণ

এই সময় ভারতে ফরাসী ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন দুপ্লে (Dupleix)। ইনি প্রতিভাবান, সমরকুশল ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি ছিলেন। দুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসীরা পাল্টা আক্রমণে পরের বৎসর মাদ্রাজ অধিকার করিয়া লয়। মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী দুই-ই ছিল কর্ণাটক রাজ্যের মধ্যে। মাদ্রাজ হারাইয়া ইংরেজরা কর্ণাটকের নবাবের শরণাপন্ন হন। কর্ণাটকের নবাব আনওয়ার-উদ্দিন খান ফরাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য-বাহিনী পাঠাইলে দুপ্লে তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া নবাবের বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করেন। শিক্ষিত, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রসজ্জিত ক্ষুদ্র সৈন্য দল এদেশীয়দের বিশাল, অশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা যে অধিক কার্যকরী তাহা এই যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়া

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ ১৭৪৭ ৪৮



দুপ্লে

যায়। ১৭৪৮ খ্রীঃ ইউরোপে এই-লা-স্যাপেলের (Aix-la-Chapelle) সন্ধিতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইলে ভারতেও দুই কোম্পানীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ইংরেজরা মাদ্রাজ ফিরিয়া পায়।

ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘটিলেও ভারতে উপনিবেশ, বাণিজ্যিক অধিকার ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। ভারতীয় রাজাদের সামরিক ও প্রশাসনিক অপদার্থতা ইউরোপীয় বণিকদের রাজ্যজয় ও প্রভুত্ব বিস্তারে প্রলুব্ধ করে। দুপ্লে প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন। ফরাসী গভর্ণর-জেনারেল দেখিলেন তাঁহার সুশিক্ষিত ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া তিনি ভারতীয় রাজাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। রাজনৈতিক বিরোধে তাঁহার পক্ষ জয়ী হইলে তিনি ভূখণ্ড, বাণিজ্যিক অধিকার ও অর্থ লাভ করিবেন। ঐ অর্থ ও সামরিক শক্তি ইংরেজ বিতাড়নে এবং ফরাসী শক্তির বিস্তারে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এমনকি এইভাবে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করাও অসম্ভব নয়। ১৭৪৮ খ্রীঃ হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকে এমন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে দুপ্লে তাঁহার কূটনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা প্রয়োগ

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ —১৭৪৯-৫৪

করিবার সুযোগ পান। ঐ বৎসর হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম আসফজা নিজাম-উল-মুলকের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নাসির জঙ্গ এবং পৌত্র মুজাফফর জঙ্গ উভয়েই সিংহাসনের দাবীদার হন। আবার কর্ণাটকেও নবাব আনওয়ারউদ্দিনের পদচ্যুতি দাবী করিতে থাকেন প্রাক্তন নবাব দোস্ত আলির জামাতা চান্দা সাহেব। দুপ্লে মুজাফফর জঙ্গ ও চান্দা সাহেবের সহিত এক গোপন চুক্তি করিয়া উভয়কেই সিংহাসনের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৭৪৯ খ্রীঃ দুপ্লে, মুজফফর জঙ্গ ও চান্দা সাহেব মিলিতভাবে আম্বুরের যুদ্ধে কর্ণাটকের নবাব আনওয়ার-উদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করেন। আনওয়ারউদ্দিনের পুত্র মুহম্মদ আলি রাজধানী আর্কট ত্যাগ করিয়া ত্রিচিনোপলীতে আশ্রয় লন। ফরাসী বাহিনী ঐ স্থান অবরোধ করিয়া রাখে। পরের বৎসর হায়দ্রাবাদের নিজাম নাসির জঙ্গ নিহত হন। দুপ্লের মিত্র মুজাফফর জঙ্গ হায়দ্রাবাদের নিজাম হন। মুজাফফর জঙ্গ দুপ্লেকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণাঞ্চলের গভর্ণরের পদ, জাগীর ও মসুলিপত্তম দান করেন। সেনাপতি বুসীর অধীনে ফরাসী সৈন্যবাহিনী হায়দ্রাবাদে মোতায়েন করা হয়। অল্পদিন পর মুজাফফর জঙ্গের মৃত্যু হইলে ফরাসী সাহায্যেই সলাবত জঙ্গ নিজাম হন। হায়দ্রাবাদে ফরাসী প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। সলাবত জঙ্গ বুসীকে 'উত্তর সরকার' নামক ভূখন্ড দান করেন।[১]

এই সময় ফরাসী শক্তি ভারতে চরম সাফল্য লাভ করে। হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটক রাজ্যে তাহাদের বন্ধু রাজা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূখন্ড, অর্থ, রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও বাণিজ্যিক অধিকার সকল দিক দিয়াই তাহারা ইংরেজ অপেক্ষা অনেক দূর আগাইয়া যায়। দুপ্লে তাঁহার কল্পনার অতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ভারতে ফরাসী

(১ মুস্তফানগর, এলোর, রাজামুন্দ্রি ও চিকাকোল জেলা লইয়া গঠিত।

সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়াছিল। তবে দ্যুপ্লে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইতে পারেন নাই। তিনি আনওয়ারউদ্দিনের পুত্র মুহম্মদ আলির সহিত কোন বোঝাপড়ায় উপনীত হইতে ব্যর্থ হন। ফরাসী সৈন্যবাহিনী ত্রিচিনোপলী অধিকার করিতে ব্যর্থ হয়। ইংরেজরা সুযোগ বুঝিয়া নিজেদের স্বার্থে মুহম্মদ আলির পক্ষ নেয়। ত্রিচিনোপলীর উপর ফরাসী সামরিক চাপ কমাইবার জন্য তরুণ ইংরেজ সেনানায়ক ক্লাইভ কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট অধিকার করেন। চান্দা সাহেব চেষ্টা করিয়াও আর্কট পুনর্দখল করিতে পারেন নাই। ১৭৫২ খ্রীঃ ত্রিচিনোপলীতে ফরাসী বাহিনী পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করে। চান্দা সাহেব পরাজিত ও নিহত হন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াও দ্যুপ্লে ব্যর্থ হন। দ্যুপ্লের উচ্চাশা মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। দেশে ফরাসী সরকার দ্যুপ্লের প্রতি বিরক্ত হন। ইংরেজ সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকার করিয়া ফরাসী গভর্ণমেণ্ট দ্যুপ্লেকে দেশে ফিরিবার নির্দেশ দেন। ১৭৫৪ খ্রীঃ ফরাসী কোম্পানীর নূতন গভর্ণর-জেনারেল গডেহু (Godeheu) ইংরেজদের সহিত শান্তি স্থাপন করেন।

ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে স্থাপিত এই শান্তি স্থায়ী হয় নাই। ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) শুরু হইলে ভারতেও উভয়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। উভয়েই দুর্গ নির্মাণ, সৈন্য সংগ্রহ ও মিত্র রাজার সাহায্য লাভে উদ্যোগী হয়। বাংলায় ক্লাইভ ও ওয়াটসন ১৭৫৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে ফরাসী বাণিজ্য কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করিয়া লন। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইয়া যায়। ফরাসী সরকার কাউন্ট লালীকে (Lally) ভারতে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেন। লালী সহজেই মাদ্রাজের কাছে ইংরেজদের ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড দুর্গটি দখল করিয়া লন। তারপর তাঞ্জোর ও মাদ্রাজ অবরোধ করিয়া তিনি ব্যর্থ হন। ইহাতে ফরাসীদের সামরিক খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়। ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাও বিলীন হইয়া যায়। লালী অসহায় অবস্থায় হায়দ্রাবাদ হইতে বুসীকে ডাকিয়া পাঠান। ইহা ছিল এক মারাত্মক ভুল। ইংরেজরা সঙ্গে সঙ্গে নিজাম সলাবত জঙ্গের সহিত বন্ধুত্বের চুক্তি করে। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী উত্তর সরকার দখল করিয়া লয়। ১৭৬০ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকুট বন্দীবাসের যুদ্ধে লালীকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজ বাহিনী ফরাসীদের প্রধান ঘাঁটি পণ্ডিচেরী অধিকার করে। ১৭৬৩ খ্রীঃ প্যারিসের চুক্তিতে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ঐ চুক্তির শর্তানুযায়ী ফরাসীরা ভারতে পণ্ডিচেরী, চন্দননগর অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্র-গুলি ফেরত পায়। ঐ কেন্দ্রগুলিতে দুর্গ নির্মাণ ও সৈন্য মোতায়েনের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। শুধু বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে এইগুলি টিকিয়া ছিল। ভারতে সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ফরাসীদের আর গুরুত্ব রহিল না। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। ইহার পর ফরাসীরা কার্যতঃ ইংরেজদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে থাকে।

তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ— ১৭৫৮-৬৩

কর্ণাটক যুদ্ধের ফলাফল ঃ (১) তিনটি কর্ণাটক যুদ্ধের ফলে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া যায়। ফরাসীরা চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়। ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়। ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক অধিকারের প্রশ্ন লইয়া ভবিষ্যতে উভয়ের মধ্যে আর সংঘর্ষের সম্ভাবনা রহিল না। (২) কর্ণাটক যুদ্ধের পর হইতে ইংরেজদের রক্ষণাধীনে ফরাসীদের এদেশে বসবাস করিতে হইত। ভারতে সামরিক শক্তি হিসাবে ফরাসীদের আর অস্তিত্ব ছিল না। কর্ণাটক যুদ্ধের পর এই দেশে ফরাসী-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাও চিরকালের জন্য নির্মূল হইয়া যায়। (৩ কর্ণাটক যুদ্ধের সময় হইতে ইংরেজরা ভারতের সমুদ্রপথে তাহাদের অধিকার ও প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। ইংরেজরা তাঁহাদের নৌশক্তির জোরেই ফরাসীদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। নৌশক্তিই যে ভারত-সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি ইংরেজরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করে। নৌবলে বলীয়ান ইংরেজরা সমস্ত ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। (৪) কর্ণাটক যুদ্ধে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। দেশীয় সৈন্যবাহিনীর অপদার্থতা, শৃংখলাহীনতা ও ব্যর্থতা ইংরেজদের ভারত বিজয়ে উৎসাহিত করে। দেশীয় রাজাদের মধ্যে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের অভাব এবং নিজেদের মধ্যে নিত্যকলহ ইংরেজদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণে সহায়ক হয়। (৫) ইউরোপীয় নেতৃত্বে এই দেশের সম্পদ ও অর্থে এবং এই দেশীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সাম্রাজ্য স্থাপনের দৃষ্টান্ত দুপ্লে ইংরেজদের সামনে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। দুপ্লের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া ইংরেজগণ এই দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক মনে করিয়া থাকেন।

ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ ঃ ভারতে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, (১) দেশের ফরাসী সরকারের অপদার্থতা এইজন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। দেশের স্বেচ্ছাচারী সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছিল অপদার্থ ও পুরোপুরি ব্যর্থ। পতনোন্মুখ এই শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা রাষ্ট্রচালিত ফরাসী কোম্পানীর পরিচালনায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ফরাসী সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ভারতের অবস্থা, উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ বা বাণিজ্যিক সুবিধার কথা বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাহারা দুপ্লেকে যথেষ্ট অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দেন নাই। তাহা ছাড়া (২) রাজনৈতিক স্বার্থে ও আমেরিকার উপনিবেশের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহারা ইংরেজদের সহিত ভারতের বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। স্বীকার করিতে হইবে এইজন্য ফরাসী সরকারের ভারতীয় প্রতিনিধিরাও অনেকখানি দায়ী ছিলেন। তাঁহারা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং ঔপনিবেশিক সম্ভাবনার কথা কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথভাবে উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। (৩) অনেকে মনে করেন ফরাসী কোম্পানীর প্রধান দুপ্লে বড় বেশী উচ্চাভিলাষী ছিলেন। ফরাসীদের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির সহিত তাঁহার রাজনৈতিক পরিকল্পনা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফরাসীদের সীমিত শক্তি হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকের মধ্যে বিভক্ত

হওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত দুপ্লের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়। (৪) দুপ্লে ভাবিতে পারেন নাই, যে কৌশল ও কূটনীতি তিনি প্রয়োগ করিতেছেন অন্যেও তাহা অনুকরণ করিতে পারে। ত্রিচিনোপলীতে মুহম্মদ আলির আশ্রয় গ্রহণকে তিনি তেমন গুরুত্ব দেন নাই। ইংরেজরা মুহম্মদ আলির পক্ষ লইয়া তাহাদের হৃত প্রভাব পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইতে পারে দুপ্লে তাহা আন্দাজ করিতে পারেন নাই। সন্দেহ নাই ইহা তাঁহার ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ।

(৫) ফরাসী উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সৈন্যাধ্যক্ষ ও নৌবহরের অধ্যক্ষদের মধ্যে নিরন্তর কলহ ও বিরোধ ফরাসীদের ব্যর্থতার জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। কর্ণাটকের যুদ্ধে সাফল্য নৌবহরের সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল। দেশের সহিত যোগাযোগ, খাদ্য, অস্ত্র ও সৈন্য সরবরাহ, উপকূলের দুর্গ অবরোধ সবই নৌবহরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ফরাসী সৈন্যবাহিনী ও নৌবহরের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। ইহাদের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ দেখা দিত এবং সামরিক কার্যকলাপ ক্ষতিগ্রস্ত হইত। (৬) ফরাসী সমর নেতাদের অনেকেই ছিলেন অপদার্থ ও উদ্যমহীন। অপরদিকে ইংরেজরা ছিলেন দক্ষ, উদ্যমী ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। দেশের সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ সংগ্রাম করেন। (৭) ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ কর্ণাটক যুদ্ধের শেষপর্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজরা বহু অর্থ ও সম্পদ লাভ করে। বাংলা হইতে নিয়মিত সৈন্য ও সমরসম্ভার দাক্ষিণাত্যে পাঠান হয়। বলা যায়, পলাশীর যুদ্ধ কর্ণাটকে ফরাসীদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল। ইংরেজদের প্রবল নৌশক্তি ও বাংলার অপরিমিত সম্পদ ফরাসীদের পরাস্ত করিতে সাহায্য করে। পণ্ডিচেরীর ঘাঁটি হইতে এমন শক্তির সহিত লড়াই করিয়া ভারত জয় করা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। স্বয়ং নেপোলিয়নও বোধহয় এইরূপ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিতেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলায় ব্রিটিশ বাণিজ্য ও প্রভুত্বের বিস্তার

(Growth of English East India Company's commerce and political power in Bengal till 1765)

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ব্রিটিশ বাণিজ্যের অগ্রগতি :

বাংলা প্রদেশ ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী।[১] এখানকার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ছিল বেশ উন্নত। স্বাভাবিকভাবে ইউরোপীয় ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি কোম্পানীগুলি এখানে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ব্যবসা করিত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সিংহভাগ ইংরেজ

(১) 'জান্নাতুল বিলাদ' অর্থাৎ প্রদেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলিয়া যায়। ১৭০০ খ্রীঃ কলিকাতা কোম্পানীর পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যের সদর দপ্তর হয়। এখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করিয়া বাণিজ্য কেন্দ্রকে সুরক্ষিত করা হয়। ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান প্রতিযোগী ওলন্দাজ ও ফরাসীদের বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়। ওলন্দাজগণ বাটাভিয়ার (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) মসলার ব্যবসার উপর জোর দেন। ফরাসী সরকারের নিস্পৃহতা ও বাংলায় ফরাসী গভর্ণরদের উদ্যমহীনতার জন্য ফরাসী বাণিজ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। কেবল দুপ্লের চন্দননগরে গভর্ণর থাকাকালীন (১৭৩১-৪১) ফরাসী বাণিজ্যে অল্পকালের জন্য প্রাণসঞ্চার হয়। ইংরেজ কোম্পানী আরও কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত যাহা অন্য কোম্পানীগুলির ছিল না। ইংরেজরা বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত। শাহ্‌জাহান-পুত্র বাংলার গভর্ণর শাহ্‌সুজা তাহাদের এই অধিকার দেন। কোম্পানী সরকারকে বাৎসরিক মাত্র তিন হাজার টাকা নজরানা দিত। ইহার ফলে ইংরেজ কোম্পানীর বাংলা বাণিজ্যে উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। বাংলার ঢাকা, কাশিমবাজার, মালদা, রাজমহল, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলীতে কোম্পানীর প্রধান বাণিজ্য কুঠী ছিল। ১৭১৭ খ্রীঃ মুঘল সম্রাট ফারুখশিয়ার কোম্পানীকে এক নূতন বাণিজ্য সনদ দেন। ঐ বাদশাহী ফার্মান বা সনদে কোম্পানীকে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার এবং কলিকাতার পাশে আরও আটত্রিশখানি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে বিনাশুল্কে টাকা ছাপানোর সুবিধাও দেওয়া হয়। এইসব কারণে সম্রাট ফারুখশিয়ারের ফার্মানকে কোম্পানীর মহাসনদ (Magna carta) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

সম্রাটের আদেশ লাভ করিবার পর ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ কোম্পানীর মোট এশীয় বাণিজ্যের ষাট শতাংশ বাংলার সঙ্গে।[১] এই যুগে কোম্পানী বাংলা হইতে অঢেল সুতীবস্ত্র, মসলিন, কাঁচা রেশম, সোরা, আফিম প্রভৃতি রপ্তানী করিত। বাংলায় আমদানী করিত সোনা, রূপা, ব্রডক্লথ,[২] পশমের কাপড়, দস্তা, সীসা, লোহা, টিন, তামা, পারদ প্রভৃতি। পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ইংরেজদের বাংলায় আমদানীকৃত মোট পণ্যের ৭৪ শতাংশ ছিল সোনা ও রূপা। ১৭০০ খ্রীঃ ইংরেজদের বাংলা হইতে মোট রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮,৯৬,৯৬৮ টাকা। ১৭৪২ খ্রীঃ এই বাণিজ্য বাড়িয়া হয় ৪৪,৮৩,১৬০ টাকা।[৩]

বাংলার নবাবদের সহিত বিরোধ

বাংলার নবাবরা বৈদেশিক বাণিজ্যের তাৎপর্য বুঝিতেন। ইহার ফলে দেশে সম্পদ সৃষ্টি হয় এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি ঘটে তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাঁহারা বৈদেশিক বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করিতেন না। (১) তবে মুঘল সাম্রাজ্যের

---

(১) P. J. Marshal, East Indian Fortunes.

(২) এক ধরনের সুতী ও পশমের মিশ্র ঝকমকে কাপড়।

(৩) K. N. Chowdhuri, The Trading World of Asia and the English East India Company.

পতনোন্মুখ অবস্থার কথা মনে রাখিয়া তাঁহারা চাহিতেন না যে বিদেশী কোম্পানীগুলি ভূখণ্ড অধিকার করিয়া দুর্গ তৈয়ারি করুক বা সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া রাজশক্তিতে পরিণত হউক। মুর্শিদকুলী খান হইতে সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত বাংলার নবাবগণ চাহিতেন ইউরোপীয়গণ আর্মেনীয়দের মত শুধু বণিক হিসাবে এই দেশে বাণিজ্য করুক। বিদেশীদের নূতন ভূখণ্ড অধিকার, উপনিবেশ স্থাপন, দুর্গ নির্মাণ ও সৈন্য সংগ্রহ তাঁহারা পছন্দ করিতেন না। (২) সম্রাট ফারুখশিয়ার ইংরেজ কোম্পানীকে কলিকাতার পাশে আটত্রিশখানি গ্রাম কিনিবার অনুমতি দেন। মুর্শিদকুলী খান সরাসরি সম্রাটের আদেশের বিরোধিতা করেন নাই। তবে গোপনে তিনি ইংরেজদের নূতন ভূখণ্ড অধিগ্রহণে বাধাদান করেন। নানা অজুহাতে মুর্শিদাবাদের টাঁকশালও তিনি ইংরেজদের ব্যবহার করিতে দেন নাই। (৩) বাংলার নবাবদের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর বিরোধের অপর কারণ ছিল শুল্ক। ইংরেজ কোম্পানী এদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত। বাংলার নবাবরা মনে করিতেন সম্রাট প্রদত্ত এ অধিকার শুধু তাহাদের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোম্পানীর কর্মচারীরা যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য করিত তাহার জন্য নয়। (৪ কোম্পানীর কর্মচারীরা কোম্পানীকে প্রদত্ত বাণিজ্যিক অধিকারের অপব্যবহার করিত। কোম্পানীর ছাড়পত্র বা 'দস্তক' তাহারা এদেশীয় বণিকদের নিকট বিক্রয় করিয়া রাজকোষের ক্ষতি করিত। (৫) নবাব বা তাঁহার প্রিয় পাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ একচেটিয়া বাণিজ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ বিরোধের সৃষ্টি করিত। লবণ, তামাক, সুপারী, চুন ইত্যাদি পণ্যে বাণিজ্য ছিল নবাবের একচেটিয়া। ইহাতে কোম্পানীর কর্মচারীরা হাত দিলে সংঘর্ষ শুরু হইত। শতকের প্রথমার্ধে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপের প্রশ্নে বাংলার নবাবদের সহিত কোম্পানীর বিরোধ দেখা দেয়।

সিরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের বিরোধ :

আলিবর্দী খানের রাজত্বের শেষদিকে কর্ণাটকে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইলে বাংলায় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এখানেও ইংরেজগণ তাহাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের সুযোগ খুঁজিতে থাকে। রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা যে বাণিজ্যে অধিক লাভের কারণ হয় তা বুঝিতে তাহাদের দেরী হয় নাই। ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের নির্মূল করিতে পারিলে যে লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়া যায় তাহাতে সন্দেহ ছিল না। ১৭৫৬ খ্রীঃ নবাব আলিবর্দী খানের মৃত্যু হইলে ইংরেজদের সামনে সুযোগ উপস্থিত হয়। নূতন নবাব আলিবর্দী খানের দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা ছিলেন বয়সে তরুণ, অনভিজ্ঞ এবং উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধে লিপ্ত। দাক্ষিণাত্যের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট ইংরেজগণ বাংলার স্বাধীন নবাবকে সরাইয়া তাহাদের পছন্দমত একজন 'পুতুল নবাবকে' সিংহাসনে বসাইতে তৎপর হইয়া উঠে।

কর্ণাটক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা

হিলের মত

ইংরেজ ঐতিহাসিক এস. সি হিলের মতে,[১] সিরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের বিরোধের মোট কারণ চারিটি ঃ (১) বাংলার হিন্দু অভিজাতগণ মুসলিম শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহারা গোপনে মুসলমান শাসনের অবসানের চেষ্টা করিতেছিলেন। মুসলমান শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য ইঁহারা ইংরেজদের সাহায্য-প্রার্থী হন। (২) সিরাজুদ্দৌলা ছিলেন নিষ্ঠুর, উচ্ছৃংখল ও অত্যাচারী। তাঁহার শাসনে জনগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীঃ হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতদের ষড়যন্ত্র তাঁহার কুশাসনের ফল বলা যাইতে পারে। (৩ আলিবর্দী খানের রাজত্বকালে সিরাজ একবার ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠী পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইংরেজরা সিরাজের উচ্ছৃংখল চরিত্রের কথা জানিত। সেইজন্য নানা অজুহাতে তাহারা সিরাজের প্রস্তাবকে এড়াইয়া যায়। ইহাতে সিরাজ ইংরেজদের উপর ক্ষুণ্ণ হন। সিরাজ সিংহাসন গ্রহণ করিবার পর প্রথমত ইংরেজগণ উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে স্বীকৃতি জানায় নাই। এই দুইটি ঘটনায় সিরাজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং তিনি ইংরেজদের উপর বিরক্ত হন। (৪) সিরাজ কলিকাতা নগরীর ঐশ্বর্যের খবর রাখিতেন। ঐ ঐশ্বর্য হস্তগত করিবার জন্য তিনি লালায়িত হইয়া উঠেন। প্রথম সুযোগেই কলিকাতা আক্রমণ করিয়া তিনি লুণ্ঠন করেন। ইহাতে ইংরেজদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়। নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে অন্য সমস্ত বিরোধীয় বিষয়কে হিল সাহেব সিরাজুদ্দৌলার 'অজুহাত' (pretext) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ব্রিজেন গুপ্ত এই 'অজুহাতগুলিকে' সিরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের বিরোধের আসল কারণ বলিয়া মনে করেন।[২] (৫) ১৭৫৬ খ্রীঃ ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) শুরু হইলে এদেশে ইংরেজ ও ফরাসীরা দুর্গ-সংস্কার, সৈন্যসংগ্রহ ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিতে থাকে। নবাব তাঁহার রাজ্য মধ্যে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে নিষেধ করেন। দুর্গ-সংস্কারের কাজ বন্ধ করিবার আদেশ দেন। ফরাসীরা নবাবের আদেশ মানিয়া লয়। ইংরেজরা নানা ছলছুতায় নবাবের আদেশ অমান্য করে। (৬) নবাব সিরাজুদ্দৌলার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের নিকট হিসাব চাওয়া হইলে তিনি তাঁহার সঞ্চিত সম্পদসহ পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় ইংরেজ আশ্রয়ে পাঠাইয়া দেন।


সিরাজুদ্দৌলা

(১) S. C. Hill, Bengal in 1756-57.

(২) Brijen Gupta, Sirajuddaulah and the English East India Company.

নবাব বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কৃষ্ণদাসকে নবাবের হস্তে সমর্পণ করা হয় নাই। ইহাতে নবাব ক্ষুব্ধ হন। (৭) নবাব সিরাজুদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে বিচার বিভাগীয় এক্তিয়ার লইয়া বিরোধ দেখা দেয়। অনেক অপরাধী কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় লইত। নবাব উহাদের শাস্তি দিতে পারিতেন না। ইংরেজ কোম্পানী ছিল নবাবের চোখে একজন জমিদার মাত্র। অধীনস্থ জমিদারের ঔদ্ধত্য নবাবের নিকট অসহ্য হয়। (৮) ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীগণ বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ লইত এবং কোম্পানীর 'দস্তক' বা ছাড়পত্র এদেশীয় বণিকদের নিকট বিক্রয় করিত। কর্মচারীরা নিজেদের বাণিজ্যের জন্য সরকারী শুল্ক দিত না এবং এদেশীয় বণিকরা কোম্পানীর দস্তক লইয়া শুল্ক ফাঁকি দিত। ইহাতে নবাবের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হইত। ১৭৫৬ খ্রীঃ জুন মাসে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজদের নিকট হইতে শুল্কের ক্ষতিপূরণ বাবদ দুই কোটি টাকা দাবী করেন। (৯) ইংরেজ কোম্পানী নবাবের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রথমে তাহারা সিরাজের মাতৃস্বসা ঘসেটি বেগমের পক্ষ লয়। সিরাজ ঘসেটি বেগমকে বন্দী করিলে ইংরেজগণ সিরাজের অপর মাতৃস্বসার পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব সৌকত জঙ্গকে সমর্থন করে। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজদের শত্রুতার অকাট্য প্রমাণ পাইয়া ১৭৫৬ খ্রীঃ জুন মাসে প্রথমে ইংজেদের কাশিমবাজার কুঠী ও পরে কলিকাতা দখল করিয়া লন।

পলাশীর যুদ্ধ ঃ কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংরেজগণ ফলতায় আশ্রয় লয়। ইংরেজদের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া মাদ্রাজ হইতে ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে কোম্পানীর স্থল ও নৌবহর তাহাদের সাহায্য করিতে আসে। ১৭৫৭ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ক্লাইভ কলিকাতা পুনর্দখল করেন। এই সময় হইতে ইংরেজগণ নবাব সিরাজুদ্দৌলার দরবারের ক্ষমতাশালী উচ্চ রাজপুরুষদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, ব্যাঙ্কার জগৎশেঠ, ব্যবসায়ী আমিনচাঁদ, সেনাপতি ইয়ার লতিফ, মন্ত্রী রায়দুর্লভ প্রভৃতি এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। ঠিক হয় নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে বাংলার নবাব করা হইবে। মীরজাফর ইংরেজদের বাণিজ্যাধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি ও কোম্পানীর কর্মচারীদের পুরস্কারদানে স্বীকৃত হন। এই মর্মে এক গোপন চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ষড়যন্ত্র



ক্লাইভ

পরের মাসে সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী সওকত জঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করেন। আফগান দলপতি আহম্মদ

শাহ্ আবদালীর বাংলা আক্রমণের আশঙ্কায় সিরাজ ইংরেজদের সহিত বিরোধ মিটাইয়া লন। ১৭৫৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ইংরেজদের সহিত আলীনগরের সন্ধি করেন। ইংরেজদের সমস্ত বাণিজ্যিক অধিকার ফেরত দেওয়া হয়। নবাব ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজী হন। তবে ইংরেজরা আর নবাবকে বিশ্বাস করিতে রাজী ছিল না। ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছিল। নবাব ফরাসীদের প্রতি বন্ধু মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করেন। নবাব ফরাসীদের রক্ষা করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইলে ১৭৫৭ খ্রীঃ ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে নবাব বাহিনীর সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব এই যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে ধৃত ও নিহত হন।

পলাশীর যুদ্ধ
২৩শে জুন, ১৭৫৭

পলাশী যুদ্ধের ফলাফল ঃ (১) কবি নবীনচন্দ্রের মতে, পলাশীর যুদ্ধ ভারতের ভাগ্যে অন্ধকারময়ী চিররাত্রির সূচনা করিয়াছিল।[১] ইংরেজরা মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া বাংলার সঞ্চিত সম্পদের ভাগ লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক অধিকার সুদৃঢ় করা হয়। নূতন নবাব মীরজাফর কোম্পানীকে ২৪ পরগনার জমিদারী উপঢৌকন দেন। সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কোম্পানীর সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারীকে পুরস্কার হিসাবে বেশ বড় অঙ্কের টাকা দেওয়া হয়। একা ক্লাইভ পাইয়াছিলেন কুড়ি লক্ষেরও কিছু বেশী টাকা।

(২) সামরিক দিক হইতে বিচার করিলে পলাশীর যুদ্ধ ছিল অতি সামান্য ঘটনা। এইখানে যুদ্ধ হইয়াছিল নামমাত্র। পলাশী প্রান্তরে ইউরোপীয় যুদ্ধ-পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব বা ইংরেজদের শৌর্য-বীর্যের পরীক্ষা হয় নাই।

(৩) তবে গুরুত্বে এই যুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধগুলির অন্যতম। এই যুদ্ধে জয়ের ফলে বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের পথ সুগম হয়। ব্রিটিশের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের দাবীদার রূপে ইংরেজরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। সমৃদ্ধ বাংলা প্রদেশের রাজস্ব ও সম্পদে তাহারা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে। এই সম্পদ ও সৈন্যবাহিনী ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতারও মীমাংসা করিয়া দেয়।

(৪) পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজ কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের হাতে অপরিমিত সম্পদ তুলিয়া দেয়। বাংলায় যে তাহারা প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী এই ধারণা ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইংরেজগণ সমস্ত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করিতে থাকে। এদেশীয় বণিক বা অন্যান্য বিদেশীরা কোণঠাসা হইয়া পড়ে। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বাজারের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

(১) 'নিভিল গৃহের দীপ, নিভিল তপন, ভারতের শেষ আশা হইল স্বপন।'

(৫) আমেরিকার ঐতিহাসিক এ্যাডাম ব্রুকস্ মনে করেন বাংলার সম্পদ ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের সহায়ক হয়। পলাশী যুদ্ধের পর হইতে বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্বে কোম্পানীর রপ্তানী পণ্য ক্রয় শুরু হয়। এখানকার সম্পদ কোম্পানীর মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খরচ মিটাইতে ব্যয় করা হয়। দেশ হইতে সোনা রূপা বা পণ্য আনিবার আর প্রয়োজন রহিল না। কোম্পানীর চীন বাণিজ্যের টাকাও এইস্থানে হইতে সরবরাহ করা হইত। এককথায় বলা যায় পলাশীর পর হইতে বাংলার লুণ্ঠন ও শোষণ পর্ব শুরু হয়। এইজন্য ঐতিহাসিকগণ পলাশী পরবর্তী যুগকে নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ (Plassey plunder) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মীরজাফর ঃ পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের সহায়তায় মীরজাফর বাংলার নবাবী লাভ করেন। অল্পকাল পরেই ইংরেজদের বন্ধুত্বের তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন। ইংরেজগণ ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। তাহাদের টাকার দাবী মিটাইতে তিনি সর্বস্বান্ত হইয়া যান। সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনের ব্যয় মিটাইবার মত অর্থও তাঁহার থাকিত না। বাংলার প্রতিরক্ষার জন্য তিনি ক্রমশঃ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। নবাব মীরজাফর কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারেন নাই। ১৭৬০ খ্রীঃ এক গোপন চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানী নবাব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার নবাব করেন।

মীরকাশিম (১৭৬০-১৭৬৩) ঃ মীরকাশিম বাংলার নবাব হইয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রচুর উপঢৌকন দেন। কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী অধিকার ছাড়িয়া দেন। মীরকাশিম ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রশাসনিক-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং কোম্পানীর সমস্ত পাওনা টাকা মিটাইয়া দেন। নূতন কর ধার্য করিয়া সরকারের আয় বাড়ান। যুদ্ধবিদ্যায় ইউরোপীয় পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি নবাবের অধীনে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত সৈন্য-বাহিনী গঠন করেন। সরকারী প্রশাসনে ইংরেজদের প্রতি বন্ধু মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের তিনি একে একে অপসারিত করেন। মুর্শিদাবাদ হইতে দূরবর্তী মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন।



মীরকাশিম

বিদেশী কর্তৃত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য নবাব মীরকাশিম কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ইহা ইংরেজদের পছন্দ হইল না। শীঘ্রই অভ্যন্তরীণ শুল্ক ও বাণিজ্যের প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে বিরোধ শুরু হইল। কোম্পানীর কর্মচারীগণ বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত। কোম্পানীর দস্তকগুলি কর্মচারীরা এদেশীয় বণিকদের নিকট বিক্রয় করিত। ইহাতে রাজকোষের ক্ষতি হইত এবং এদেশীয় বণিকগণ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইত। ইহা ছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ প্রায় স্বাধীনভাবে জবরদস্তি করিয়া বাংলাদেশে বাণিজ্য করিত। জোর করিয়া নিজেদের খুশিমত দামে জিনিসপত্র ক্রয় করিত, আবার জবরদস্তি করিয়া উচ্চহারে নিজেদের পণ্য বিক্রয় করিত। নবাবের কর্মচারীরা বাধা দিলে তাহাদের প্রহার ও বন্দী করিত। অর্থাৎ নবাবের ন্যায্য অধিকার ও এক্তিয়ার তাহারা মানিত না। মীরকাশিম কলিকাতা কাউন্সিলের নিকট অভিযোগ করেন যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক খাতে রাজকোষের বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ পঁচিশ লক্ষ টাকা।[১] ইংরেজ ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পীয়ার এই পর্বকে (১৭৫৭-৬৫) প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মীরকাশিম ইংরেজদের আচরণে বিরক্ত হইয়া দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দেন। ইহাতে কোম্পানীর কর্মচারীদের স্বার্থহানি হয়। তাহারা কোম্পানীকে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য করে।

মীরকাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে বিরোধ

নবাব মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের বিরোধের আসল কারণ হইল রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে সৃষ্ট সঙ্কট। মীরকাশিম ভাবিতেন তিনি স্বাধীন নবাব। ইংরেজরা ভাবিত তাহারাই বাংলাদেশে আসল রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী; নবাব তাহাদের হাতে ক্রীড়নকমাত্র। একদেশে দুই রাজার রাজত্ব চলিতে পারে না। বাংলাদেশে কে আসল রাজা এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য নবাব মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাধিয়াছিল।[২]

বক্সারের যুদ্ধ ঃ ১৭৬৩ খ্রীঃ ইংরেজদের সহিত নবাব মীরকাশিমের যুদ্ধ শুরু হইলে বৃদ্ধ মীরজাফরকে আবার বাংলার নবাব পদে বসানো হয়। মীরকাশিম পরপর কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় নেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, পলাতক মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ও নবাব মীরকাশিম মিলিতভাবে ১৭৬৪ খ্রীঃ বাংলা পুনর্দখলের চেষ্টা করেন। বক্সারে উভয়পক্ষের যুদ্ধে (২২শে অক্টোবর ১৭৬৪) এদেশীয় মিলিত বাহিনী ইংরেজ সেনানায়ক হেক্টর মানরোর (Munro) নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। ভারতের ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। পলাশীর যুদ্ধে ইউরোপীয় তথা ব্রিটিশ সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় নাই। বক্সারে শ্রেষ্ঠ মুঘল বাহিনী ইউরোপীয় রণনীতি, কৌশল ও উন্নত অস্ত্র-শস্ত্রের নিকট পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার

বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব

(১) R. C. Dutta, Economic History of India Vol I.

(২) নন্দলাল চ্যাটার্জী, মীরকাশিম।

একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লাভ করে। অযোধ্যার রাজ্যটিও ইংরেজ কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে চলিয়া আসে। নবাব সুজাউদ্দৌলা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেন। কোম্পানীর সহিত তাঁহার এক প্রতিরক্ষা চুক্তি হয়। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে কোম্পানী তাঁহাকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। অযোধ্যার নবাব কার্যতঃ কোম্পানীর আশ্রিত শক্তিতে পরিণত হয়। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন।

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ঃ ১৭৬৫ খ্রীঃ ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্ণর রূপে ফিরিয়া আসেন। ঐ বৎসর তিনি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সহিত চুক্তির মাধ্যমে বাংলার রাজস্বের অধিকার বা দেওয়ানী লাভ করেন। বিনিময়ে তিনি মুঘল সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অযোধ্যার কোরা ও এলাহাবাদ জেলা দুইটি সম্রাটকে দেওয়া হয়। সম্রাট তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইংরেজ কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। ক্লাইভ বাংলার নূতন নবাব মীরজাফর পুত্র নাজমুদ্দৌলার সহিত এক নূতন বন্দোবস্ত করেন। ঠিক হয় নবাব বাংলার রাজস্ব হইতে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন। একজন ডেপুটি নবাব বা সুবাদার নবাবের নামে দেশ শাসন করিবেন। তিনি হইবেন ইংরেজদের আস্থাভাজন ও মনোনীত ব্যক্তি। নবাব তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভের ফলে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর অধিকার ও প্রভুত্ব আইনগত স্বীকৃতি পায়। সম্রাট কোম্পানীকে তাঁহার সমৃদ্ধতম প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব দান করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় শক্তিগুলি ইংরেজদের আইনগত অধিকার মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ডেপুটি সুবাদারের মাধ্যমে সমগ্র শাসনব্যবস্থার উপর ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাবের সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। রাজনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার রাজস্ব ও বাণিজ্যের উপর ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে কোম্পানীর আর সম্পদের অভাব রহিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার (১৭৬৭-১৮৫৭)

(British Imperial Expansion)

(ক) ইঙ্গ-মারাঠা দ্বন্দ্ব (Anglo-Maratha conflict)—১৭৭৫-১৮১৭ ঃ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মারাঠারা ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হয়। দাক্ষিণাত্যে তাঁহারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উত্তর ভারতে মুঘল সম্রাট হন তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তি। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে আফগানদের নিকট পরাস্ত হইলেও

মারাঠা শক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই। অসাধারণ প্রতিভাবান পেশোয়া প্রথম মাধবরাও (১৭৬১-৭২) অতি অল্প সময়ের মধ্যে মারাঠা শক্তিকে সংগঠিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। তিনি দাক্ষিণাত্যে নিজাম ও হায়দার আলিকে পরাস্ত করিয়া মারাঠাদের আধিপত্য পুনরুদ্ধার করেন। উত্তর-ভারতে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম মারাঠা রক্ষণাধীনে দিল্লীতে প্রবেশ করেন।[১] মারাঠা জাতির দুর্ভাগ্য এই সাহসী, উদ্যমী ও প্রতিভাবান পেশোয়ারের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মারাঠা রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। পেশোয়া প্রথম মাধবরাওয়ের ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশোয়া হন। নারায়ণরাওয়ের অনভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথরাও পেশোয়া পদ লাভের চেষ্টা করেন। রঘুনাথরাওয়ের ইঙ্গিতে পেশোয়া নারায়ণরাও নিহত হন (১৭৭৩)। রঘুনাথরাও নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। বিরোধীপক্ষ পেশোয়া নারায়ণরাওয়ের শিশুপুত্র দ্বিতীয় মাধবরাওকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। এই দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন নানাফাড়নীশ। ইহা 'বারভাইদের দল' নামে পরিচিত। মারাঠাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হইয়া যায়। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কর্তৃপক্ষ মারাঠাদের গৃহ-বিবাদের সুযোগ লইয়া নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ সুরাট চুক্তিতে তাঁহারা রঘুনাথরাওকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। বিনিময়ে ইংরেজরা লাভ করে সলসেত, বেসিন নামক দুইটি দ্বীপ এবং সুরাট ও ব্রোচের রাজস্বের একাংশ। পেশোয়া রঘুনাথরাও ইংরেজদের বন্ধু হন। বোম্বাই কাউন্সিল বাংলা ও মাদ্রাজের ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইয়া মারাঠাদের সহিত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ সাত বৎসর স্থায়ী হয় (১৭৭৫-৮২)। প্রথম দিকে মারাঠাবাহিনী তালগাঁওয়ের যুদ্ধে ইংরেজদের পরাস্ত করে। ইংরেজগণ মারাঠাদের সহিত অপমানজনক ওয়াদগাঁওয়ের চুক্তি করিতে বাধ্য হন। এই চুক্তি অনুসারে ইংরেজরা বিজিত স্থান প্রত্যর্পণ ও রঘুনাথরাওয়ের পক্ষ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন।

মারাঠা রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ১৭৭৫ ৮২

এই সময়টা ভারতে ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে ছিল অত্যন্ত দুঃসময়। নানাফাড়নীশের নেতৃত্বে সমস্ত মারাঠা সর্দারগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। মহীশূরের হায়দার আলি ও হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশের জয়ের আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। ফরাসীরাও ইংরেজ শক্তির উপর আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। এই দুঃসময়ে গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস অসাধারণ মনোবল ও উদ্যমের পরিচয় দেন। তিনি কূটকৌশলে নিজামকে বশ করিয়া ইংরেজদের পক্ষে আনেন। প্রবল বিক্রমে ইংরেজগণ মধ্য ভারত আক্রমণ করিয়া নিজেদের সামরিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা

(১) ১৭৭২ খ্রীঃ পর্যন্ত সম্রাট ব্রিটিশ রক্ষণাধীনে এলাহাবাদে ছিলেন।

করেন। শেষপর্যন্ত মহাদজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় ১৭৮২ খ্রীঃ সলবাইয়ের সন্ধিতে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় নাই। ইংরেজগণ রঘুনাথরাওয়ের পক্ষ ত্যাগ এবং দ্বিতীয় মাধবরাওকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হন। ইংরেজগণ সলসেত লাভ করেন তবে সিন্ধিয়ার অধিকৃত অঞ্চল ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। পরবর্তী বিশ বৎসর ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি অব্যাহত ছিল। এই সময়কালে ইংরেজ শক্তি মহীশূর, হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যার উপর নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করিতে সক্ষম হয়। অপরদিকে মারাঠা নায়কগণ নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদে মত্ত হইয়া অযথা শক্তিক্ষয় করেন।

সলবাইয়ের সন্ধি—১৭৮২



ওয়ারেন হেস্টিংস

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে মারাঠাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শিথিল। পেশোয়া ছিলেন এই ব্যবস্থার প্রধান। তাঁহার নামমাত্র অধীনে ছিলেন চারজন মারাঠা রাষ্ট্রনায়ক—গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, নাগপুরের ভোঁসলে ও বরোদার গাইকোয়াড়। ইঁহারা সকলেই রাজপাট ও পৃথক সৈন্যবাহিনীসহ প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। মারাঠাদের দুর্ভাগ্য অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে তাহাদের অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নেতাদের মধ্যে কেহই জীবিত ছিলেন না। মহাদজী সিন্ধিয়া, তুকোজী হোলকার, অহল্যাবাঈ হোলকার, পেশোয়া দ্বিতীয় মাধবরাও ও নেতা নানাফাড়নীশ সকলেই মারা যান। নূতন নেতারা উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ভারতে ইংরেজদের আগ্রাসী নীতির মর্ম বা তাৎপর্য অনুধাবন করিতে পারেন নাই। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ছিলেন অপদার্থ ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়। তিনি মারাঠা নায়কদের পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্বে উৎসাহ দিতেন। এইভাবে তিনি নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। যশোবন্তরাও হোলকার ও দৌলতরাও সিন্ধিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তিনি সিন্ধিয়ার পক্ষ লন। যশোবন্তরাও হোলকার সিন্ধিয়া ও পেশোয়ার মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করিলে (অক্টো ১৮০২) পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেসিনের চুক্তিতে (৩১ ডিসে ১৮০২) বাজীরাও ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করেন। মারাঠারা স্বাধীনতা হারান।

দ্বিতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ ১৮০৩-১৮০৫

পেশোয়া মারাঠাদের স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিলেও অন্যান্য মারাঠা নায়কগণ তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। পেশোয়া অল্পদিনেই নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। তিনি গোপনে অন্যান্য মারাঠা

নায়কদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দেন। মারাঠাজাতির এই অতি দুঃসময়েও সমস্ত মারাঠা নায়কগণ ঐক্যবদ্ধ হইতে পারেন নাই। গাইকোয়াড় প্রকাশ্যে ইংরেজদের সহিত সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করেন। হোলকার নিরপেক্ষভাবে যুদ্ধ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এই যুদ্ধ হয়। আর্থার ওয়েলেস্‌লী ১৮০৩ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে দাক্ষিণাত্যে আসাই (Assaye) নামক স্থানে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেন। উত্তর ভারতে লর্ড লেকের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনী ১৮০৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে লাসওয়ারী (Laswari) নামক স্থানে সিন্ধিয়ার বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া আলিগড়, দিল্লী, আগ্রা অধিকার করিয়া লয়। অন্ধ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইংরেজদের বৃত্তি ভোগীতে পরিণত হন। ভোঁসলে সিন্ধিয়া উভয়েই ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। উভয় রাজাই নিজেদের রাজ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ও রেসিডেণ্ট গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যের একাংশ ছাড়িয়া দেন। ইঁহারা স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার অধিকারও হারান।

আসাই ও লাসওয়ারীর যুদ্ধ—মারাঠাদের পরাজয়

সিন্ধিয়া ও হোলকারকে পরাস্ত করিয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী এবার হোলকারের দিকে দৃষ্টি দেন। হোলকার বিনাযুদ্ধে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না। হোলকার তাঁহার মিত্ররাজ্য ভরতপুরের সহিত একযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ইংলণ্ডে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ভারতে ধন ও লোকক্ষয়কারী এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ অনুমোদন করেন নাই। তাঁহারা ইহার অবসান চান। ইউরোপে তখন নেপোলিয়ন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছিলেন। কোম্পানীর আদেশে গভর্ণর-জেনারেল ওয়েলেসলী দেশে ফিরিয়া যান। ১৮০৬ খ্রীঃ হোলকারের সহিত চুক্তি করিয়া কোম্পানী শান্তি স্থাপন করে। হোলকার তাঁহার রাজ্যের বেশীর ভাগ ফেরত পান।

হোলকারদের সহিত যুদ্ধ

দ্বিতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ মারাঠাদের পর্যুদস্ত করিয়াছিল ঠিকই তবে তাহাদের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে নাই। স্বাধীনভাবে টিকিয়া থাকিবার বাসনা তখনও তাহাদের মনে জাগরূক ছিল। ইংরেজদের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্ব এবং অভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ মারাঠা নায়কদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮১৭ খ্রীঃ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে হৃতমর্যাদা ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য মারাঠা নায়কগণ শেষ চেষ্টা করিয়াছলেন। মারাঠাদের দুর্ভাগ্য তাহারা সমবেতভাবে সুচিন্তিত কর্মসূচীর অনুসরণ করিতে পারে নাই। পুনায় ব্রিটিশ রেসিডেন্সি আক্রমণের মধ্যদিয়া সংঘর্ষ শুরু হয়। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংস অতি দ্রুত সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি সিন্ধিয়াকে ব্রিটিশ প্রভুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য করেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পেশোয়া, হোলকার ও ভোঁসলের বাহিনীকে পরাজিত করে। ব্রিটিশের

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও মারাঠাদের পতন

উন্নত রণকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রের নিকট মারাঠাদের পরাজয় হয়। অপরদিকে মারাঠা নায়কদের মধ্যে বিরোধ ও কলহ ইংরেজদের ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধে জয়লাভে সাহায্য করে। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে পদচ্যুত করিয়া কানপুরের নিকট বিঠুরে নির্বাসিত করা হয়। হোলকার ও ভোঁসলের ক্ষমতা খর্ব করিয়া অধীনস্থ রাজ্যে পরিণত করা হয়। পেশোয়ার রাজ্যের একাংশে শিবাজীর এক বংশধরকে স্থাপন করিয়া ব্রিটিশের অধীন ক্ষুদ্র সাতারা রাজ্য গঠন করা হয়। পেশোয়ার বাকী রাজ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিন্ধিয়া ও হোলকারের অধীন রাজপুত রাজ্যগুলি ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া অধীনস্থ রাজ্য হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

(খ) ইঙ্গ-মহীশূর দ্বন্দ্ব (Anglo-Mysore conflict)—১৭৬৭-১৭৯৯ :

দক্ষিণ ভারতে হায়দার আলির নেতৃত্বে শক্তিশালী মহীশূর রাজ্যের আবির্ভাব মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজ কাহারও মনঃপূত হয় নাই। পানিপথের যুদ্ধের পরে দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের সামরিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া হায়দার আলি তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করেন।



হায়দার আলি

হায়দার আলির শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া নিজাম ইংরেজদের সহায়তায় তাঁহাকে দমনের জন্য উদ্যোগী হন। ইংরেজদের ধারণা হয় হায়দার আলি ফরাসীদের প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন। আর ফরাসীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন যে কোন রাজ্য ইংরেজদের শত্রু। নিজাম ও ইংরেজদের মিলিত শক্তি সাধারণ শত্রু হায়দার আলির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের শুরু হয়। হায়দার আলির শক্তি ইংরেজদের তুলনায় নেহাত কম ছিল না। তিনি অমিত-বিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়া মাদ্রাজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। মাদ্রাজে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ হায়দার আলির শর্ত মানিয়া লইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। ১৭৬৯ খ্রীঃ সন্ধির শর্তানুযায়ী উভয় পক্ষ বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করে। এই সন্ধির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল তৃতীয় পক্ষ আক্রমণ করিলে উভয়পক্ষ একজোট হইয়া তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ—১৭৬৭-৬৯

মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই শর্তটি লঙ্ঘন করিতে দ্বিধা করেন নাই। ১৭৭১ খ্রীঃ মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করিলে ইংরেজ শক্তি চুক্তিমত হায়দার আলিকে কোন সাহায্য দেন নাই। এই ঘটনার পর হায়দার আলি আর কোনদিন ইংরেজদের উপর

আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। বরং ইংরেজদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব সৃষ্টি হয়। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮২) চলাকালীন হায়দার আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার অস্ত্রধারণ করেন (১৭৮০-১৭৮৪)। এই যুদ্ধেও হায়দার রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। কর্ণাটকের বেশীর ভাগ অঞ্চল তাঁহার দখলে আসে।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ১৭৮০-১৭৮৪

দ্বিতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ চলাকালীন গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কূটকৌশলে নিজামকে নিজের দলে টানিয়া লইতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, বিপদ বুঝিয়া তিনি অতি দ্রুত ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটান। গভর্ণর-জেনারেলের এই সমস্ত কূটনৈতিক কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া হায়দার আলিকে আঘাত হানা। ১৭৮১ খ্রীঃ পোর্টো নোভোর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকুটের নিকট হায়দার আলি পরাস্ত হন। ১৭৮২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে হায়দার আলির মৃত্যু হইলে তাঁহার বীর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যান। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত দেখিয়া উভয়পক্ষ ১৭৮৪ খ্রীঃ মার্চ মাসে শান্তি স্থাপন করিতে রাজী হয়। ম্যাঙ্গালোর সন্ধির শর্তানুযায়ী উভয় পক্ষের বিজিত স্থান প্রত্যর্পণ ও বন্দী বিনিময় করা হয়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি ও টিপু সুলতানের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হয় নাই। সাময়িক যুদ্ধ বিরতি হইয়াছিল মাত্র। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে একমাত্র টিপু সুলতান ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপটি ধরিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর ইংরেজদের উৎখাতের জন্য তিনি সারা জীবন চেষ্টা করিয়া যান। টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশী ও বিদেশী রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। ফ্রান্স, তুরস্ক ও আফগানিস্তানে দূত পাঠাইয়া তিনি ঐসব রাষ্ট্রের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরেজরাও টিপু সুলতানকে তাহাদের প্রবলতম শত্রু বলিয়া মনে করিত। অভিজ্ঞ যোদ্ধা ও কূটকৌশলী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ টিপু সুলতানের মনোভাব ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল টিপু সুলতানকে ভারতীয় রাজনীতিতে নিঃসঙ্গ ও বন্ধুহীন রাখা। টিপু ইংরেজদের বন্ধুরাজ্য ত্রিবাংকুর আক্রমণ করিলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয় (১৭৮৯-৯২)। টিপু সুলতান সম্মিলিত মিত্র বাহিনীর

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ১৭৮৯-৯২


টিপু সুলতান

বিরুদ্ধে একাকী লড়াই করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধিতে (১৭৯২) ইংরেজদের হস্তে রাজ্যের অর্ধাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তাহা ছাড়া তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিতে ও দুই পুত্রকে জামিন রাখিতে তাঁহাকে বাধ্য করা হয়।

লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮-১৮০৫) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ও নিষ্কণ্টক করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ভারতে আসেন। এই সময় ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে তীব্র লড়াই চলিতেছিল। গভর্ণর-জেনারেল মনে করেন যে, ভারতে ফরাসীদের প্রতি বন্ধু মনোভাবাপন্ন কোন রাজার অস্তিত্ব তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থের পক্ষে হানিকর। টিপু সুলতান ছিলেন ফরাসীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একজন নরপতি। তিনি ভারতে ব্রিটিশ শক্তির পরম শত্রু। টিপু আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহ্‌কে ভারত হইতে ব্রিটিশ বিতাড়নের জন্য আহ্বান জানান। জামান শাহ্ এই সময় ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলী এইরূপ ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির অস্তিত্ব বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি টিপুকে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে আহ্বান জানাইলে মহীশূর সুলতান তাহা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ইংরেজের বৃত্তিভোগী ঘৃণিত জীবন অপেক্ষা সংগ্রামে বীরোচিত মৃত্যু তিনি শ্রেয় বলিয়া মনে করেন। ওয়েলেসলী মহীশূর আক্রমণ করিলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয় (১৭৯৯)। নিজের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমে ইংরেজ আক্রমণ প্রতিরোধকালে টিপু সুলতান মৃত্যুবরণ করেন (১৭৯৯)। টিপুর রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরেজ ও নিজাম নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। বাকী অংশে প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের অধীনে ইংরেজ আশ্রিত মহীশূর রাজ্যের পত্তন করা হয়। মহীশূর রাজ্য তাঁহার স্বাধীনতা হারাইয়া পুরাপুরি ইংরেজদের অধীনস্থ রাজ্যে পরিণত হয়।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ও টিপুর পতন

(গ) **ওয়েলেসলী ও অধীনতামূলক মিত্রতা (Wellesley and subsidiary alliance):**

১৭৯৮ খ্রীঃ লর্ড ওয়েলেসলী গভর্ণর-জেনারেল হইয়া ভারতে আসেন। এই সময় সারা পৃথিবীতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলিতেছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পশ্চিম এশিয়ার মধ্যদিয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারেন ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহলে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়। ভারতে দেশীয় রাজারা ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষদের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। মহাদজী সিন্ধিয়া, নিজাম ও টিপু সুলতানের ফরাসী সেনানায়ক পরিচালিত সৈন্যবাহিনী ছিল। ওয়েলেসলীর ভারত আগমনের আগেই মারাঠা ও মহীশূরের গৌরব রবি অস্তমিত হইয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ইহাই ছিল প্রকৃষ্ট সময়। পররাজ্য গ্রাস করিতে পারিলে অর্থ ও সম্পদ লাভের সম্ভাবনা ছিল খুবই উজ্জ্বল। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ইংলণ্ডের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সমাজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে উৎসাহ দেন। ইঁহারা উপলব্ধি

ওয়েলেসলীর সাম্রাজ্য-বাদী নীতির পটভূমিকা

করিয়াছিলেন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংলন্ডের শিল্পপণ্যের স্থায়ী একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি হইবে। আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা এবং এই দেশীয় শাসকদের জামান শাহের সহিত যোগাযোগ স্থাপন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে লর্ড ওয়েলেসলী মনে করেন ভারতে সার্বভৌম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত দেশীয় শক্তির বশ্যতা ও অধীনতা অভ্যন্তরীণ ফরাসী বিপদ ও বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনাকে দূর করিবে।

গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী শাসক।[১] ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি তিনটি নীতি অনুসরণ করেন ঃ (১) যুদ্ধ, (২) অধীনস্থ রাজ্য অধিগ্রহণ ও (৩) অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতির মাধ্যমে এই দেশীয় স্বাধীন রাজ্যগুলির উপর ব্রিটিশ কোম্পানীর কর্তৃত্ব স্থাপন।


লর্ড ওয়েলেসলী

ওয়েলেসলীর সাম্রাজ্য বিস্তারের তিনটি কৌশল

মহীশূরের সুলতান টিপু ছিলেন ইংরেজদের শত্রু এবং ফরাসীদের বন্ধু। ওয়েলেসলী মহীশূর আক্রমণ করিয়া টিপু সুলতানকে পরাজিত ও নিহত করেন। মহীশূরের একাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। কর্ণাটক, তাঞ্জোর ও সুরাটের উপর ইংরেজদের অধিকার আগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ওয়েলেসলী এই রাজ্যের রাজা ও নবাবদের বৃত্তি দিয়া এই রাজ্যগুলি অধিকার করিয়া লন। এই সমস্ত রাজ্যগুলি সরাসরি ব্রিটিশ শাসনভুক্ত করা হয়।

ওয়েলেসলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে যে অভিনব কৌশলটি প্রয়োগ করেন তাহা এদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর প্রাচীন সম্পর্কের এক মার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ। ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন রাখিয়া বন্ধু রাজ্যকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা কোম্পানী আগেই অযোধ্যার ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়াছিল। সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে বহন করিতে হইত। লর্ড ওয়েলেসলী এই ব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিবর্ধিত রূপ দিলেন যাহাতে এই ধরনের বন্ধু রাজ্যে ব্রিটিশ

(১) P. E. Roberts, India Under Wellesley.

প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ওয়েলেসলী প্রবর্তিত অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল : (১) ব্রিটিশ সার্বভৌম শক্তি, বন্ধুরাজ্য হইবে অধীনস্থ শক্তি। (২) ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী বন্ধু রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। (৩) সৈন্যবাহিনীর ব্যয় মিটাইবার জন্য বন্ধু রাজ্যের একাংশ কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। (৪) একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বন্ধু রাজার দরবারে উপস্থিত থাকিবেন। (৫) কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে সংশ্লিষ্ট রাজা ইংরেজ ব্যতীত অন্য কোন ইউরোপীয়কে নিয়োগ করিতে পারিবেন না। (৬) গভর্ণর-জেনারেলের বিনা অনুমতিতে প্রতিবেশী কোন দেশের সহিত কোন রকম সম্পর্ক স্থাপন করা চলিবে না। কোম্পানী আশ্বাস দেয় যে বন্ধু রাজা অভ্যন্তরীণ শাসনে স্বাধীনতা ভোগ করিবেন। তবে কার্যতঃ ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সর্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে।

অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতির বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতপক্ষে ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষার একটি কৌশল মাত্র। তাঁহার এই ফাঁদে ধরা পড়িয়া দেশীয় রাজারা তাঁহাদের স্বাধীনতা হারান। স্বাধীনভাবে সৈন্যবাহিনী গঠন, শাসন পরিচালন ও পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণের কোন অধিকার তাঁহাদের ছিল না। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর প্রহরায় তাঁহারা জনগণের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া উঠেন। বিদ্রোহের ভয় আর তাহাদের ছিল না। ব্রিটিশ বৃত্তি-ভোগী অধীন রাজা বা নবাবরা শাসন ও সামরিক দক্ষতা হারাইয়া অপদার্থ হন। পরবর্তীকালে এই অপদার্থতার অভিযোগে তাঁহাদের রাজ্যগুলি গ্রাস করা হয়। অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি ইংরেজদের নিকট ছিল খুবই লাভজনক। ভারতীয় রাজাদের অর্থে তাহারা বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতে পারে। তাহাদের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্ফীত হয়। সারা ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকায় বৈদেশিক আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সময় যে কোন ঘাঁটি হইতে অতি দ্রুত সামরিক ব্যবস্থা লওয়া সম্ভব হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যুদ্ধ-বিগ্রহ হওয়ায় কোম্পানীর কোন ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না।

অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতির তাৎপর্য

লর্ড ওয়েলেসলী সর্বপ্রথম হায়দ্রাবাদের নিজামকে তাঁহার অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতিতে আবদ্ধ করেন। নিজাম ছিলেন মারাঠা ও মহীশূরের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। দাক্ষিণাত্যের এই তিনটি শক্তির মধ্যে নিজামই ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল। ১৭৯৮ খ্রীঃ অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণ করিয়া নিজাম ফরাসী সেন্যাধ্যক্ষদের পরিচালিত সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী তাঁহার রক্ষার ভার নেয়। রাজ্যের একাংশ নিজাম ইংরেজদের হাতে তুলিয়া দেন। ১৮০১ খ্রীঃ অযোধ্যার নবাব এই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাকেও অযোধ্যার একাংশ ছাড়িয়া দিতে হয়। ব্রিটিশ-বাহিনী অযোধ্যায় মোতায়েন করা হয়। ইহার পর একে একে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে ও হোলকার অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণ করেন।

হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা ও মারাঠা রাজ্যে অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতির প্রয়োগ

সিন্ধিয়া ও হোলকারের আশ্রিত রাজপুত রাজারাও এই মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হন। লর্ড ওয়েলেসলীর প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ কোম্পানী ভারতে সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হয়।

(ঘ) ইঙ্গ-শিখ দ্বন্দ্ব (Anglo-Sikh conflict) :

রঞ্জিৎ সিংহ : পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিংহ (১৭৯২-১৮৩৯) ছিলেন পাঞ্জাবের বারটি শিখ মিশলের অন্যতম সুকেরচাকিয়া মিশলের নেতা মহাসিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র বার বৎসর বয়সে (১৭৯২ খ্রীঃ) রঞ্জিৎ মিশলের কর্তৃত্ব পান। জামান শাহের ভারত আক্রমণকালে (১৭৯৩-৯৮) তিনি আফগান শাসককে সাহায্য করেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জামান শাহ রঞ্জিৎ সিংহকে লাহোরের গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং 'রাজা' উপাধি দেন। ইহার পর

রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্য-বিস্তার

রাজা রঞ্জিৎ সিংহ বাহুবলে নিজের রাজ্যবিস্তার করিয়া চলেন। বিদেশী সৈন্যাধ্যক্ষদের তত্ত্বাবধানে তিনি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। আধুনিক অস্ত্র-সজ্জিত রঞ্জিতের সৈন্যবাহিনী ছিল সেই যুগে এশিয়ার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাহিনী। কোম্পানীর সৈন্য-বাহিনী ছিল প্রথম স্থানাধিকারী। ধর্ম-নিরপেক্ষ আধুনিক শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রঞ্জিৎ সিংহ শতদ্রুর পশ্চিমদিকের শিখ মিশলগুলি একে একে দখল করিয়া তাঁহার রাজ্য সীমা বাড়াইয়া চলেন। তিনি কাশ্মীর ও মুলতান জয় করিয়া নিজ র্যাজ্যভুক্ত করিয়া লন।



রঞ্জিৎ সিংহ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ চলাকালীন (১৮০৩-১৮০৬) ইংরেজ কোম্পানীর সহিত রঞ্জিৎ সিংহের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমে শক্তিশালী শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোম্পানীর কাম্য ছিল। ইহার ফলে কোম্পানীর

রঞ্জিৎ সিংহের সহিত ইংরেজদের যোগাযোগ

রাজ্য ও বিদেশী শক্তিগুলির (আফগানিস্তান, পারস্য, রাশিয়া ও ফ্রান্স) মধ্যে পাঞ্জাব নিরপেক্ষ তৃতীয় রাজ্য (buffur) হিসেবে ভারতের সীমান্ত রক্ষা করিতে পারে। ১৮০৫ খ্রীঃ মারাঠা নায়ক হোলকার ইংরেজ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পরাস্ত হইয়া রঞ্জিত সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা রঞ্জিৎ সিংহ তখনও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজ রাজ্যের মধ্যে অনেক শিখ সর্দার তাঁহার বিরোধিতা করিত। এমতাবস্থায় রঞ্জিৎ

লাহোর চুক্তি—১৮০৬

ইংরেজ কোম্পানীর সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়াইয়া যান। ১৮০৬ খ্রীঃ লাহোরে তাঁহার সহিত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চুক্তি হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী রঞ্জিৎ সিংহ হোলকারকে পাঞ্জাব হইতে

বিতাড়িত করেন। ইংরেজগণ শতদ্রুর উত্তরদিকে রঞ্জিতের রাজ্য বিস্তারের অধিকার স্বীকার করিয়া লন।

রাজা রঞ্জিৎ সিংহের স্বপ্ন ছিল উত্তর-পশ্চিমের সমস্ত অঞ্চলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া শিখ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। তিনি শতদ্রুর পূর্বদিকে শিখ রাজ্যগুলি দখল করিতে উদ্যত হইলে ঐ অঞ্চলের শিখ সর্দারগণ ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করে। ঐ সময় নেপোলিয়ন পারস্য ও তুরস্কের সহায়তায় ভারত আক্রমণ করিতে পারেন এমন সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ কোম্পানী রঞ্জিৎ সিংহের সহিত সংঘর্ষের ঝুঁকি লইতে পারেন নাই। ১৮০৯ খ্রীঃ প্রথমদিকে নেপোলিয়নের ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা দূর হয়। ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে উন্নতি দেখা দেয়। নেপোলিয়ন উপদ্বীপের যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন এবং দার্দানেলিসের সন্ধিতে (১৮০৯) ইংলণ্ডের সহিত তুরস্কের সম্পর্ক উন্নত হয়। এই সময় ভারতে ইংরেজ শক্তি রাজা রঞ্জিৎ সিংহের আগ্রাসী-নীতির বিরোধিতা করিতে মনস্থ করে। ডেভিড অক্টারলোনী ইংরেজ সৈন্যবাহিনী লইয়া শতদ্রুর দিকে অগ্রসর হন। শিখ রাজা ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি নিজের ও কোম্পানীর সামরিক শক্তির হিসাব রাখিতেন। কোম্পানীকে বাধা দেওয়া নিরর্থক জানিয়া তিনি সামরিক সংঘর্ষের পথ এড়াইয়া যান। ইংরেজ কোম্পানী ও রঞ্জিতের মধ্যে ১৮০৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে অমৃতসরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে শতদ্রুর পশ্চিমতীরে রঞ্জিৎ সিংহের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখা হয়। শতদ্রুর পূর্বতীরে শিখ রাজ্যগুলি ইংরেজ কোম্পানীর আশ্রয় লাভ করে। ইহার ফলে যমুনা হইতে শতদ্রু পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সীমা প্রসারিত হয়। ইংরেজ ও শিখ রাজ্য পরস্পরের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়ায়। রাজা রঞ্জিৎ সিংহের অখণ্ড শিখরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

অমৃতসরের চুক্তি—
২৫শে এপ্রিল, ১৮০৯

ইংরেজদের বাধাদানের ফলে রঞ্জিৎ সিংহ পূর্ব পাঞ্জাবের একাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিতে পারেন নাই। তবে গুর্খাদের নিকট হইতে তিনি কাংড়া জেলাটি দখল করিয়া লইতে সক্ষম হন। রঞ্জিৎ আফগানিস্তানের নিকট হইতে পেশোয়ার দখল করিবার পর ইংরেজগণ আবার তাহার সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন। মুলতান, কাশ্মীর ও পেশোয়ার সহ সিন্ধু উপত্যকার এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া রঞ্জিতের রাজ্য গড়িয়া উঠে। কোম্পানী কূটনৈতিক পথে রঞ্জিতের আফগান-নীতির উপর চাপ দিতে থাকে। ইহার ফলে তিনি আফগান সীমান্তের দিকে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে (১৮২৮-৩৫) রাশিয়া ভারত সম্পর্কে আগ্রহ দেখায়। গভর্ণর-জেনারেল রাজা রঞ্জিৎ সিংহের সহিত দেখা করিয়া ১৮৩১ খ্রীঃ ইঙ্গ-শিখ বন্ধুত্বের চুক্তি নবীকরণের ব্যবস্থা করেন। এই চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সম্ভাব্য রুশ আক্রমণ প্রতিরোধে রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্যকে তৃতীয় নিরপেক্ষ বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে ব্যবহার করা। জীবনের শেষদিকে রাজা রঞ্জিৎ সিংহ সিন্ধুদেশটি জয় করিয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তারের

ইংরেজ কর্তৃক রঞ্জিতের
আফগান ও সিন্ধু
নীতির বিরোধিতা

পরিকল্পনা করেন। এখানেও ইংরেজরা তাঁহাকে বাধাদান করে। ১৮৩২ খ্রীঃ কোম্পানী সিন্ধুদেশের আমীরদের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি করিয়া নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। রঞ্জিতের মৃত্যুর পর ১৮৪৩ খ্রীঃ ইংরেজ সেনাপতি চার্লস নেপিয়ার সিন্ধুদেশ অধিকার করেন।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে শিখরাজা রঞ্জিৎ সিংহ এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ধর্মভীরু, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী রঞ্জিৎ সিংহ আপন প্রতিভাবলে এক বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের অধিকাংশ মুলতান, কাশ্মীর ও পেশোয়ার তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। তবে তাহার সারা জীবনের স্বপ্ন অখণ্ড শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। ইংরেজ কোম্পানীর বাধাদানের ফলে এবং শিখ সর্দারদের বিরোধিতার জন্য পূর্ব পাঞ্জাবের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যের বাহিরে রহিয়া যায়। স্যার লেপেল গ্রিফিন রঞ্জিৎ সিংহের রাজকীয় গুণাবলীর ভুয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার দরবারের ফরাসী পর্যটক ভিক্টর জ্যাকমো (Victor Jacquemont) তাঁহাকে একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনেতা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন (a Bonaparti in miniature)। শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এবং সৈন্যবাহিনী গঠনে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁহার রাজত্বকালে শিখ রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। রঞ্জিৎ সিংহ সারা জীবন ইংরেজ কোম্পানীর সহিত বিরোধ এড়াইয়া চলেন। সম্ভবতঃ ভারতীয় রাজাদের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষের ফলাফল দেখিয়া ইংরেজদের অপরিমিত ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ হন। তিনি মন্তব্য করেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া যাইবে ('সব লাল হো জায়েগা')। শিখ রাজ্য স্থাপন করিয়া তিনি ইহার স্থায়িত্ব বিধানের চেষ্টা করেন নাই। ইহা তাঁহার রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া অনেকে মনে করেন।

রঞ্জিৎ সিংহের চরিত্রের মূল্যায়ন

১৮৩৯ খ্রীঃ রাজা রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখ রাজ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধ ও গুপ্তহত্যায় শিখ রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৮৪৩ খ্রীঃ রাজা রঞ্জিতের শিশুপুত্র দলীপ সিংহ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার মাতা রানী বিন্দন রাজার অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। লাহোর দরবার ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তীব্র ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই অবস্থায় বেসামরিক শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে এবং সৈন্যবাহিনী দেশের মধ্যে সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। পাঞ্জাবের এই অস্থিরতার সুযোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার বাসনা কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয়। কোম্পানীর পক্ষ হইতে শিখ সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের দলে টানিবার চেষ্টা শুরু হয়। এমতাবস্থায় মেজর ব্রডফুট (Broad foot) নামক লুধিয়ানার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত করিয়া তোলেন। ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হইয়া যায়। পাঞ্জাব সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ, নৌকা প্রস্তুতি ও সিন্ধুদেশে সমরসজ্জা শিখ সৈন্যবাহিনীকে

শিখ রাজ্যে গোলযোগ

সন্দিগ্ধ করিয়া তোলে। লাহোর দরবারের শিখ নেতাগণ সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধ কামনা করেন।

১৮৪৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ (Gough) পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হয়। অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও শিখবাহিনী মুদ্‌কী, ফিরোজ শাহ্‌, আলিওয়াল ও সোব্রাওনের যুদ্ধে পরাস্ত হয়। এইজন্য শিখ সৈন্যাধ্যক্ষদের বিশ্বাসঘাতকতা অনেকখানি দায়ী ছিল। যুদ্ধশেষে বিজয়ী ইংরেজশক্তি শিখদের উপর লাহোর চুক্তি চাপাইয়া দেয় (৯ই মার্চ, ১৮৪৬)। লাহোর চুক্তির শর্তানুসারে (১) শিখগণ শতদ্রু নদীর বাম তীরের সমস্ত অঞ্চল ও জলন্ধর দোয়াব ইংরেজদের ছাড়িয়া দেয়। (২) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরেজদের দেড় কোটি টাকা দিতে হয়। কাশ্মীর ইংরেজদের হস্তগত হয়। (৩) শিখ সৈন্যবাহিনীর শক্তি হ্রাস করা হয়। (৪) শিখ রাজ্যে বিদেশী নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়। (৫) শিখ দরবারে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা হয়।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ১৮৪৫-৪৬, লাহোর চুক্তি

ঐতিহাসিক কানিংহাম মন্তব্য করিয়াছেন যে, শিখদের শক্তি খর্ব করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই লাহোর চুক্তি করা হইয়াছিল। পাঞ্জাবে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার সুযোগ লইয়া কোম্পানী চুক্তির শর্তগুলিকে আরও কঠোর করেন। পাঞ্জাবে ইংরেজদের কর্তৃত্ব আরও প্রসারিত করা হয়। দরবারের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট শাসন ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। রিজেন্সি কাউন্সিল তাঁহার আজ্ঞাধীন হয়। লাহোরে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়। শিখ রাজ্যের শাসনে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ স্বাধীনতাপ্রিয় শিখজাতির পছন্দ হয় নাই। মুলতানের শিখনেতা মুলরাজ ও লাহোরের সন্নিহিত অঞ্চলের নেতা ছাত্তার সিং আত্তারিওয়ালা বিদ্রোহ করেন। পরে অন্যান্য শিখনেতাগণ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সময় রাজ্যবিস্তার নীতি অনুসরণ করিতেছিল। ১৮৪৮ খ্রীঃ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬) শিখ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে শিখগণ চিলিয়ানওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজবাহিনীর নিকট পরাস্ত হন। দক্ষ নেতৃত্ব ও সরবরাহের দুর্বলতার জন্য শিখদের পরাজয় ঘটে। সাহস ও বীরত্বের কোন অভাব ছিল না। লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৯ খ্রীঃ ৩০শে মার্চ এক ঘোষণা দ্বারা সমগ্র পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। স্বাধীন শিখ রাজ্যের পতন ঘটে।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ও শিখরাজ্যের অবসান

(৬) লর্ড ডালহৌসীর অধীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার (Dalhousie and British Imperial Expansion) :

লর্ড ডালহৌসী ছিলেন একজন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণর-জেনারেল। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ভারতে আসেন। তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী

ধ্যান-ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি মনে করেন দেশীয় রাজাদের অধীনে জনগণ অপশাসনের শিকার হয়। এদেশীয় রাজাদের শাসন দুর্নীতিগ্রস্ত ও প্রজাপীড়ক। অপরদিকে ব্রিটিশ শাসন জনকল্যাণমূলক ও উদার। সুতরাং দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ শাসনাধীনে স্থাপন করিলে ভারতীয় জনগণের মঙ্গল হইবে। লর্ড ডালহৌসী আরও মনে করেন, যে উদ্দেশ্যে দেশীয় রাজাদের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল তাহা সাধিত হইয়াছে। এখন মিত্রদের বাতিল করিবার সময় আসিয়াছে। দেশীয় শাসন উচ্ছেদ করিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিলে জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের উন্নতি হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হইলে এদেশে ব্রিটিশ পণ্যের বিশাল বাজার তৈয়ারী হইবে এবং ব্রিটিশ পণ্য আমদানী বৃদ্ধি পাইবে। ভারত হইতে ব্রিটিশ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহও সহজ হইবে। ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পের কাঁচা তুলার অভাব দূর করিবার জন্য ডালহৌসী ১৮৫৩ খ্রীঃ নিজামের নিকট হইতে বেরার প্রদেশটি দখল করিয়া লন। বেরার প্রদেশে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হইত।

ডালহৌসীর সাম্রাজ্য-বাদী নীতির উদ্দেশ্য



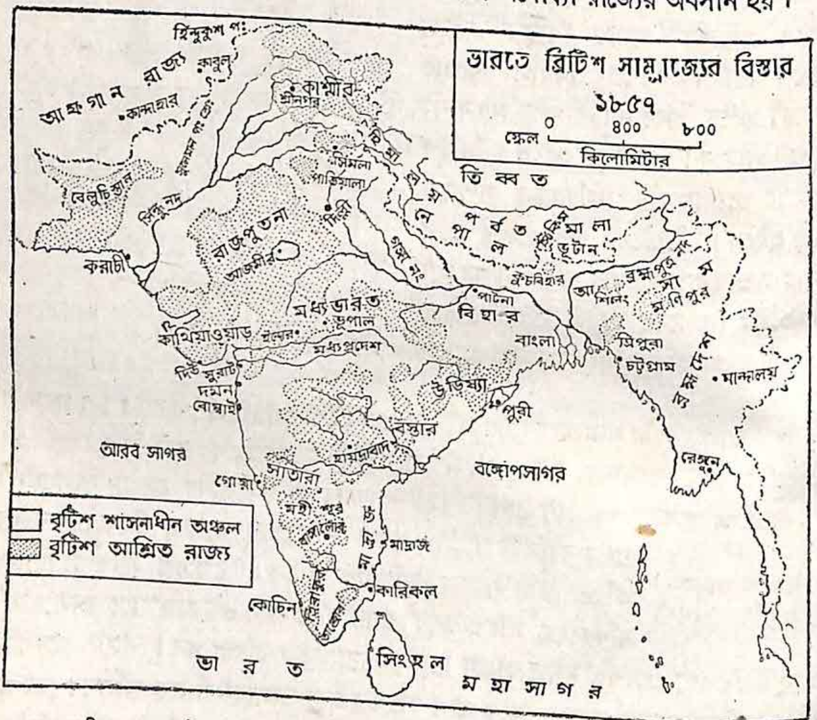
ডালহৌসী

লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি : ১। সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্যজয়, ২। স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগে রাজ্যবিস্তার ও ৩। কুশাসনের অভিযোগে পররাজ্য গ্রাস। (১) পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের ক্ষেত্রে ডালহৌসী প্রথম নীতিটি প্রয়োগ করেন। যুদ্ধের মাধ্যমে শিখদের পরাস্ত করিয়া তিনি পাঞ্জাব অধিকার করেন। ব্রহ্মদেশ সরকার ব্রিটিশ বণিকদের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন এই অজুহাতে ডালহৌসী ১৮৫২ খ্রীঃ পেগু প্রদেশটি দখল করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। (২) এদেশীয় ব্রিটিশ আশ্রিত ও সৃষ্ট রাজ্যগুলিকে গ্রাস করিবার জন্য ডালহৌসী এক অভিনব কৌশল প্রয়োগ করেন। কোন আশ্রিত রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ইহাই ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ-নীতি। চিরাচরিত ভারতীয় প্রথানুসারে অপুত্রক রাজার রাজ্য তাহার দত্তক পুত্র পাইত। ডালহৌসী এই প্রথা উঠাইয়া দেন। যদি অপুত্রক রাজা মৃত্যুর পূর্বে দত্তক নেন এবং ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন লাভ করেন কেবল সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়। স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগে ডালহৌসী সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসী, উদয়পুর, ভগৎ প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করেন। এই নীতিবলে বহু ভুতপূর্ব রাজা বা শাসকের উপাধি ও ভাতা তিনি বাতিল করিয়া দেন।

ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতির বৈশিষ্ট্য

কর্ণাটকের নবাব, তাঞ্জোরের রাজা ও পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা-সাহেবের উপাধি ও বৃত্তি বাতিল করা হয়।

(৩) তৃতীয় পথে অর্থাৎ কুশাসনের অভিযোগে ডালহৌসী অযোধ্যা রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। গভর্ণর-জেনারেলের ধারণা হয় অযোধ্যা রাজ্যটি ব্রিটিশ শিল্প-পণ্যের ভাল বাজার হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। তিনি অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে তিনি ঠিকমত রাজ্যশাসন করিতে পারিতেছেন না। অর্থাৎ ওয়াজেদ আলি শাহ্ অক্ষম, অপদার্থ শাসক। এইজন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল। শাসনব্যবস্থার উন্নতি করিবার জন্য ডালহৌসী নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্কে কলিকাতায় নির্বাসিত করিয়া সরাসরি অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন। স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের অবসান হয়।



পলাশীর যুদ্ধ হইতে মাত্র একশত বৎসরের মধ্যে (১৭৫৭—১৮৫৭) ব্রিটিশের ভারত জয় সম্পূর্ণ হয়। রবার্ট ক্লাইভ এই সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করিয়া যান। মারাঠা, নিজাম ও হায়দারের আক্রমণের মুখে ওয়ারেন হেস্টিংস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। লর্ড ওয়েলেসলী মারাঠা, নিজাম ও অযোধ্যা রাজ্যে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার সময় মহীশূরের পতন হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ণতা লাভ

লর্ড ডালহৌসী বলপ্রয়োগে পাঞ্জাব ও পেগু দখল করিয়া লন। স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ ও কুশাসনের অভিযোগে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গঠন সম্পূর্ণ করেন।

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও** :—(ক) কোন্ যুদ্ধের ফলে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয় ? (খ) আনওয়ারউদ্দিন খান কে ছিলেন ? (গ) সলাবত জঙ্গ কোন্ রাজ্যের নবাব ছিলেন ? (ঘ) লালী কে ছিলেন ? (ঙ) রাণী ঝিন্দর কে ? (চ) কোন্ বৎসর চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ হয় ? এই যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (ছ) হোলকার কোথায় রাজত্ব করিতেন ? (জ) মহাদজী সিন্ধিয়া কে ছিলেন ? (ঝ) পেশোয়া প্রথম মাধবরাও কত খ্রীঃ পেশোয়া হন ? (ঞ) রঘুনাথরাও কে ছিলেন ? (ট) বেসিনের সন্ধি কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (ঠ) ১৮৪৬ সনের লাহোর চুক্তি কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (ড) দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ কত খ্রীঃ হয় ?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও** :—(ক) অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে ইউরোপীয় বাণিজ্যের অগ্রগতির পরিচয় দাও। (খ ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিরোধের কারণ কি ? (গ) পলাশী যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর। (ঘ) মীরজাফরের সহিত ইংরেজদের বিরোধের কারণ কি ? (ঙ) ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার কারণ কি ? (চ) ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজিত হইবার কারণ কি ? (ছ) অধীনতা মূলক মিত্রতা-নীতির তাৎপর্য আলোচনা কর। (জ) স্বত্ববিলোপ-নীতি কি ? কোন্ কোন্ রাজ্যে ইহা প্রয়োগ করা হয় ?

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর** :—(ক) তিনটি কর্ণাটক যুদ্ধের বিবরণ দাও। ইহাদের ফলাফল কি হইয়াছিল ? (খ) কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা কর। (গ) অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্যিক অগ্রগতির পরিচয় দাও। (ঘ) সিরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের বিরোধের কারণগুলি আলোচনা কর। (ঙ) মীরকাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ কি ? (চ) ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতির উদ্দেশ্য কি ছিল ? ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (ছ) রঞ্জিৎ সিংহের সহিত ইংরেজদের সম্পর্কের পরিচয় দাও। (জ) প্রথম ও দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। (ঝ) লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী-নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। তাঁহার এরূপ নীতি অনুসরণ করিবার কারণ কি ?

৪। **টীকা লিখ** :—(ক) ফারুখশিয়ারের ফারমান (১৭১৭) (খ) আলিনগরের সন্ধি (১৭৫৭) (গ) সলবাইয়ের সন্ধি (১৭৮২) (ঘ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪) (ঙ) বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪) (চ) টিপু সুলতানের শাসন-সংস্কার।

৫। **ভারতের রেখা-মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দেখাও** :—(ক) বাংলা প্রেসিডেন্সি (খ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সি (গ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি (ঘ) পাঞ্জাব (ঙ) রাজপুতনা (চ) হায়দ্রাবাদ (ছ) কর্ণাটক (জ) ত্রিবাঙ্কুর।

৬। **শূন্যস্থান পূরণ কর** :—(ক) অষ্টাদশ শতকে সারা পৃথিবীতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে — প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। (খ) — সময় ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা হয়। (গ) সম্রাট ফারুখসিয়ার — খ্রীঃ ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দান করেন। (ঘ) বিনাশুল্কে — বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার লইয়া বাংলার নবাবদের

সহিত ইংরেজদের বিরোধ দেখা দেয়। (ঙ) পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজদের — অনেক বৃদ্ধি পায়। (চ) — খ্রীঃ কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে। (ছ) — খ্রীঃ প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। (জ) — খ্রীঃ টিপু সুলতানের মৃত্যু হয়। (ঝ) — খ্রীঃ চার্লস নেপিয়ার সিন্ধুদেশ জয় করেন। (ঞ) লুধিয়ানার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট — প্রথম শিখযুদ্ধের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিলেন। (ট) ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবিস্তার-নীতির বৈশিষ্ট্য —।

৭। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও**:—(ক) কর্ণওয়ালিশ তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে হায়দার / টিপু সুলতানকে পরাস্ত করেন। (খ) ওয়েলেসলী / ডালহৌসী অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতির প্রবর্তন করেন। (গ) ওয়েলেসলী প্রথমে অযোধ্যার নবাব / হায়দ্রাবাদের নিজামকে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। (ঘ) রঞ্জিৎ সিংহ আফগানিস্তান / উপজাতিদের নিকট হইতে পেশোয়ার অধিকার করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত্তি

(Administrative Foundations)

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈত-শাসনের প্রতিষ্ঠা (১৭৬৫—১৭৭২) :

১৭৬৫ খ্রীঃ ১২ই আগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। মুঘল শাসনব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—নিজামত ও দেওয়ানী। নিজামতের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুবাদার বা নিজামের হাতে ছিল সামরিক বাহিনী, পুলিস ও ফৌজদারী বিচারব্যবস্থা। দেওয়ানের হাতে ছিল রাজস্ব ও দেওয়ানী বিচার-বিভাগ। সম্রাটের আদেশ বলে বাংলার রাজস্ব ও দেওয়ানী বিচার পরিচালনার ভার কোম্পানীর হাতে আসে। বাংলার রাজস্বের উপর কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব নাজমুদ্দৌলার সহিত চুক্তিবলে বাংলা প্রদেশের প্রতিরক্ষার ভার কোম্পানী আগেই গ্রহণ করিয়াছিল। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের ভার কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। উপরন্তু, নবাবের সহিত চুক্তিবলে ডেপুটি সুবাদার নিয়োগের অধিকার কোম্পানীর থাকায় কার্যতঃ নিজামতের দায়িত্বও কোম্পানীর উপর বর্তায়। বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব লাভ করিবার ফলে বাংলার বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোম্পানীর ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে। তবে কোম্পানী নিজে প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানী ও নিজামতের কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। তাহারা মহম্মদ রেজা খাঁকে বাংলার ও সীতাব রায়কে বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত করে। রেজা খাঁ ডেপুটি সুবাদার বা ডেপুটি নবাবের পদটিও পান। কোম্পানীর মনোনীত এই দুইজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নবাবের অধীন হইলেও নবাব ইহাদের পদচ্যুত করিতে পারিতেন না। সরকারী কাজকর্মের জন্য ইহারা সরাসরি কোম্পানীর নিকট দায়ী ছিল। কোম্পানীই ছিল ইহাদের আসল প্রভু।

নবাব ও কোম্পানীর এই যুক্ত শাসনব্যবস্থা দ্বৈত-শাসন নামে পরিচিত। এই শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশে সাত বৎসরকাল (১৭৬৫—১৭৭২) স্থায়ী হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় নবাবের দায়িত্ব ছিল কিন্তু দায়িত্ব পালনে যে ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। আবার আসল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও কোম্পানী দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। কোম্পানীর ডেপুটি সুবাদার ও দেওয়ান কোম্পানীকে খুশী করিতে ব্যস্ত ছিল। কোম্পানী বা নবাব এই সময়ে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন। কোম্পানী ও তাহার কর্মচারীগণ জনগণের উপর যে শোষণ ও নিপীড়ন

দেওয়ানী ও দ্বৈত-শাসনের তাৎপর্য

চালাইত তাহা হইতে রক্ষার সাধ্য নবাব বা তাঁহার কর্মচারীদের ছিল না। সারা বাংলাদেশ হইয়া উঠিয়াছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের অবাধ লুণ্ঠন ক্ষেত্র। দ্বৈত-শাসনের স্রষ্টা স্বয়ং ক্লাইভ লিখিয়াছেন 'পৃথিবীর আর কোন দেশে এত অরাজকতা, বিভ্রান্তি, ঘুষ, দুর্নীতি এবং উৎপীড়ন-শোষণের ঘটনা কেউ শোনেনি বা দেখেনি'। শোষণের ক্ষেত্রে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষও পিছাইয়া ছিল না। তাহারা এদেশের সংগৃহীত সম্পদে পণ্য ক্রয় করিয়া দেশে পাঠাইত। দেশ হইতে সোনা, রূপা আনিবার আর প্রয়োজন হইত না। খোদ ব্রিটিশ সরকারও বাংলার সম্পদের ভাগ লইতে আগাইয়া আসে। দেওয়ানী লাভের পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর উপর বার্ষিক চার লক্ষ পাউণ্ড কর ধার্য করিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার, কোম্পানী ও তাহার কর্মচারীদের এই বিপুল চাহিদা মিটাইতে বাংলা নিঃস্ব হইয়া যায়। দেশে শাসন-শৃঙ্খলার অভাবে নৈরাজ্য দেখা দেয়। ইহার উপর কয়েক বৎসর (১৭৬৮—১৭৭০) অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ খ্রীঃ দেশে এক ভয়ঙ্কর লোক ক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইহা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (বাংলা ১১৭৬ সন) নামে খ্যাত। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায় এবং এক-তৃতীয়াংশ জমি, জঙ্গল ও অনাবাদী হইয়া যায়। তবে কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ে কোন ঘাটতি দেখা দেয় নাই। জোর-জবরদস্তি করিয়া কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করা হইয়াছিল। অনাবৃষ্টি ও শস্যহানি দুর্ভিক্ষের কারণ হইলেও কোম্পানীর শাসন-নীতি ইহাকে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর করিয়া তোলে। ১৭৭২ খ্রীঃ কোম্পানী দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটাইয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করে।

শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ—হেস্টিংস হইতে কর্ণওয়ালিশ (Growth of centralisation—Hastings to Cornwallis) :

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে একটি নূতন ধরনের শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে যে শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি : (১) কোম্পানীর লাভের হার বৃদ্ধি, (২) স্বদেশ ব্রিটেনের সমৃদ্ধি সাধন ও (৩) এদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্বের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা। জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি বিধান বা দেশের উন্নতি কোম্পানীর শাসনের উদ্দেশ্য ছিল না। এইজন্য ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে বেশী নজর দেন।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। তিনটি প্রেসিডেন্সীতে (মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা) তিনজন গভর্ণর ও তাঁহাদের কাউন্সিল নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করিতেন। প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্সীতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও ইঁহারা পালন করিতেন। দেশে 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস' বা পরিচালকমণ্ডলী তাঁহাদের কাজের তত্ত্বাবধান করিত। ইতিমধ্যে বাংলা ও মাদ্রাজ প্রদেশে বিশাল ভূভাগ কোম্পানীর হাতে আসায় দেশে কোম্পানী বিরোধীগোষ্ঠী কোম্পানীর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের দাবী জানাইতে থাকে। ১৭৭৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট

লর্ড নর্থের রেগ্যুলেটিং এ্যাক্ট (Regulating Act) বা নিয়ন্ত্রক আইন পাশ করিয়া কোম্পানীর কাজকর্মের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। এই আইনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী বা 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস্'-এর গঠন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। কোম্পানীর কাজকর্মের উপর ব্রিটিশ সরকারের তদারকি স্থাপন করা হয়। কলিকাতার 'সুপ্রীম গভর্ণমেণ্ট' বা কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত হয়। বাংলার গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস হন প্রথম গভর্ণর-জেনারেল। সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেল অন্য দুইটি প্রেসিডেন্সির যুদ্ধ, শান্তি ও বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার পান। কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ বিচারালয় স্থাপন করা হয়। এই আদালতের উপর ইউরোপীয় ও কলিকাতার নাগরিকদের বিচারের ভার দেওয়া হয়। রেগ্যুলেটিং এ্যাক্টে কিছু ত্রুটি থাকিবার জন্য সুপ্রীম গভর্ণমেণ্ট ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরোধীরা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় সুপ্রীম গভর্ণমেণ্টও ঠিকমত কাজ করিতে পারিত না।

কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থা ও রেগ্যুলেটিং এ্যাক্ট, ১৭৭৩

রেগ্যুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া ১৭৮৪ খ্রীঃ পিটের ভারত শাসন আইন (Pitt's India Act, 1784) পাশ করা হয়। পিটের আইনে ভারত শাসনের বিস্তৃত ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয়। এই শাসন কাঠামোর ছিল তিনটি স্তর এবং কেন্দ্রীভূত প্রশাসনব্যবস্থা। (১) এই আইনে ব্রিটিশ সরকারের একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে 'বোর্ড অব কণ্ট্রোল' গঠিত হয়। বোর্ড অব কণ্ট্রোলকে কোম্পানীর (২) ডিরেক্টর সভা বা পরিচালকমণ্ডলীর কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করিবার অধিকার দেওয়া হয়। পরিচালকমণ্ডলীর গঠনতন্ত্রও এই আইনে স্থির করা হয়। (৩) গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের তিনজন সদস্য ভারত শাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে পিটের ভারত শাসন আইনে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট এক কেন্দ্রীভূত শাসন-কাঠামো কায়েম করা হয়। বোর্ড অব কণ্ট্রোল, বোর্ড অব ডিরেকক্টরস ও সপারিষদ গভর্ণর-জেনারেলকে লইয়া ভারত শাসনের নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয়। ১৭৮৬ খ্রীঃ সংশোধনী আইনে গভর্ণর-জেনারেলকে সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা, শান্তি ও স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বময় কর্তৃত্ব দান করা হয়। প্রয়োজনে তিনি তাঁহার কাউন্সিলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন এমন বিধান প্রবর্তিত হয়।

পিটের ভারত শাসন আইন ১৭৮৪ ও সংশোধনী আইন ১৭৮৬

ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিয়াছিলেন। দেশে শান্তি না থাকিলে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা যায় না। কোম্পানীর কর্মচারীগণ ব্রিটিশ শাসন চালু হইবার পর কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। কর্ণওয়ালিশ ইহাদের বাণিজ্যিক কাজকর্ম হইতে অব্যাহতি দেন। ইহাদের জন্য উচ্চ বেতনেরও ব্যবস্থা করেন। তবে কোম্পানী আগের মতই ইহাদের নিয়োগ করিত। গভর্ণর--জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশে নূতন বিচারব্যবস্থার পত্তন করেন। তিনি

ইহার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেন নাই। তিনি প্রতি জেলাতে একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন। দেওয়ানী আদালতে কোম্পানীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফৌজদারী আদালতে এদেশীয় বিচারকগণ বিচার করিতেন। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার উপর তদারকি করিতেন। উচ্চতর বিচারের জন্য সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত স্থাপন করা হয়। সদর দেওয়ানী আদালতে গভর্ণর-জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের সদস্যরা বিচারকের কাজ করিতেন। সদর নিজামত আদালতে ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল এদেশীয় বিচারকদের উপর। সুপ্রীম কোর্ট ইউরোপীয় ও কলিকাতার নাগরিকদের বিচার করিত।

হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক নূতন বিচার-ব্যবস্থা স্থাপন

লর্ড কর্ণওয়ালিশ বিচার-বিভাগের সম্প্রসারণ করিয়া ইহার পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেন। তিনি শাসন হইতে বিচার-বিভাগকে পৃথক করেন। প্রতি জেলায় দেওয়ানী বিচারের জন্য জেলা জজ নিয়োগ করা হয়। জেলা জজদের নীচে ছোটখাট বিচারের জন্য ইউরোপীয় ও এদেশীয়দের অধীনে ছোট বিচারালয় স্থাপন করা হয়। রেজিস্ট্রার, মুন্সেফ বা আমীনরা ছিলেন এইসব আদালতের বিচারক; জেলা জজদের উপর চারটি (কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা) প্রাদেশিক আপীল আদালত স্থাপন করা হয়। আপীল আদালত হইতে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার প্রার্থনা করা যাইত। ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার জেলা জজদের দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য চারটি 'ভ্রাম্যমান আদালত' (Court of circuit) স্থাপন করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কলিকাতার সদর নিজামত আদালতে আপীল করা চলিত। গভর্ণর-জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের সদস্যরা সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার করিতেন। এদেশীয় বিচারকদের পরামর্শে গভর্ণর-জেনারেলের নেতৃত্বে সদর নিজামত আদালতের বিচারকার্য পরিচালিত হইত। দেশের প্রচলিত আইন আনুযায়ী দেওয়ানী বিচার চলিত। হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিশ হিন্দু ও মুসলিম আইনের সংস্কার করিয়া ফৌজদারী বিচারকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। কর্ণওয়ালিশ ইউরোপীয় বিচার-পদ্ধতি, আইনগত সাম্য, আইনের শাসন, সাক্ষ্য আইন প্রভৃতি এদেশে প্রচলনের চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রবর্তিত শাসন ও আইন-সংক্রান্ত বিধানগুলি কর্ণওয়ালিশ কোড (Cornwallis Code) নামে পরিচিত।

বিচার-বিভাগের মত পুলিস বিভাগের সৃষ্টিও এই সময়ে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রথম এদেশে পুলিসবাহিনী গঠন করেন। তার আগে জমিদার ও ফৌজদাররা দেশে শান্তিরক্ষা করিত। কর্ণওয়ালিশ জমিদারদের হাত হইতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তুলিয়া লন। এই দায়িত্ব দেওয়া হয় নবগঠিত পুলিস-বাহিনীকে। সমস্ত দেশকে অনেকগুলি থানায় ভাগ করা হয়। প্রতি থানায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব এদেশীয় দারোগাদের উপর অর্পণ করা হয়। পরবর্তীকালে 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস' পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সমগ্র জেলার

পুলিস বিভাগ স্থাপন

পুলিসবাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার গ্রাম্য চৌকিদারের উপর ন্যস্ত করা হয়। চৌকিদারদের বেতন গ্রামবাসীদের দিতে হইত। নবসৃষ্ট পুলিস-বিভাগ দেশে চুরি-ডাকাতির হার হ্রাস করিতে সক্ষম হয়। বলা যায়, হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত নূতন বিচার ও পুলিস বিভাগ দেশের অরাজকতা দূর করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়।

কোম্পানীর ভূমি-রাজস্ব নীতিঃ (ক) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে শাসন কর্তৃত্ব লাভ করিবার পর ক্রমশঃ তাহার ব্যয় বাড়িতে থাকে। পলাশী যুদ্ধের পর হইতে কোম্পানীর পণ্য ক্রয়ের (investment) জন্য স্বদেশ হইতে সোনা রূপা আমদানীর ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়। এদেশে সংগৃহীত সম্পদে এদেশ হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া ইউরোপে চালান দেওয়া হইত। (খ) ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর খরচ খাতে প্রয়োজনীয় টাকা এদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইত। (গ) সর্বোপরি, কোম্পানীর ভারত বিজয়ের মূলধন এদেশের জনগণকে যোগাইতে হইত। এই তিন খাতে প্রতিবৎসর কোম্পানীর যে বিরাট অঙ্কের টাকার প্রয়োজন হইত তাহা এদেশের কৃষক বা রায়তদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইত। ভারতবর্ষে চিরকাল জমিতে উৎপন্ন শস্যের একাংশ রাজা রাজস্ব হিসাবে পাইতেন। ইহা আদায়ের জন্য নানা ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন অঞ্চলে সরকারী কর্মচারী সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিত। আবার কোন কোন স্থানে জমিদার, ইজারাদার বা জোতদার কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া রাজকোষে জমা দিত। এইজন্য তাহারা কমিশন বা পারিশ্রমিক পাইত।

কোম্পানীর অধিক অর্থের প্রয়োজন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তঃ ১৭৭২ খ্রীঃ কোম্পানী শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার পর ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে পাঁচশালা বন্দোবস্ত চালু করেন। নিলামে সর্বোচ্চ করদাতার সহিত জমির বন্দোবস্ত করা হয়। পাঁচশালা ব্যবস্থায় ইজারাদাররাও ভূমি-রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায়। পরে ওয়ারেন হেস্টিংস একশালা বা এক বৎসরের জন্য ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ইজারা ব্যবস্থার (Farming system) সবচেয়ে বড় ত্রুটি হইল সরকারী আয়ের অনিশ্চয়তা এবং কৃষকদের উপর উৎপীড়ন। ইজারাদাররা অনেক সময় সরকারী রাজস্ব জমা না দিয়া পলাইয়া যাইত। আর নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের উপর উৎপীড়ন করিত। ১৭৭৬ খ্রীঃ কলিকাতার সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস ভূমি-রাজস্ব চিরস্থায়ী করিবার প্রস্তাব দেন।[১] সেই সময় ব্রিটিশ সরকার বা কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ভূমি-রাজস্ব চিরস্থায়ী করিবার পক্ষে মত দেন নাই। ১৭৮৪ খ্রীঃ পিটের ভারত শাসন

ইজারা ব্যবস্থার ত্রুটি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমিকা

---

(১) ঐতিহাসিক জেমস্ মিলের মতে ফিলিপ ফ্রান্সিসই বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত সংগঠক (Francis may, with justice, be described as the original promoter of the Permanent Settlement of Bengal)।

আইনে ভূমি-রাজস্ব চিরস্থায়ী করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। ১৭৮৬ খ্রীঃ কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা যে নির্দেশ পাঠান তাহাতে ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গড়িয়া তুলিবার নির্দেশ ছিল। ১৭৮৬ খ্রীঃ পরে এদেশে ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা যে স্থায়ী করা হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়া বিতর্ক

নূতন ভূমি বন্দোবস্তের রূপটি কেমন হইবে তাহা লইয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩), বোর্ড অব রেভেন্যুর প্রেসিডেন্ট জন শোর ও প্রধান সেরিস্তাদার জেমস্ গ্রান্টের মধ্যে জোর বিতর্ক দেখা দেয়। জমির মালিকানা, রাজস্বের পরিমাণ ও ভূমি বন্দোবস্তের মেয়াদ লইয়া প্রধানত বিতর্ক চলে। শেষপর্যন্ত তিনটি কারণে কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন: (১) কোম্পানী তাহাদের অধীন একটি শক্তিশালী, বিশ্বস্ত সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল। ইহাতে কোম্পানীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধা হইবে। (২) ভূমি-রাজস্ব হইতে আয়ের উপর কোম্পানীর বাণিজ্য, প্রশাসনিক ব্যয় ও রাজ্যবিস্তার নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং এই আয়ের নিশ্চয়তা বিধান ছিল কোম্পানীর দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য। (৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর উদ্দেশ্য ছিল দেশে কৃষির উন্নতি বিধান এবং স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করা। সরকারী রাজস্ব স্থায়ীভাবে ধার্য হইলে জমিদাররা পতিত জমি উদ্ধার এবং কৃষির উন্নতিতে নজর দিবেন এমন আশা করা হইয়াছিল। ইহাতে দেশে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হইবে এবং কোম্পানীর বাণিজ্য বাড়িবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য



লর্ড কর্ণওয়ালিশ

১৭৯৩ খ্রীঃ কর্ণওয়ালিশ বাংলা ও বিহারের রাজস্বব্যবস্থা চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করেন। জমিদার জমির মালিকানা পান। রায়তেরা জমিতে তাহাদের স্বত্ব এবং অন্যান্য অধিকার হারায়। গোচারণ ভূমি, জঙ্গল, জলাশয়, এমনকি বাস্তু জমির উপরও রায়ত তাহার অধিকার হারায়। জমিদারদের সংগৃহীত রাজস্বের এগার ভাগের দশ ভাগ সরকার গ্রহণ করেন। মাত্র এক ভাগ জমিদারদের পারিশ্রমিক হিসাবে রাখা হয়। স্বাভাবিকভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদাররা তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিতে তৎপর হন। রায়ত ক্রমশঃ জমিদারের দয়ার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে সরকারী রাজস্ব জমা দিতে না পারিলে জমিদারী নিলামে বিক্রি হইয়া যাইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরে উড়িষ্যা, উত্তর মাদ্রাজ ও কাশীতে চালু করা হয়।

রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী ব্যবস্থা ঃ কোম্পানীর সরকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা চালু করে। ইহা রায়তওয়ারী ব্যবস্থা নামে পরিচিত। কৃষককে জমির মালিকানা দেওয়া হয় এবং খাজনার জন্য দায়ী করা হয়। এই ব্যবস্থায় সরকার ও কৃষকের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার বা ইজারাদাররা ছিল না। এই ব্যবস্থায় বিশ বা ত্রিশ বৎসর পর পর জমির খাজনা নূতন করিয়া ধার্য করা হইত। জমিতে উৎপন্ন ফসলের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ খাজনা ধার্য করিবার ব্যবস্থা ছিল। বন্যা বা খরার কারণে শস্যহানি ঘটিলেও খাজনা রেহাই দেওয়া হইত না। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন অংশে রায়তয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত

উত্তরপ্রদেশ, মধ্য ভারতের কিছু অংশ ও পাঞ্জাবে মহলওয়ারী বন্দোবস্ত চালু করা হয়। কতকগুলি গ্রাম বা এস্টেট লইয়া একটি মহল গঠিত হইত। একটি মহলের রাজস্বের বন্দোবস্ত একাধিক সচ্ছল মোড়ল ব্যক্তির সহিত করা হইত। পাঞ্জাবে এই ব্যবস্থা সামান্য পরিবর্তন করিয়া গ্রাম্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। রায়তওয়ারী ব্যবস্থার সহিত মহলওয়ারী ব্যবস্থার অনেক মিল আছে। উভয় ব্যবস্থায় খাজনাহার সংশোধন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা ছিল।

মহলওয়ারী ব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে যে তিন ধরনের ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাহার প্রভাব ছিল অসাধারণ। প্রথমতঃ, ব্রিটিশ প্রবর্তিত ব্যবস্থায় জমি বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়; ইহাতে যে কোন মুহূর্তে কৃষকের জমির অধিকার হারাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। জমি বিক্রয় ও বন্ধক যোগ্য পণ্য হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে ভূমি-বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমা অনেক বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ কর্তৃক ধার্য ভূমি-রাজস্বের হার ছিল বেশ উচ্চ। সরকার বা জমিদারের পাওনা মিটাইয়া কৃষকের হাতে খুব সামান্য অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত। বাকী অর্থে সারা বৎসর সচ্ছলভাবে তাহার জীবন ধারণ সম্ভব হইত না। অনাবৃষ্টি বা বন্যার সময়ে কৃষকগণ অত্যন্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হইত। তৃতীয়তঃ, ব্রিটিশ সরকারের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষকের দেয় ভূমি-রাজস্বের হার ছিল অনিশ্চিত। চিরস্থায়ী অঞ্চল ছাড়া (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর মাদ্রাজ ও কাশী) ভারতের আর সর্বত্র সরকার ইচ্ছা করিলে রাজস্ব বাড়াইতে পারিতেন। ইহার ফলে এই সমস্ত অঞ্চলে কৃষকের হাতে যথেষ্ট টাকা থাকিত না। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, অনিশ্চিত সরকারী রাজস্ব ও উচ্চ রাজস্বের হার এদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী। চতুর্থতঃ, ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমি-ব্যবস্থায় কৃষকের অধিকারের দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় নাই। কৃষকের অধিকার 'অলিখিত, অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত' থাকিয়া যায়। ইহাতে কৃষক সীমাহীন শোষণ ও উৎপীড়নের শিকার হয়।

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্রিটিশ ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রভাব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিল্প ও বাণিজ্য

(Industry and Trade)

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। ১৬০০—১৭৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত কোম্পানী এদেশে ছিল একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। স্বদেশ হইতে সোনা, রূপা, লোহা, তামা, সীসা, কিছু পশমের কাপড় ও ঔষধপত্র তাহারা এদেশে লইয়া আসিত। এদেশ হইতে সূতীবস্ত্র, মসলিন, রেশমীবস্ত্র, সোরা ও রেশম তাহারা ইউরোপে রপ্তানী করিত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় পণ্যের বাজার ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়ার ফলে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানীও বাড়িয়া যায়। বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশে শিল্পোৎপাদন বাড়িতে থাকে। ভারতীয় শাসকগণ বৈদেশিক বাণিজ্যের তাৎপর্য বুঝিতেন। তাঁহারা বিদেশী বণিকগণকে কুঠি স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে উৎসাহ দিতেন। ইহাতে দেশে ধনাগম ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিত। ইংলণ্ডের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ অবশ্য সে দেশে ভারতীয় সূতী ও রেশম বস্ত্রের রপ্তানী পছন্দ করিতেন না। ইহাতে সে দেশের বস্ত্র শিল্পপতি ও কারিগরদের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। ব্রিটিশ সরকার শিল্পপতিদের অনুরোধে ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর উপর উচ্চশুল্ক স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বস্ত্র আমদানী হ্রাস করা। ১৭০০ ও ১৭২০ খ্রীঃ এরূপ শুল্ক স্থাপিত হয়। তবে ইউরোপের বাজারে ভারতীয় সূতী ও রেশম বস্ত্রের চাহিদা থাকায় এসব বিধি-নিষেধ ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী কমাইতে পারে নাই।

ভারতে কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রকৃতি

১৭৫৭ খ্রীঃ হইতে ভারতের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্য সম্পর্কে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমতঃ, দেওয়ানী লাভ করিবার পর কোম্পানীর হাতে অঢেল টাকার যোগান আসে। ইহার ফলে এদেশের সংগৃহীত রাজস্বে কোম্পানীর পণ্যক্রয় (investment) সম্ভব হয়। স্বদেশ হইতে মূলধন আনিবার আর প্রয়োজন থাকে না। অবশ্য ইহাতে ১৭৫৭ খ্রীঃ হইতে এদেশের সম্পদের নিষ্ক্রমণ (economic drain) শুরু হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের শাসনভার কোম্পানীর হাতে আসায় বণিক কোম্পানী এদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উপর নিজের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উপর কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে দেশী ও বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়। এদেশীয় শিল্পী, কারিগর ও বণিকদের কোম্পানীর নির্ধারিত দামে পণ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করিতে হয়। কোম্পানী বহু তাঁতীকে সস্তায় কাপড় বুনিয়া দিতে বাধ্য করিত। কারিগররা উপযুক্ত মজুরি পাইত না। অর্থাৎ এদেশীয় তাঁতী, শিল্পী ও

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাষ্ট্রক্ষমতা-লাভ ও শিল্প বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন

কারিগরদের জোর করিয়া পণ্য উৎপাদনে বাধ্য করা হইত। ইহাতে অবশ্যই ভারতীয় শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হইয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব দেখা দেয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও স্টীম ব্যবহার, কারখানা স্থাপন ও যথেষ্ট পুঁজি লগ্নী করিবার ফলে ব্রিটিশ শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছিল। ব্রিটিশ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ উন্নততর প্রযুক্তি কৌশলের প্রয়োগে অতি দ্রুত উন্নতমানের সস্তা পণ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে সক্ষম হন। শিল্পবিপ্লব ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। ইহার ফলে শিল্পোৎপাদক ধনী পুঁজিপতি শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। এই পুঁজিপতিশ্রেণী রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করিয়া ভারতের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকারের উপর আঘাত হানিতে থাকে। প্রথমে শিল্পপতিগণ কোম্পানীকে ভারতে রপ্তানীর জন্য প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ শিল্পপণ্য কিনিতে বাধ করে। নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্রিটিশ পণ্য কোম্পানীর জাহাজে ভারতে রপ্তানী বাধ্যতামূলক করা হয়। ব্রিটেনের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের অবসানের জন্য আন্দোলন করিতে থাকে। ১৮১৩ খ্রীঃ চার্টার এ্যাক্টে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের অবসান হয়।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব এবং ভারতীয় বাণিজ্যের উপর ইহার প্রভাব

ভারতের বাণিজ্য এখন ব্রিটেনের নাগরিকদের নিকট উন্মুক্ত হয়। বলা যায় ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে' দেখাইয়াছেন এই সময় হইতে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল কীভাবে এই দেশের স্বদেশী শিল্পের ধ্বংস করিয়া ব্রিটিশ শিল্পের স্থান করা যায়। ১৮১৩-১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের মূলসূত্র একটি কীভাবে কৃষি-প্রধান ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করা যায়। এই সময় হইতে ভারত সরকার 'অবাধ বাণিজ্য নীতির' পথ অনুসরণ করিতে থাকেন। ব্রিটেন হইতে প্রচুর পরিমাণে শিল্পপণ্য, বিশেষ করিয়া সূতীবস্ত্র, অবাধে নামমাত্র শুল্কে ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। ১৭৯৪ খ্রীঃ মাত্র ১৫৬ পাঃ মূল্যের সূতীবস্ত্র ইংলণ্ড হইতে ভারতে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮১৩ খ্রীঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল একলক্ষ দশ হাজার পাউণ্ডে। ১৮৫৬ খ্রীঃ ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩ লক্ষ পাউণ্ড। ঠিক এই সময়ে ব্রিটেনের রাষ্ট্রনেতা ও ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় কৃষকের করভার লাঘবের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ পণ্যের বিক্রয় বাড়ানো। ঠিক এই উদ্দেশ্য লইয়াই এদেশীয়দের 'সভ্য ও শিক্ষিত' করিবার চেষ্টা শুরু হয়।

এদেশীয় শিল্পের উপর ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব

ভারতীয় হস্ত ও কুটির শিল্পের পক্ষে ব্রিটেনের যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া ছিল অসম্ভব। যন্ত্রশিল্পে প্রস্তুত সামগ্রী ছিল গুণগত মানে উন্নত অথচ দামে সস্তা। বাষ্পশক্তির ব্যবহার ও অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগে এই

বিপ্লব সম্ভব করিয়াছিল। ফ্রান্স, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও জাপান উচ্চ শুল্ক প্রাচীর খাড়া করিয়া নিজ নিজ দেশের শিল্পকে রক্ষা করে। সেই সঙ্গে বিদেশের প্রযুক্তি কৌশল আমদানী করিয়া নিজের দেশের শিল্পের আধুনিকীকরণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে থাকে। ভারতের বিদেশী শাসকগণ এদেশীয় শিল্পকে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে রক্ষা করেন নাই। ব্রিটিশ পণ্যের ভারত প্রবেশের সুযোগ তাঁহারা অবাধ ও অব্যাহত রাখেন। ব্রিটিশ পণ্য অবাধে ভারতে প্রবেশ করিলেও ভারতীয় পণ্য অবাধে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে পারিত না। ১৮২৪ খ্রীঃ ভারতীয় ক্যালিকো বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্কের হার ছিল ৬৭½%, মসলিনের উপর ৩৭½% এবং চিনির উপর ৪০০%।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে ভারতের প্রধান শিল্পগুলি হইল বস্ত্র, নীল, রেশম, কয়লা, চিনি, কাগজ, চা, কফি প্রভৃতি। লৌহ ও পাটশিল্প সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। আধুনিক শিল্পের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ এই পর্বের শেষদিকে ভারতে গড়িয়া উঠিতে শুরু করে। ভারতে ছিল বিশাল বাজার, প্রচুর কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমিক। আধুনিক জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ও বীমা সংস্থা যেমন স্থাপিত হয় তেমনি ইংরাজী শিক্ষা এবং পাশ্চমী ভাবধারা ও রুচিও ভারতে দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতে শিল্প স্থাপনের কথা চিন্তা করা হয়। সেইসব হাল্কা ও রপ্তানীমুখী শিল্প ভারতে গড়িয়া তোলা হয় যাহা ব্রিটিশ শিল্পের কোন ক্ষতি করিবে না। ভারী লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বা ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প স্থাপনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। ব্রিটিশ পুঁজি, উদ্যোগ ও মালিকানায় ভারতে আধুনিক শিল্পের সূত্রপাত হয়। বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম আমদানী করা হয়। নীল, রেশম, কয়লা, চা, কফি, চিনি ও কাগজ শিল্প ছিল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের একচেটিয়া। শুধু বস্ত্রশিল্পে এদেশীয়দের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। পশ্চিম ভারতের পার্শী এবং মুসলমান বণিকগণ আধুনিক বস্ত্র-শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পশ্চিম এশিয়া ও চীনের সহিত বাণিজ্য করিয়া ইঁহারা প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন।

আধুনিক শিল্পের সূত্রপাত

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিদেশী মালিকানায় এদেশে যে শিল্পগুলি গড়িয়া উঠে তাহাতে এদেশের কোন অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে নাই। ভারতীয়দের প্রয়োজনের তুলনায় এই শিল্পগুলির সংখ্যা ছিল নগণ্য। এই শিল্পগুলির উৎপাদিত পণ্যের (নীল, চা, কফি, চিনি ইত্যাদি) বেশীর ভাগ বিদেশে বিক্রয় করা হইত এবং বিদেশের বাজারে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় ব্রিটেন লাভবান হইত। এই সমস্ত শিল্পে সমস্ত উচ্চপদগুলি বিদেশীরা অধিকার করিত। তাহাদের বেতন বাবদ বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যাইত। এদেশীয়রা শুধু নিম্নবেতনের শ্রমিকের কাজ পাইত। তাহাদের চাকুরির শর্তাবলী ও পরিবেশ মোটেই ভাল ছিল না। তাহাদের অবস্থা ছিল অনেকটা ক্রীতদাসের মত। এই সমস্ত শিল্পের প্রয়োজনীয়

ফলাফল

সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সবই বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। আধুনিক শিল্পগুলি এদেশে যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদন শিল্প গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে নাই।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. উইলসন ভারত সম্পর্কিত ব্রিটিশ শিল্প ও বাণিজ্য নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয় শিল্পোৎপাদকের সর্বনাশ সাধন করিয়া ব্রিটেনের কল-কারখানাগুলির সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হইত তাহা হইলে সে ব্রিটিশজাত পণ্যের উপর চড়া আমদানী শুল্ক স্থাপন করিয়া তাহার স্বদেশী শিল্পকে অসম-প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইতে পারিত। তাহার নিজস্ব শিল্পগুলি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইত। প্রায় বিনাশুল্কে প্রচুর পরিমাণে ব্রিটিশ বস্ত্র ভারতে আমদানীর ফলে এদেশের জাতীয় বা বয়ন শিল্প প্রায় ধ্বংস হইয়া যায়। লক্ষ লক্ষ তাঁতী ও বস্ত্র শিল্পের সহিত যুক্ত কারিগর জীবিকাচ্যুত হয়। তাঁতীদের এক বড় অংশ বয়নশিল্প ত্যাগ করিয়া কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য ও কারিগরের জীবিকা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে তাঁতী ও কারিগরদের এক বড় অংশ চরম দুরবস্থায় পতিত হয়। দক্ষিণ ভারতের তাঁতীদেরও এই রকম দুর্দশার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

ভারতীয় বয়ন শিল্পের পতন

ভারত হইতে শিল্পপণ্য রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় ভারত সরকার এদেশ হইতে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রপ্তানীতে উৎসাহ দেন। ব্রিটেনের কল-কারখানাগুলি চালু রাখিবার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল। তুলা ও রেশম ছাড়া নীল, চা, খাদ্যশস্যও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি শুরু হয়। ব্রিটেনে এইসব কৃষিপণ্যের অভাব ছিল। ১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার এ্যাক্টে ইংরেজেদের এদেশে ভূমিক্রয় ও খামার স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। ইহার ফলে এদেশে তুলা, রেশম, নীল, আফিম ও চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এইসব পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানীর মাধ্যমে কোম্পানীর বিনিময় সমস্যারও সুরাহা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুসৃত শিল্প ও বাণিজ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি: (১) এদেশকে ব্রিটিশ শিল্প-পণ্যের বিস্তৃত বাজারে পরিণত করা হয়। (২) এদেশ হইতে ব্রিটেনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। (৩) ব্রিটিশ পুঁজি এদেশে কাঁচামাল, কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণে নিয়োগ করা হয়। (৪) এদেশীয় শিল্পকে রক্ষা ও আধুনিকীকরণের কোন চেষ্টা হয় নাই। ফলে, ভারতের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় বয়ন শিল্পের পতন ঘটে।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতের নূতন ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাংস্কৃতিক জগৎ

(The Cultural Scene)

(ক) শিক্ষা (Education) ঃ

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে এদেশে একধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ রাজা, নবাব ও ধনী ব্যক্তিদের অর্থানুকুল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতের গ্রামে গ্রামে ছিল মক্তব ও পাঠশালা। মক্তব ও পাঠশালার মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রগণ বর্ণপরিচয়, অঙ্ক পড়িতে ও লিখিতে শিখিত। মক্তব ও পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রগণ মাদ্রাসা ও সংস্কৃত টোলে ভর্তি হইত। মাদ্রাসা ও টোলে সাধারণতঃ ধর্ম, দর্শন, কাব্য, আইন, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না। সমাজের বাস্তব অবস্থা ও তাহার যুক্তিসঙ্গত সমাধানের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা উপেক্ষিত হইত। কোনরকম মৌলিক চিন্তা-ভাবনাকে উৎসাহ দেওয়া হইত না। ফার্সী সেকালের সরকারী ভাষা ছিল। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই ফার্সী শিখিত। এই দেশে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। শিক্ষক মহাশয়রা সমাজে সম্মান পাইতেন। স্ত্রী-জাতির মধ্যে শিক্ষার তেমন চলন ছিল না। উচ্চবর্ণের মহিলারা কেহ কেহ গৃহের মধ্যে লেখাপড়া শিখিতেন। চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তববাদী বা প্রগতিশীল বলা চলে না।

এদেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতকের শেষদিক হইতে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়া যায়। ইংরেজ বণিক সংস্থায় চাকুরিলাভের উদ্দেশ্যে এদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু কিছু স্কুল স্থাপিত হয়। এগুলিতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। ড্রুমো, শেরবোর্ণ ও পাদরী মে এইরূপ স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারক পাদরীগণ, এদেশীয় কৃতী ব্যক্তিগণ ও কিছু সহৃদয় ইংরেজ সর্বপ্রথম এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পাদরীগণ মনে করিতেন ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইলে এই দেশে ধর্মপ্রচার সহজ হইবে। এদেশীয় কৃতী ব্যক্তিগণ মনে করেন ইংরাজী ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার না ঘটিলে এদেশীয় কুসংস্কারচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় মানসিকতার অবসান ঘটিবে না। সহৃদয় ইংরেজগণ ভারতের উন্নতি ও প্রগতির স্বার্থে এইরূপ প্রয়াসে উৎসাহ দিতেন।

ইংরাজী শিক্ষার সূচনা

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তিনটি কারণে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন চাহিতেন। (১) সরকারী প্রশাসনে ও বণিক সংস্থাগুলিতে অল্প ব্যয়ে ইংরাজী জানা কর্মচারী সংগ্রহ

করা। এই বিশাল দেশশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী ইংলণ্ড হইতে আমদানী করা সম্ভব হইত না। (২) ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইলে এদেশে নব্য ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের রুচির পরিবর্তন ঘটিবে। তাহারা ব্রিটিশ পণ্য পছন্দ করিবে। ইহাতে এদেশে ব্রিটিশ পণ্যের বিস্তৃত বাজার গড়িয়া উঠিবে। (৩) ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করিবে। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে ইংরেজ-প্রীতি বদ্ধমূল হইবে। লর্ড মেকলে এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া এদেশে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে সরকারী আগ্রহের কারণ

কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথম ষাট বৎসর এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে সরকারী উদ্যোগ ছিল না। গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ খ্রীঃ কলিকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জোনাথান ডানকান কাশীতে ১৭৯২ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী ও হিন্দু ধর্ম, দর্শন ও আইনে পারদর্শী কিছু মৌলভী ও পণ্ডিত সৃষ্টি করা। ইঁহারা কোম্পানীর আদালতগুলিতে ইউরোপীয় বিচারকগণকে পরামর্শ দান করিবেন। ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক সংস্থাগুলি, উইলবারফোর্স, চার্লস গ্র্যাণ্ট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এবং কিছু সংস্কারপন্থী প্রগতিবাদী নেতা ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের উপর চাপ দিতে থাকেন। ১৮১৩ খ্রীঃ চার্টার এ্যাক্টে প্রথম এদেশের শিক্ষাপ্রসারে কোম্পানীর দায়িত্ব স্বীকার করা হয়। এই আইনে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সামান্য এক কর্মসূচীও নেওয়া হয়। একলক্ষ টাকা এদেশের শিক্ষাখাতে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়। তবে ১৮২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত কোম্পানী এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। ঐ বৎসর কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। আগেই বেসরকারী উদ্যোগে হিন্দু কলেজ (১৮১৭) ও শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সহৃদয় ইংরেজ ডেভিড হেয়ার ও এদেশের কৃতী ব্যক্তিগণের উদ্যোগে কলিকাতায় স্কুল সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটি গড়িয়া উঠে। উহারা ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পাঠ্য-পুস্তক সরবরাহ করিত।

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে সরকারী উদ্যোগ

ভারতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ টাকা ব্যয় করিবার জন্য 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' গঠিত হয়। এই কমিটির মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার মাধ্যম লইয়া তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। প্রাচ্যবাদীরা শিক্ষাব্যবস্থায় এই দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার সহিত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে তাঁহারা শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রতীচ্যবাদীরা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রচলনের সুপারিশ করেন। ১৮২৩—১৮৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদীদের মধ্যে এই বিতর্ক চলিয়াছিল।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদীদের মধ্যে বিতর্ক

১৮৩৫ খ্রীঃ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের শিক্ষা-বিষয়ক উপদেষ্টা লর্ড মেকলের সুপারিশে এই বিতর্কের অবসান হয়। মেকলে সিদ্ধান্ত করেন যে (মেকলের মিনিট,

২রা ফেব্রু. ১৮৩৫) এদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডার খুবই দীন এবং ভাষাগুলি দুর্বল। তিনি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষার সুপারিশ করেন। বেণ্টিঙ্ক এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকারী আদেশ (৭ই মার্চ, ১৮৩৫) জারী করেন। দীর্ঘ বিতর্কের অবসান হয়। রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইহার পর সরকারী উদ্যোগে এদেশে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই। সরকার মনে করেন যে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ সামান্য অর্থে মাত্র মুষ্টিমেয় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। তাঁহারা দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার করিবেন। এই ধারাণা ছিল ভ্রান্ত। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার করিতে পারেন নাই। তবে রাজনৈতিক সংগঠন, সংবাদপত্র, পুস্তিকা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইঁহারা আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনা, জাতীয়তাবাদ, সাম্য, ন্যায় বিচারবোধ প্রভৃতি ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করিতে অনেকাংশে সফল হন।

ইংরাজী শিক্ষার দুর্বলতা

১৮৫৪ খ্রীঃ 'বোর্ড অব কণ্ট্রোলের' প্রেসিডেণ্ট চার্লস উড ভারতের শিক্ষা-সম্পর্কিত বিস্তৃত নির্দেশ পাঠান। উডের 'ডেসপ্যাচ' এদেশের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই নির্দেশে ভারত সরকারকে ভারতীয়দের শিক্ষার দায়িত্ব লইতে বলা হয়। প্রতিটি প্রদেশে শিক্ষা-বিভাগ স্থাপন ও কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। প্রাইমারী হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইহাতে বিস্তৃত নির্দেশ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্কুল-কলেজের পঠন-পাঠন, পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচন ও পরীক্ষা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়।

চার্লস উডের ডেসপ্যাচ ১৮৫৪

(১) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এদেশে ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৮৪৪ খ্রীঃ সরকার ইংরাজী জ্ঞানকে সরকারী চাকুরীর জন্য আবশ্যিক শর্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার ফলে এদেশে যুগযুগান্তরের ঐতিহ্যবাহী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অবহেলিত হয়। প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থার পতন ঘটে। টোল ও মাদ্রাসার শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অনাদরের শিকার হয়। উইলিয়ম এ্যাডামের রিপোর্টে (১৮৩৫) এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার দুরবস্থার চিত্রটি ধরা পড়িয়াছে। অপরদিকে ইংরাজী স্কুল ও কলেজ দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকে। মাতৃভাষা শিক্ষা বা ঐতিহ্যগত শিক্ষায় জনগণের আগ্রহ কমিয়া যায়। (২) ইংরাজী ভাষাকে এদেশের শিক্ষার মাধ্যম করিবার ফলে দেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে। উচ্চশিক্ষালাভ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এ শিক্ষা নগর-কেন্দ্রিক ধনিক শ্রেণীর একচেটিয়া হইয়া দাঁড়ায়। নব্য ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়ের সহিত এদেশীয় জনসাধারণের মানসিক ব্যবধান গড়িয়া উঠিতে থাকে। (৩) নূতন শিক্ষাব্যবস্থার এক প্রধান ত্রুটি হইল স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে ঔদাসীন্য। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার অবনতি

ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থায় অন্যান্য ত্রুটি

আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হইত না। রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার করিয়া সরকার এই সমাজের বিরাগভাজন হইতে চাহেন নাই। (৪) ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে যথোপযুক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। ১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত মাত্র তিনটি মেডিকেল কলেজ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থাপিত হইয়াছিল। রুরকিতে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে শুধু ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রগণের প্রবেশাধিকার ছিল।

একথা ঠিক, ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার অনেক ত্রুটি ছিল। আধুনিক শিক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে নাই। সাধারণ শিক্ষাও জনগণের মধ্যে প্রসারিত হয় নাই। মাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তি এই শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র শিক্ষিত শ্রেণী ইউরোপীয় ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়া এদেশে তাহা প্রচার করেন। ইউরোপের বুদ্ধি-বিভাসা, যুক্তিবাদ, মানবিকতা, বিজ্ঞান-মনস্কতা ও প্রগতিশীল মতবাদ দেশে প্রচার করা হয়। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে উদ্ভূত সমাজ, অর্থনীতি ও দর্শনের সহিত ভারতবাসীর মানসিক যোগ স্থাপিত হয়। নব ভাবধারার প্রবক্তা বেকন, লক, ভলটেয়ার, রুশো, কাণ্ট, এডাম স্মিথ ও বেন্থাম শিক্ষিত ভারতীয়ের মনন ও চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করেন। নূতন কালের সাহিত্য-রথী ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বাইরন, শেলী ও চার্লস ডিকেন্স নূতন সাহিত্যরসের সন্ধান দেন। ভারতীয়দের মনোজগতে নবজাগরণ ঘটিতে শুরু করে।

ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত পরিচয়

(খ) **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন** (**Social and cultural movements**):

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে এক নবচেতনার উন্মেষ হয়। ইতালীর নবজাগরণের সহিত সাদৃশ্য থাকায় ইহাকে 'নবজাগরণ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বাংলা ও মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। পরে ধীরে ধীরে ইহা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতীয় জীবনে, সমাজ ও ধর্মে নানা কুসংস্কার, জড়তা, অবক্ষয় ও দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল। মুঘল শাসনের শেষ দিকে এই অবক্ষয় খুব প্রকট হইয়া পড়ে। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইউরোপীয় ভাবধারা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সহিত ভারতবাসীর পরিচয় গড়িয়া উঠে। ইউরোপের যুক্তিবাদ, মানবিকতাবোধ ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ভারতীয় মনে গভীর প্রভাবে বিস্তার করে। একদল রক্ষণশীল ভারতীয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও ধর্মকে অনুসরণ করাকেই শ্রেয় মনে করেন। প্রগতিপন্থী অপরদল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ভারতের উন্নতি সম্ভব বলিয়া মনে করেন। ইহারা পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও উদার মানবিকতাবোধের প্রতি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দেশে নূতন সামাজিক

নবজাগরণের পটভূমিকা

শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ধনী, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ চাহিয়াছিলেন।

বাংলার শিক্ষিত মননশীল ব্যক্তিগণ দেশের শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সংবাদপত্রের বিভিন্ন দিকে পরিবর্তনের-পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন পশ্চিমী ভাবধারার আলোকে নূতন সংস্কার ও প্রগতিবাদী আন্দোলন একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া ভারতের মুক্তি সম্ভব নয়। প্রাচীন সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার সংস্কার না হইলে ভারত আধুনিক বিশ্বে স্থান করিয়া লইতে পারিবে না। চিরকাল তাহাকে অপর জাতির পদানত হইয়া থাকিতে হইবে। ব্রিটিশ শাসন বাংলাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের মধ্যে এইখানে ইংরাজী শিক্ষার সূচনা ও বিস্তার প্রথম ঘটিয়াছিল। স্বাভাবিক-ভাবে ভারতীয় নবজাগরণের আন্দোলন এইখানেই শুরু হয়।

বাংলায় নবজাগরণ

রাজা রামমোহন রায়ঃ বাংলায় এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩)। তাঁহাকে 'আধুনিক ভারতের জনক' বলা হয়। এই দেশের মানুষের সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ছিল তাঁহার গভীর মমতা। দেশের ধর্মীয় কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, নারীজাতীর দুরবস্থা, অশিক্ষা ও রাজনৈতিক অজ্ঞতা তাঁহাকে পীড়া দিত। হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে এক সম্পন্ন পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র রামমোহন অল্প বয়সে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী, ইংরাজী, ল্যাটিন প্রভৃতি বারটি ভাষা জানিতেন। তিনি হিন্দু, জৈন, ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া সকল ধর্মমতকে বুঝিবার চেষ্টা করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়া রামমোহন হন সমন্বয়বাদী। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া রামমোহন কিছু কাল সরকারী রাজস্ব বিভাগে সেরেস্তাদারের কাজ করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ সরকারী চাকুরি হইতে অবসর লইয়া রামমোহন কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করিয়া তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।[১] ১৮৩০ খ্রীঃ বিলাত গমন পর্যন্ত রামমোহন রায় বাংলার সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামমোহনের শিক্ষা ও মানসিকতা



রাজা রামমোহন রায়

(১) শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

রামমোহন এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন। মহামতি ডেভিড হেয়ার ছিলেন তাঁহার বন্ধু। হেয়ার প্রতিষ্ঠিত 'স্কুল বুক সোসাইটির' তিনি ছিলেন একজন সদস্য। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও রামমোহন যুক্ত ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নিজে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচারক আলেকজাণ্ডার ডাফকে তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করেন। রামমোহনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হইল হিন্দুধর্মের সংস্কার ও 'ব্রহ্ম সভা' স্থাপন। বেদ ও উপনিষদের একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি ১৮২৮ খ্রীঃ 'ব্রহ্ম সভা' স্থাপন করেন। সর্ব জাতি ও ধর্মের লোকের জন্য তাঁহার সভার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন সমস্ত ধর্মের মূলকথা এক। রামমোহনের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' রামমোহন রায়ের ধর্ম-সমন্বয়, একেশ্বরবাদ, সমাজ-সংস্কার ও স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ প্রচার করিতে থাকে। হিন্দুসমাজের কু-প্রথাগুলি দূর করিবার জন্য রামমোহন আন্দোলন শুরু করিয়া যান। স্ত্রীলোকদের সহমরণপ্রথা বন্ধ করিতে তিনি উদ্যোগ লন। তাঁহারই আন্দোলনের ফলে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রীঃ আইন করিয়া সহমরণ প্রথা বন্ধ করিয়া দেন। রামমোহন বহু-বিবাহ ও শিশু-বিবাহ প্রথারও বিরোধী ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ও স্ত্রীলোকদের সম্পত্তিতে অধিকার দেওয়ার জন্য তিনি আন্দোলন করেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগীগণ (দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী) তাঁহার আন্দোলনকে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেন।

শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার

রামমোহন রায় শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ছাড়াও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যান্য দিকগুলিরও সূত্রপাত করেন। তিনি বাংলা ভাষায় গদ্য-রীতির একজন প্রবর্তক। বাংলা, ইংরাজী ও ফার্সী ভাষায় ('Brahmanical Magazine', 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'মিরাতুল আকবর') সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেশবাসীকে সচেতন করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন। এদেশের মানুষের বৈষয়িক উন্নতি, কৃষকদের দুঃখ দূর ও ভারতীয়দের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা করিয়া যান। তিনি উচ্চ সরকারী পদের ভারতীয়করণ, প্রশাসন বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ ও জুরির সাহায্যে বিচারের দাবী করেন। বিচারের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্যের অবসানও তাঁহার দাবী ছিল। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে রামমোহন বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পূজারী। রবীন্দ্রনাথের মতে, রামমোহন রায় ছিলেন 'ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ'।

রামমোহনের অন্যান্য অবদান

ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন ঃ ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রগতিশীল ও সংস্কারপন্থী আন্দোলন খুব জোরদার হয়।

এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইঙ্গ-ভারতীয় হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯—১৮৩১)। ইনি ছিলেন অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন হিন্দু কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক। ছাত্রদের যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তার অনুশীলন করিতে তিনি উপদেশ দিতেন। ইউরোপের আধুনিকতম ধ্যান-ধারণার তিনি প্রচার করিতেন। ইউরোপের বুদ্ধি-বিভাসা, যুক্তিবাদ ও মানবিকতাবাদ, ফরাসী বিপ্লব, সাম্য, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ তিনি ছাত্রদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন। 'এ্যাকাডেমিক এশোসিয়েশন' স্থাপন করিয়া তিনি ছাত্রদের কুসংস্কারমুক্ত, নির্ভীক, সত্যবাদী ও দেশপ্রেমিক হইতে উপদেশ দিতেন। মাতৃভূমির দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তিনিই প্রথম দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেন। প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রচার করিবার জন্য হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ১৮৩১ খ্রীঃ ডিরোজিওকে পদচ্যুত করেন। ইহার কয়েকমাস পরে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি মারা যান।

ডিরোজিওর চিন্তা-ভাবনা



ডিরোজিও

ডিরোজিরও মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় ছাত্ররা—রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিরী প্রভৃতি 'সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব জেনারেল নলেজ' স্থাপন করিয়া পুরাতন কুসংস্কার ও রক্ষণশীল সামাজিক আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইঁহারা 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত হন। ইঁহারা ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তার, নারী প্রগতি ও ভারতের বৈষয়িক উন্নতির জন্য বিতর্কে যোগ দেন। সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা (এনকয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ, কুইল ইত্যাদি) ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া ইয়ংবেঙ্গল দল জনমত গঠন করেন। বিভিন্ন আলোচনা সভায়, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে ইঁহারা বিচারব্যবস্থার সংস্কার, উচ্চ-সরকারী চাকুরিতে ভারতীয় নিয়োগ, জমিদারদের অত্যাচার হইতে রায়তদের রক্ষা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ভারতীয়দের দুর্দশার কথা আলোচনা করেন।

ইয়ংবেঙ্গল দল কার্যকলাপ

ইয়ংবেঙ্গল দল ছিল নগর-কেন্দ্রিক উগ্র সংস্কারপন্থী দল। দেশের আপামর জনসাধারণ বা কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। তবুও বলা যায় ইঁহারা দেশে যে আন্দোলনের সূচনা করেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই। কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সমাজে ইঁহারা যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নব-চেতনার সৃষ্টি করেন তাহা ভারতের নবজাগরণের পথকে প্রশস্ত করিয়া দেয়। পরবর্তীকালে সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় ইয়ংবেঙ্গল দল সম্পর্কে লিখিয়াছেন ‘এঁরাই বাংলায় আধুনিক সভ্যতার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এঁরাই আমাদের জাতির পিতা’।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরঃ বাংলায় সামাজিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। ইনি ছিলেন বহুগুণ-সম্পন্ন একজন মহান ব্যক্তি। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াও তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মর্ম বুঝিতেন। ব্রাহ্মণ-পন্ডিত বিদ্যাসাগর ছিলেন উদার ও প্রগতি পন্থী। তিনি ছিলেন এদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রতীক।

চরিত্র ও মানসিকতা

ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, তেজস্বী ও নির্ভীক পুরুষ। মহান মানবদরদী এই মানুষটির দীন-দরিদ্র, পীড়িত ও নির্যাতীত মানুষের প্রতি অপার করুণা ছিল। বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক বলা হইয়া থাকে। শিশুদের জন্য তিনি ‘বর্ণপরিচয়’, ‘বোধোদয়’ ও ‘কথামালা’ রচনা করেন। ‘সীতার বনবাস’, ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ ও ‘আখ্যান মঞ্জরী’ লিখিয়া তিনি বাংলা ভাষায় নূতন প্রাণসঞ্চার করেন। তাঁহার অবদানে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বাহন হয়।



পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-বিস্তার ও নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য অবিস্মরণীয় হইয়া আছেন। বিদ্যাসাগর রামমোহন রায়ের মত বিশ্বাস করিতেন যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার না হইলে এদেশের উন্নতি হইবে না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বিদ্যাসাগর সেখানে ইংরাজী পাঠ্যক্রম চালু করেন। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য মেট্রোপলিটান কলেজ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠা তাঁহার এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকে তিনি অগ্রাধিকার দেন।

শিক্ষা বিস্তার

তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বালিকাদের জন্য বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। ইহা ছাড়া সারা বাংলাদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি পঁয়ত্রিশটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি নিজে বহু টাকা ব্যয় করেন। শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তার সহিত বিবাদ করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলার গ্রামাঞ্চলে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি শিক্ষাকে সমাজ ও জাতির মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করিতেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনে ছিলেন রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরী। তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেন।

পরাশরসংহিতা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া তিনি বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া দেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়। তিনি নিজের টাকায় অনেক বিধবার বিবাহ দেন। বিধবাদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য তিনি তহবিল গঠন করেন। এইজন্য তাঁহাকে রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। বিদ্যাসাগর বহু-বিবাহ, কুলীনপ্রথা ও শিশু-বিবাহের বিরোধিতা করেন। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, নারীমুক্তির জন্য অনলস প্রয়াস ও দুস্থ ও পীড়িতের প্রতি তাঁহার অপার করুণা বিদ্যাসাগর চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

নারী-শিক্ষা আন্দোলন

মহারাষ্ট্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঃ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা-দেশের মত মহারাষ্ট্রেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন দেখা দেয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য 'স্টুডেণ্টস লিটারারী ও সায়েণ্টিফিক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার গুজরাটী ও মারাঠী দুইটি শাখা ছিল। 'জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডলী' নামে পরিচিত এই সমিতি বিজ্ঞান ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণের বোধগম্য আলোচনার আয়োজন করিত। এই সমিতি নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৮৫১ খ্রীঃ জ্যোতিবা ফুলে এবং তাঁহার স্ত্রী পুনাতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার অল্পকাল পরে আরও কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভাওদাজী ও শঙ্কর শেঠ প্রভৃতি কৃতীপুরুষগণ মহারাষ্ট্রে নারী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জ্যোতিবা ফুলে মহারাষ্ট্রে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিত বিধবা-বিবাহ আন্দেলনকে জোরদার করেন। তিনি বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিশিষ্ট-সমাজ সংস্কারক কারসন দাস মুলজী বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে যোগদান করেন। বিধবা-বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দান ও জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে মুলজী ১৮৫২ খ্রীঃ 'সত্যপ্রকাশ' নামে এক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

নারী-শিক্ষা বিস্তার ও বিধবা-বিবাহ আন্দোলন

মহারাষ্ট্রে প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের নেতা ছিলেন গোপালহরি দেশমুখ। সমাজের মঙ্গলজনক বহু প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত থাকিবার জন্য তিনি 'লোকহিতবাদী' আখ্যা পান। যুক্তিবাদ, মানবহিতৈষণা ও ধর্মনিরপেক্ষতা তাঁহার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূলমন্ত্র ছিল। এই সমস্ত আদর্শের ভিত্তিতে নূতন ভারতীয় সমাজ গঠন তাঁহার স্বপ্ন ছিল। জ্যোতিবা ফুলে ছিলেন তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক। পশ্চিম ভারতের সামাজিক কুসংস্কার, অবিচার, অসাম্য, অমানবিক আচরণ ও অস্পৃশ্যতা তাঁহাকে পীড়া দিত। উচ্চবর্ণের মানুষের নিম্নবর্ণের প্রতি অযৌক্তিক, নীতিহীন ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। পশ্চিমাঞ্চলের পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন দাদাভাই নৌরোজী। পার্শীদের মধ্যে নারীমুক্তি, নারীর অধিকার-প্রতিষ্ঠা ও বিবাহ-সম্পর্কিত আইন-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যে সমিতি গঠিত হয় তিনি তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

সমাজ-সংস্কার আন্দোলন

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও ঃ**—(ক) কত খ্রীঃ কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে ? (খ) দ্বৈত-শাসনের অর্থ কি ? (গ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে চালু করেন ? (ঘ) মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব কত খ্রীঃ গৃহীত হয় ? (ঙ) রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের প্রথম 'আধুনিক মানুষ' বলা হয় কেন ? (চ) ডিরোজিও কে ছিলেন ? (ছ) ব্রাহ্ম-সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ? (জ) কলিকাতা মেডিকেল কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ? (ঝ) অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি কে প্রবর্তন করেন ? (ঞ) কোন্ গভর্ণর-জেনারেলের সময় সিন্ধুপ্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ? (ট) সতীদাহ প্রথা কে উচ্ছেদ করেন ?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**—(ক) দ্বৈত-শাসনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (খ) দ্বৈত-শাসনের ফলাফল কি হইয়াছিল ? (গ) ব্রিটিশ ভূমি-রাজস্ব-নীতির ফলাফল আলোচনা কর। (ঘ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়া কি ধরনের বিতর্ক দেখা দেয় ? (ঙ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার মূল কারণগুলি কি ? (চ) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এদেশে অবশিল্পায়নের কারণ কি ? (ছ) ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের আগে এদেশে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল ? (জ) ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কি কারণে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে আগ্রহী হন ? (ঝ) এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ফলাফল কি হইয়াছিল ? (ঞ) ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কি ?

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর ঃ**—(ক) হেস্টিংস হইতে কর্ণওয়ালিস পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা কিভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয় ? (খ) হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিশের বিচার ও পুলিস বিভাগীয় সংস্কারের পরিচয় দাও। (গ) ব্রিটিশ ভূমি-রাজস্ব-নীতির পরিচয় দাও। (ঘ) এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ঙ) রাজা রামমোহন রায়ের জীবন ও সাধনার পরিচয় দাও। (চ) সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আলোচনা কর। (ছ) মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (জ) পলাশী যুদ্ধের পরবর্তীকালে কোম্পানীর শিল্প ও বাণিজ্য-নীতিতে কি পরিবর্তন দেখা দেয় ? (ঝ) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোম্পানীর শিল্প ও বাণিজ্য-নীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। **টীকা লিখ ঃ**—(ক) মহলওয়ারী বন্দোবস্ত (খ) রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত (গ) চার্লস উড ডেসপ্যাচ (ঘ) হিন্দু কলেজ (ঙ) জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা (চ) এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন (ছ) মিরাতুল আকবর (জ) আত্মীয় সভা (ঝ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঞ) ডেভিড হেয়ার (ট) বিধবা-বিবাহ আইন (১৮৫৬)।

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**—(ক) দ্বৈত্য শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশে — স্থায়ী হইয়াছিল। (খ) দ্বৈত শাসনকালে — বাংলার ডেপুটি সুবাদার ছিলেন। (গ) পিটের

ভারত শাসন আইন (১৭৮৪) — গঠিত হয়। (ঘ) ব্রিটিশ সরকার এদেশে — ধরনের ভূমি-রাজস্ব নীতি চাল্ করেন। (ঙ) ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে এদেশের — শিল্প ধ্বংস হয়। (চ) — খ্রীঃ চার্টার এ্যাক্টে এদেশে শিক্ষাবিস্তারে কোম্পানী দায়িত্ব গ্রহণ করে। (ছ) বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য — সংহিতা হইতে উদ্ধৃতি দেন। (জ) সামাজিক সংস্কার কার্যের জন্য — লোকহিতবাদী আখ্যা পান।

৬। শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও ঃ—(ক) হেস্টিংস / কর্ণওয়ালিশ সদর দেওয়ানী আদালত গঠন করেন। (খ রেগুলেটিং এ্যাক্ট / পিটের আইনে প্রথম পার্লামেণ্ট কোম্পানীর শাসনে হস্তক্ষেপ করে। (গ) ফ্রান্সিস / হেংস্টিংস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম প্রস্তাবক। (ঘ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথমে বাংলা-বিহার / কাশী, উড়িষ্যা, উত্তর মাদ্রাজে চাল্ করা হয়। (ঙ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার / কৃষকের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। (চ) অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটে। (ছ) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদীদের বিতর্ক ১৮২৩ / ১৮২৫ খ্রীঃ শেষ হয়। (জ) জ্যোতিবা ফুলে মহারাষ্ট্রের ধর্ম আন্দোলন / সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ

(Peasant unrest and uprisings)

(ক) ওহাবী ও ফরাজী আন্দোলন (Wahabi and Farazi movement) :

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলমান সমাজ। মুসলমানদের নিকট হইতে ব্রিটিশ শাসকগণ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিয়া লয়। ইহাতে মুসলমান শাসকগোষ্ঠী একই সঙ্গে ক্ষমতা ও বৃত্তি চ্যুত হয়। ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ না করিবার ফলে সরকারী কাজকর্ম ও বিচার-বিভাগ হইতে মুসলমানগণ ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে থাকে। এদেশের কৃষক ও কারিগর সমাজের একাংশ মুসলমান। তাহারা নূতন শাসনব্যবস্থার অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। সমগ্র মুসলমান সমাজের মধ্যে দুর্দশা, হতাশা ও অবক্ষয়ের সূচনা হয়। এই হতাশা ও দুরবস্থা হইতে মুসলমান সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (১৭০৩-৬৩) ও তাঁহার পুত্র শাহ্ আজিজ ইসলামের পরিশুদ্ধির মধ্যে ভারতীয় মুসলমানের মুক্তির পথ নিহিত বলিয়া মনে করেন। দীর্ঘকাল ভারতে বসবাসকারী ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ইসলাম-বিরোধী আচার-আচারণ, রীতি-নীতির অনুপ্রবেশ ভারতীয় মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ বলিয়া ইহারা মনে করেন। ঠিক একই সময়ে আবদুল ওহাব নামক একব্যক্তি আরবদেশে ইসলামের সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার নামানুসারে এই আন্দোলনের নাম হয় ওহাবী আন্দোলন।

ওহাবী ও ফরাজী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলীর অধিবাসী সৈয়দ আহম্মদ (১৭৮৬-১৮৩১) ভারতে ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। মক্কায় হজ করিবার সময় তিনি আবদুল ওহাবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। ইসলামের পবিত্র আদর্শ কোরান, শরিয়ত ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে সংস্কার আনয়নের চেষ্টা করেন। গোড়াতে ইহা ছিল ধর্মীয় আন্দোলন। পরে সৈয়দ আহম্মদ ইহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যোগ করেন। ভারত 'দারুল-হারব' বা বিদেশী শাসকের অধীন। ইহাকে 'দারুল-ইসলাম' বা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কর্তব্য। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণের দিকটিও ওহাবী আন্দোলনে প্রাধান্য পায়। সৈয়দ

ওহাবী আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ

আহম্মদ মনে করিতেন ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে শোষণ করিতেছে। ব্রিটিশ শাসকদের বিতাড়িত না করিলে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান হইবে না।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৈয়দ আহম্মদ সারা ভারতব্যাপী রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন গড়িয়া তোলেন। তাঁহার দুই বিশিষ্ট অনুচর বিলায়েত আলী ও ইনায়েত আলী এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করেন। উত্তর-পশ্চিমের পাঠান রাজ্যে ওহাবীদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপিত হয়। শিখ রাজা রঞ্জিৎ সিংহ পেশোয়ার অধিকার করিবার পর শিখ রাজ্যের সহিত ওহাবীদের সংঘর্ষ দেখা দেয়। ১৮৩১ খ্রীঃ শিখদের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ নিহত হন। সৈয়দ আহম্মদের মৃত্যুর পরও এই আন্দোলন চলিতে থাকে। উত্তর প্রদেশের সীতানা ও পাটনা ওহাবীদের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ওহাবীগণ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। ওহাবী আন্দোলনে ধীরে ধীরে কৃষক, কারিগর ও মজুর শ্রেণীর লোকেরা যোগ দিতে থাকে। হিন্দুদের অনেকে এই আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৮২০-১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই আন্দোলন উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে শক্তিশালী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হিসাবে দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকার বল প্রয়োগে ওহাবী আন্দোলন দমন করেন।

ওহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত, বিস্তার ও পতন

ওহাবী আন্দোলনের চরিত্র লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সন্দেহ নাই ইহা ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী এক গণ-আন্দোলন। তবে ইহাকে জাতীয় আন্দোলন বলিয়া মানিয়া লইতে অনেকে আপত্তি করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব ইহাকে হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ওহাবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইসলামী রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ধর্মীয় নেতারা ইহা পরিচালনা করেন। ধর্মীয় নেতাদের পরিচালিত এই আন্দোলন আসলে ছিল কৃষক ও কারিগরদের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সেই যুগে ধর্ম-নিরপেক্ষ মানসিকতা বা ধর্ম-নিরপেক্ষ নেতা ছিল না। তাই ধর্মীয় আবরণের মধ্য দিয়া এই দেশের কৃষক সমাজকে বিদেশী ও স্বদেশী প্রভুদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয়।

ওবাহী আন্দোলনের চরিত্র

ফরাজী আন্দোলন ঃ ওহাবী আন্দোলন বাংলাদেশে ফরাজী আন্দোলন নামে পরিচিত। ফরিদপুরের হাজী শরিয়ৎউল্লাহ্ ছিলেন এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ও তাঁহার পুত্র দুধু মিঞা (১৮১৯-৬০) পূর্ব বাংলার জেলাগুলিতে এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। নিষ্ঠাবান, ধর্মপ্রাণ মুসলমান শরিয়ৎউল্লাহ্ প্রথমে শুধু ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে ফরাজী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল 'ফরজ' বা আল্লাহতালার আদেশের উপর নির্ভর করিয়া মুসলমানদের শুদ্ধ ধর্মীয় জীবন গড়িয়া তোলা। অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের সংস্কার সাধন করা তাঁহার পরিকল্পনা ছিল। পরে তিনি ইহার সহিত পূর্ব বাংলার নিগৃহীত কৃষক, কারিগর ও তাঁতীদের দাবীকেও যুক্ত করিয়া দেন। জমিদার ও নীলকরগণ কৃষকদের

ফরাজী আন্দোলনের কারণ

উপর অত্যাচার করিত। জোর করিয়া বাড়তি কর আদায় করিত বা বল প্রয়োগে নীল বুনিতে বাধ্য করিত। নীলকরদের নীল চাষ করিয়া কৃষকরা আর্থিক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইত। শরিয়ৎউল্লাহ্ প্রচার করেন যে জমি আল্লাহতালার সম্পত্তি। জমিতে উৎপন্ন ফসলের একাংশ নিশ্চয়ই সরকারের প্রাপ্য। তবে জমিদাররা বাড়তি কর কিছুতেই পাইতে পারেন না।

শরিয়ৎউল্লাহ্‌র পুত্র দুধু মিঞা জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করেন। তিনি পূর্ব বাংলার জেলাগুলিকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করিয়া প্রতি বিভাগে একজন করিয়া 'খলিফা' বা নেতা নিযুক্ত করেন। ফরাজী আন্দোলন পরিচালনার জন্য তহবিল গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হয়। দুধু মিঞা জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার সময় দেখেন যে ইহাদের আসল রক্ষাকর্তা হইল ইংরেজ শাসক। ইহার পর ফরাজী আন্দোলন ক্রমশঃ ইংরেজ-বিরোধী চরিত্র লাভ করে। দুধু মিঞা মুসলমান সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথা দূর করিবার চেষ্টা করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ দুধু মিঞার প্রভাব মনে রাখিয়া কোম্পানী তাঁহাকে বন্দী করে। ১৮৬০ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। দুধু মিঞার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নোয়া মিঞা এই আন্দোলন চালাইয়া যান। তবে ইংরেজ শাসক ও জমিদারদের সহিত সংঘর্ষের পথ পরিহার করা হয়।

দুধু মিঞার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় ফরাজী আন্দোলন

পশ্চিমবাংলায় ফরাজী আন্দোলনের নেতা ছিলেন **তীতুমীর** (১৭৮২-১৮৩১)। তীতুমীরের আসল নাম মীর নাসির আলি। ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার হায়দরপুর গ্রামে তীতুমীরের জন্ম হয়। তিনি মক্কাতে হজ করিবার সময় সৈয়দ আহম্মদের সংস্পর্শে আসেন এবং ওহাবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। ২৪ পরগনা, যশোর ও নদীয়ার কৃষক ও তাঁতীদের মধ্যে তীতুমীর ওহাবী মতবাদ প্রচার করেন। অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তিনি কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। ২৪ পরগনার নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা বানাইয়া তিনি নিজেকে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করেন। বারাসতের জমিদার কৃষ্ণ রায় কৃষকদের উপর বাড়তি কর স্থাপন করিলে তীতুমীর কর বন্ধ আন্দোলন পরিচালনা করেন। জমিদারের পাইকগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। তীতুমীর মুসলমান জমিদারদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেন। অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে তিনি কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। অর্থাৎ তিনি সমস্ত শোষিত ও নির্যাতিত কৃষকগণের প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

তীতুমীরের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলায় ফরাজী আন্দোলন

তীতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত ফরাজী আন্দোলন ছিল প্রকৃতপক্ষে শোষিত ও নিপীড়িত কৃষকগণের প্রতিরোধ আন্দোলন। বাংলার জমিদারদের বেশীর ভাগ ছিলেন হিন্দু। সেইজন্য মুসলমান নেতাদের পরিচালিত এই আন্দেলনকে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেন। একথা ঠিক, বাংলাদেশের ফরাজীরা অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয়

তীতুমীরের আন্দোলনের চরিত্র

দিয়াছিলেন। হিন্দুদের নিকট হইতে বলপূর্বক চাঁদা আদায়ের ঘটনা ঘটে। হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসেও তাঁহারা আঘাত দেন। তবে তীতুমীরের আন্দোলন ক্রমশঃ জমিদার ও সরকার বিরোধী হইয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ সরকার তীতুমীরকে বিদ্রোহী ঘোষণা করিয়া তাঁহার কেল্লা আক্রমণ করেন। ১৮৩১ খ্রীঃ মেজর স্কটের সহিত যুদ্ধে তীতুমীর প্রাণ হারান। বহু ফরাজী নিহত ও বন্দী হয়। এই কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। তবে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে ইহা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যায়: (১) এই আন্দোলন হইতে কৃষকগণ সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শিক্ষা লাভ করে। বাংলার পরবর্তীকালের কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলন ফরাজী আন্দোলন হইতে অনুপ্রেরণা পায়। (২) জমিদারগণ কৃষকদের উপর অতিরিক্ত বেআইনী কর স্থাপনে অনেক সংযত হন। (৩) এই আন্দোলন বাংলার প্রজাস্বত্ব আইনগুলিকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই দিক হইতে বিচার করিলে ফরাজী আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল বলা যায় না।

ফরাজী আন্দোলনের প্রভাব

(খ) **উপজাতি আন্দোলন (Tribal movements) :**

কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২) : বাংলা-বিহার সীমান্তে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজনের বাস। বাংলার মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুর, রাজমহল, পালামৌ, ছোটনাগপুর ও মানভূম লইয়া এই উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল গঠিত। পাহাড় ও অরণ্য বেষ্টিত এই অঞ্চলে কোল, মুণ্ডা, মানকি, ওঁরাও, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা বহুকাল ধরিয়া বসবাস করে। ১৮৩১-৩২ খ্রীঃ পালামৌ, ছোটনাগপুর ও সিংভূমের কোলগণ ব্রিটিশ শাসন ও ইহার সহযোগীদের শোষণের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ নেয়।

পটভূমিকা

একজন প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী মন্তব্য করিয়াছেন যে 'সমস্ত উপজাতি বিদ্রোহই আত্মরক্ষামূলক। যখন বহিরাগতরা তাহাদের জমি ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধাগুলি অধিকার করিয়া লয় তখন তাহাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। এই হতাশা হইতে বিদ্রোহ ঘটে'।[১] কোল বিদ্রোহের কারণগুলি মোট চারভাগে ভাগ করা যায়: (১) নূতন ভূমিব্যবস্থা, (২) উপজাতি ও উপজাতি-বহির্ভূত সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষ, (৩) ব্রিটিশ শাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা ও (৪) ঠিকাদার, বণিক ও মহাজনদের অত্যাচার ও শোষণ।

(১) কোল বিদ্রোহের প্রধান কারণ হইল এই অঞ্চলে ব্রিটিশের নূতন ভূমি-বন্দোবস্ত। কোলগণ বহুকাল যাবত সামান্য কর বা বিনাকরে তাহাদের জমি ভোগ-দখল

---

[১] Professor Haimendorf : 'all tribal rebellions were defensive movements : they were the last resort of tribesmen driven to despair by the encroachments of outsiders on their land or econmic resources.'

করিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হইবার পর এই অঞ্চলের রাজা বা জমিদাররা তাহাদের জমিতে নূতন জাগীরদার, ইজারাদার বা ঠিকাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত গড়িয়া তোলেন। কোলদের ভাল ভাল জমিগুলি নানা অজুহাতে অধিগ্রহণ করা হয়। এই ভূমি বঞ্চনা উপজাতীয় কৃষকদের ব্রিটিশ শাসক ও জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে। নূতন ইজারাদার শ্রেণী ইহাদের নিকট হইতে সালামী, তলবানা, রসুম প্রভৃতি খাতে অতিরিক্ত ভূমিকর আদায় করিত। ইহাতে কোলদের মধ্যে অবশ্যই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

কোল বিদ্রোহের কারণ

(২) কোল-অধ্যুষিত অঞ্চলের রাজা ও জমিদারদের মধ্যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ এবং হিন্দু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। ইহাতে শাসক শ্রেণী ও শাসিতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও মানসিক ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। কোলদের মধ্যে নিজস্ব ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য সঙ্কল্প ও দৃঢ় মানসিকতা গড়িয়া উঠে।[১]

(৩) ছোটনাগপুর, পালামৌ ও সিংভূম অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথাগত সংস্কৃতির সহিত আধুনিক সভ্যতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আর্থিক লেনদেন, চুক্তি-ভিত্তিক বৈষয়িক কাজকর্ম, নূতন নূতন কর, (যেমন—তাড়িকর) পুলিস বিভাগের দুর্নীতি এবং বিচার-বিভাগের জটিলতা তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

(৪) এই অঞ্চলে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ঠিকাদার, ইজারাদার ও মহাজনগণ নিরক্ষর, সরল মানুষদের ঠকাইত। শোষিত ও নির্যাতিত হইয়া কোলগণ প্রথমে ইজারাদার, মহাজন ও বণিকদের আক্রমণ করিয়াছিল।

১৮৩১ খ্রীঃ শেষদিকে কোলগণ সুই মুণ্ডা, টোপা মুণ্ডা, বিন্দ্রাই, সিনগ্রাই ও খাঁদু পাতের (Khandu Pater) নেতৃত্বে ছোট নাগপুর, পালামৌ ও সিংভূম অঞ্চলে বিদ্রোহ করে। ইজারাদার ও মহাজনদের বাড়ী আক্রমণ করিয়া অগ্নি সংযোগ, হত্যা ও লুণ্ঠন করে। ছয়মাস ধরিয়া এই বিদ্রোহ চলিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার বহু কোলকে হত্যা করিয়া ১৮৩২ খ্রীঃ এই বিদ্রোহ দমন করেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ঃ কোল বিদ্রোহের সহিত সাঁওতাল বিদ্রোহের মিল অনেকখানি। ১৮৫৫ খ্রীঃ বিহারের ভাগলপুর, রাজমহল ও বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলা লইয়া গঠিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটে। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সিধু, কানু, ডোমন মাঝি ও বীরসিং। সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ (১) সাঁওতালগণ ছিল সহজ, সরল অরণ্যচারী মানুষ। কৃষি, অরণ্যের কাঠ, ফলমূল, মধু ও পশু-পাখী শিকার ছিল তাহাদের জীবন ধারণের উপায়। উপজাতি দেব-দেবী, জিন, গুরু-পুরোহিত ও ওঝা লইয়া ছিল তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবন। এই অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে উপজাতীয় লোকদের ধারণা হয় তাহাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া

(১) J. C. Tha, The Kol Insurection of Chota-Nagpur.

যাইবে। বিদেশী শাসক নিরুপদ্রবে তাহাদের উপজাতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে দিবেন না। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতাগণ তাঁহাদের উপজাতীয় নেতাদের নির্দেশে বিদ্রোহ করেন। এই নেতারা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে ধর্ম-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। (২) কোল বিদ্রোহের মত সাঁওতাল বিদ্রোহের অপর প্রধান কারণ হইল নূতন ভূমি বন্দোবস্ত। সাঁওতালগণ প্রায় বিনাকরে এই অঞ্চলে ভূমি ভোগ-দখল করিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইবার পর নূতন ইজারাদার ও ঠিকাদাররা এ অঞ্চলে নূতন কর স্থাপন করে। জমিদাররা জমির মালিক হইয়া বসেন। উপজাতিদের জমির অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। শুধু তাহাই নয়, জমিদার ও তাহাদের গোমস্তারা উৎকৃষ্ট জমিগুলি নানা অজুহাতে ইহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যদের সহিত লাভজনক শর্তে বন্দোবস্ত করিত। নিজেদের বহুকালের ভূমি-অধিকার হইতে উৎখাত হইবার ফলে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

(৩) সাঁওতাল বিদ্রোহের অপর প্রধান কারণ হইল মহাজন, ব্যবসায়ী ও দালালদের অত্যাচার ও শোষণ। ব্রিটিশ শাসন, নূতন বিচারব্যবস্থা, চুক্তি-ভিত্তিক বৈষয়িক লেনদেন বা টাকার লেনদেন ব্যবস্থা ইহারা বুঝিত না। তাহাদের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগ লইয়া মহাজন ও ব্যবসায়ীরা ইহাদের শোষণ ও নির্যাতন করিত। সাঁওতালদের স্ত্রীলোকরা ইহাদের হাতে নির্যাতিত হইত। (৪) খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ, ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা সাঁওতালদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ধর্ম-প্রচারকগণ ব্রিটিশ শাসকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং সমস্ত রকম শোষণ ও নির্যাতনের জন্য তাহারা ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করে।

সিধু ও কানু ভাগলপুর, রাজমহল ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করেন। তাঁহারা স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী বহু আয়াসে দীর্ঘদিন ধরিয়া (১৮৫৫—৫৬) লড়াই করিয়া সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করে।[১] কোল ও সাঁওতালদের তীর-ধনুক, কুঠার ও বল্লম আধুনিক উন্নত সমরাস্ত্র ও রণকৌশলের নিকট পরাস্ত হয়। সাঁওতালগণ পরাস্ত হইলেও প্রতিরোধ একেবারে শেষ হয় নাই। এই বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতি রক্ষায় আগ্রহ দেখান। তাহাদের ভূমির অধিকার স্বীকার করিয়া করের হার কমানো হয়। মহাজন ও দালালদের শোষণের হাত হইতে সরলপ্রাণ মানুষদের রক্ষার ব্যবস্থা হয়। উপজাতি কৃষক বিদ্রোহ পরবর্তীকালে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহকে অনুপ্রাণিত করে।

---

(১) K. K. Datta, The Santal Insurection.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ

(The Revolt of 1857)

১৮৫৭ খ্রীঃ ভারতে এক গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। সৈন্যবাহিনীতে ইহা প্রথম শুরু হয়। সেইজন্য ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ ইহার নাম দেন সিপাহী বিদ্রোহ। সৈন্য-বাহিনীতে ইহা শুরু হইলেও পরে বেসামরিক জনগণ, কৃষক ও মজুর সকলেই এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ কৃষক, মজুর ও সিপাহী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই বিদ্রোহের প্রধান উৎস হইল কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিতৃষ্ণা যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

বিদ্রোহের কারণ ঃ

১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহের কারণগুলিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। লর্ড ওয়েলেসলীর আগ্রাসী নীতি এবং লর্ড ডালহৌসীর ছলে, বলে, কৌশলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার এই দেশীয় শাসকদের মনে ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করে। কোম্পানী দেশীয় রাজাদের দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করে নাই। চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা একের পর এক রাজ্য গ্রাস করিবার ফলে বহু ভারতীয় শাসক ইংরেজদের শত্রুতে পরিণত হন। সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানাসাহেব ও ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের উপর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকার নানাসাহেবের পেনসন বন্ধ করিয়া দেন। ঝাঁসীর রানীর দত্তকপুত্রকে সরকার রাজা বলিয়া স্বীকৃতি দেন নাই। এই রাজ্যটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইয়াছিল। ১৮৫৬ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী লালকেল্লার প্রাসাদ ও বাদশা উপাধি পাইবেন না। ইহাতে ভারতীয় মুসলমান সমাজে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৮৫৬ খ্রীঃ ডালহৌসী কর্তৃক অযোধ্যার স্বাধীনতা হরণ দেশীয় রাজাদের ব্রিটিশ সম্পর্কে আরও সন্দিগ্ধ করিয়া তোলে। সকলেই বুঝিতে পারেন রাজভক্তি বা আনুগত্য, লিখিত-চুক্তি বা মৌখিক-প্রতিশ্রুতি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

রাজনৈতিক কারণ

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর নানা কারণে এই দেশীয় মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি বাড়িয়া যায়। ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় অযোধ্যা অঞ্চলের জমিদার ও তালুকদারদের অনেকে তাঁহাদের জমিদারী হারান। কৃষকদের দেয় করের হার বাড়িয়া যায়। সাধারণভাবে রায়তওয়ারী ও মহালওয়ারী অঞ্চলে ভূমি-রাজস্বের হার ছিল বেশ উচ্চ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অঞ্চলে ভূমিতে রায়তের কোন

অধিকার ছিল না। জমিদাররা খুশীমত উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য ও আদায় করিতেন। ব্রিটিশ সরকার নিজের আয় বৃদ্ধির জন্য বহু নিষ্কর জমি খাস করিয়া লন। ইহাতে বহুলোক দুরবস্থায় পতিত হয়। ডালহৌসীর সময়ে বোম্বাইয়ের 'ইনাম কমিশন' দাক্ষিণাত্যের বিশ হাজার এস্টেট খাস করিয়া লন। ব্রিটিশ শাসনে এদেশীয়দের উচ্চপদ লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভারতীয় অভিজাতগণ শাসন ও বিচার বিভাগ হইতে অপসারিত হন। দেশীয় সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে হাজার হাজার পেশাদার সৈনিক জীবিকাচ্যুত হয়। দেশীয় রাজা ও নবাবদের পতনের ফলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সহিত যুক্ত বহু ফকীর, সাধু, মৌলভী ও পণ্ডিত জীবিকা হারান। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শোষণ এদেশের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি করে। এদেশের লক্ষ লক্ষ তাঁতী, কারিগর, মজুর ও চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সারা দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ জীবিকাচ্যুত মানুষের জীবন ধারণের কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না। ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসন এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। ফলে দেশব্যাপী বেকারত্ব ও দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল ঃ দিল্লী হইতে প্রচারিত বিদ্রোহীদের ঘোষণায় দেশে করভার বৃদ্ধি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ও বেকারত্বের কথা উল্লেখ করা হয়।

অর্থনৈতিক কারণ

ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠিত ভুমি রাজস্বব্যবস্থা, প্রশাসন ও আইনের কঠোরতা জনগণকে এই শাসনের প্রতি বিরূপ করিয়া তোলে। ব্রিটিশ শাসন নানা কারণে ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। বিচার ও পুলিস বিভাগ ছিল জনগণের নিকট রীতিমত ভয়ের বস্তু। দেশের ধনী ও মহাজনরা পুলিস, নিম্ন আদালত ও ছোটখাট রাজকর্মচারীদের সহায়তায় গরীবদের শোষণ ও নির্যাতন করিত। ব্রিটিশ জাতি এই দেশে চিরকাল বিদেশী রহিয়া যায়। এই দেশের মানুষের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিল প্রভু ও দাসের। শাসক ব্রিটিশ ও শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে কোন স্বাভাবিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ বিজয়ীর জাতি ভাবিত। ভারতীয়রা ইহাদের চোখে ছিল নিম্নস্তরের প্রাণী। ইহারা শাসিতের সহিত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও ঘৃণ্য আচরণ করিত। ভারতে দ্রুত পশ্চিমী শিক্ষার অনুপ্রবেশ এবং আধুনিকীকরণ রক্ষণশীল সমাজের মনঃপুত হয় নাই। ভারতীয় সমাজ-সংস্কারদের পরামর্শে সতীদাহ প্রথা বন্ধ, বিধবার পুনর্বিবাহের প্রচলন, শিশুহত্যা নিষিদ্ধকরণ, স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি এই দেশের ধর্ম ও সমাজের উপর বিদেশীর হস্তক্ষেপ বলিয়া গণ্য করা হয়। এমনকি আধুনিকীকরণও ভাল চোখে দেখা হয় নাই। রেললাইন স্থাপন ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সন্দেহের চোখে দেখা হইত। ১৮৫০ খ্রীঃ ধর্মান্তরিত ভারতীয়ের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার আইন পাশ হয়। ইহা বিদেশী শাসকের এদেশীয়দের ধর্মান্তরিত করিবার প্রচেষ্টায় উৎসাহ দান বলিয়া গণ্য করা হয়।

সামাজিক কারণ

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের বিরাগের ধর্মীয় কারণও ছিল। এদেশীয় জনমানসে এমন ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল যে ব্রিটিশ সরকার ও রাজপুরুষগণ এদেশের

সকল মানুষকে খ্রীষ্টান করিতে চান। ব্রিটিশ সরকারের অবশ্য এইরকম কোন রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল না। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় খ্রীষ্টান মিশনারীগণের এরূপ কর্মসূচী ছিল। ভারতের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের উচ্চ রাজপুরুষগণ মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিতেন। মিশনারীগণ এদেশীয়দের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য নানারূপ প্রলোভন দেখাইত। বিদ্যালয়, জেলখানা, হাসপাতাল, এমনকি হাটে-বাজারেও ইহাদের সক্রিয় দেখা যাইত। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ এদেশীয় হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের নিন্দা করিত। ইহাদের বিরুদ্ধে জঘন্য ও মিথ্যা প্রচার চালাইত। জনগণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায় যে ব্রিটিশ সরকার এদেশের সকলকে খ্রীষ্টান করিতে বদ্ধপরিকর। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এদেশে খ্রীষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা লইয়া আলোচনা হইত। ইহাতে ভীতি ও আশঙ্কা আরও বাড়িয়া যায়।

ধর্মীয় কারণ

১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শুরু হইয়াছিল। ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী ব্রিটিশের ভারত জয় সম্ভব করিয়াছিল। অথচ এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। অসামরিক ভারতীয় সমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও হতাশা তাহাদের মধ্যেও প্রতিফলিত হইত। সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ অফিসাররা ভারতীয় সিপাহীদের ঘৃণার চোখে দেখিত। তাহাদের গালিগালাজ করা হইত এবং অন্যান্য অভদ্র ব্যবহারও চলিত। একজন ভারতীয় সিপাহী ব্রিটিশ সিপাহী অপেক্ষা কম বেতন পাইত। ভারতীয়দের পদোন্নতি ছিল না। খাওয়া-দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থাও ছিল নিকৃষ্ট মানের। ১৮৫৬ খ্রীঃ আইন করা হয় নবনিযুক্ত যে কোন সিপাহীকে সাগর পারে যাইতে হইবে। কোন আপত্তি টিকিবে না। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জাতি নির্দেশক চিহ্ন (যেমন পাগড়ী) ধারণ নিষিদ্ধ হয়। খ্রীষ্টান পাদরীগণ সৈন্যবাহিনীতে ধর্মপ্রচার করিতেন। সৈনিকদের ধারণা হয় ব্রিটিশ শাসনাধীনে তাহাদের ধর্ম নিরাপদ নয়। সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশী। ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে অনুপাত ছিল প্রতি পাঁচজনে একজন (৫ : ১)। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দিত। 'বেঙ্গল আর্মি''তে এই বিদ্রোহের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। বিদ্রোহ ঘটিলে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত অতি দ্রুত তাহা দমন করা হইত।

সামরিক কারণ

১৮৫৭ খ্রীঃ দেশের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথম আফগান যুদ্ধে (১৮৩৮—৪২) ব্রিটিশবাহিনীর বিপর্যয় এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪—৫৬) ইংলণ্ডের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ব্রিটিশের অপরাজেয় সামরিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা নষ্ট করিয়া দেয়। ঠিক এই সময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে 'এনফিল্ড রাইফেল' নামক এক নূতন আগ্নেয়াস্ত্র চালু করেন। এই রাইফেলের কার্তুজ চর্বি লাগানো এক মোড়কে থাকিত। মোড়কটি দাঁতে কাটিয়া কার্তুজ বাহির করিতে হইত। জনরব উঠিল ঐ মোড়কে শূকর

বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ

ও গরুর চর্বি রহিয়াছে। ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রিটিশ সরকার এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মনাশ করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার পর বিদ্রোহ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

১৮৫৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে ব্যারাকপুরের সৈন্য শিবিরে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে এই মহাবিদ্রোহ শুরু হয়। ঐ বৎসর ১০ই মে মীরাট শহরে এই বিদ্রোহ আরও বিরাট আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিদ্রোহ ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিয়া উত্তর, পূর্ব ও মধ্য ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। উত্তর ও মধ্য-ভারতের সর্বত্র সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে জনগণও যোগ দিয়াছিল।

বিদ্রোহের বিস্তৃতি

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে চাষী ও মজুর শ্রেণীর বহু লোক এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। ইহাতে বিদ্রোহ শক্তিশালী হয়। এই বিদ্রোহের মুখ্য কেন্দ্র ছিল দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্মৌ, বেরিলী, ঝাঁসী এবং বিহারের আরা অঞ্চল। উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে নর্মদার তীরভূমি এবং পূর্বে বিহার হইতে পশ্চিমে রাজপুতনা এই বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া হইলেও সারা ভারতে প্রসারিত হয় নাই। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ঘটে নাই। সর্বশ্রেণীর মানুষও ইহাতে যোগ দেয় নাই। নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ও সামন্ত প্রভুরা এই বিদ্রোহে যোগ দেন নাই। অনেকে এই বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল। বলা যায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা ও সমর্থন এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল না।



দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্

বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী দখল করিয়া বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে হিন্দুস্তানের বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করা হয়। বখ্‌ত খান দিল্লীর বিদ্রোহ পরিচালনার ভার নেন। কানপুরে নানাসাহেব ও তাঁহার দুই বিশ্বস্ত অনুচর তাঁতিয়া টোপী ও আজিমুল্লাহ্ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। অযোধ্যায় বেগম এবং ঝাঁসীতে লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহীদের নেত্রী ছিলেন। অযোধ্যা অঞ্চলে বিদ্রোহের আর একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন ফৈজাবাদের মৌলভী আহম্মদুল্লাহ্। ইনি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন। বিহারে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন জগদীশপুরের রাজা কুনওয়ার সিংহ। বিদ্রোহের নেতারা সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিলেও ইঁহাদের মধ্যে ঐক্য বা সংহতি ছিল না। বিদ্রোহ পরিচালনায় সাধারণ কর্মসূচী বা পরিকল্পনার অভাব লক্ষিত হয়। নেতাগণ

বিদ্রোহের নেতৃত্ব

অনেক সময় পরস্পরকে সন্দেহ করিতেন এবং আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত হইতেন। অযোধ্যার বেগম মৌলভী আহম্মদ্‌ল্লাহ্‌র সহিত কলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। নেতাদের



লক্ষ্মীবাঈ



নানাসাহেব

স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং গোষ্ঠীতান্ত্রিক মনোবৃত্তি বিদ্রোহের প্রাণশক্তিকে দুর্বল করিয়া দেয়।

১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের প্রকৃতি ঃ ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের চরিত্রে বিচার লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। সমকালীন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও লেখকগণ এই বিভ্রান্তির জন্য অনেকখানি দায়ী। নর্টন, ডাফ প্রমুখ লেখকগণ বিদ্রোহের ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া ইহাকে ভারতের জাতীয় বিদ্রোহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আবার ফরেস্ট, বল, হোমস (Holmes), জন কে (Kaye) প্রমুখ লেখকগণ ইহাকে শুধু সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্যার সৈয়দ আহম্মদ, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমকালীন ভারতীয়রা ইহাকে শুধু সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে দেখিয়াছেন। ইঁহাদের মতে সিপাহীদের অভাব-অভিযোগ লইয়া এই বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যে প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উত্তর ভারতের সাধারণ মানুষ এবং উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কৃষক ও মজুর এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের পুঞ্জীভুত অভিযোগের বহিঃপ্রকাশ ছিল ১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহ। সুতরাং ইহাকে শুধু সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া নস্যাৎ করা ঠিক হইবে না।

ভারতীয় লেখকগণের অনেকে (সাভারকার, অশোক মেহতা) ইহাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ছিল

দেশের স্বাধীনতা অর্জন। নিরস্ত্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি হিসাবে সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা বিদ্রোহ করেন। দেশের সম্রাট হিসাবে তাঁহারা বাহাদুর শাহের হস্তে কর্তৃত্ব তুলিয়া দেন। হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে তাঁহাকে হিন্দুস্তানের বাদশা বলিয়া মানিয়া লয়। ইহাকে স্বাধীনতার যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই মতের বিরোধীরা ইহাকে দেশে সামন্তপ্রথা পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা যুক্তি দেখান যে দেশের সমস্ত মানুষ বা সমস্ত অঞ্চল স্বাধীনতা যুদ্ধের সামিল হয় নাই। এই যুক্তি বেশ দুর্বল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কখনও সমস্ত অঞ্চল বা সমস্ত মানুষ যোগদান করে নাই। ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে মধ্যাঞ্চলে পোপের রাজ্যটি জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে রীতিমত লড়াই করিয়াছিল। দক্ষিণ জার্মানীর ক্যাথলিক রাজ্যগুলি ফ্রান্সের সহযোগিতায় বিসমার্কের ঐক্য প্রয়াসে বাধা দিয়াছিল। ইহাতে এই সমস্ত দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। নেতৃত্বের চরিত্র ও মানসিকতা যাহাই হোক না কেন বিদ্রোহীরা যে ভারতের স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কার্ল মার্কস ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে ভারতের জনগণের মুক্তি-সংগ্রাম বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ঔপনিবেশিক শাসনে শোষিত জনগণের মুক্তি সংগ্রাম সামন্ত প্রভুদের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যর্থ হয়। আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা জাতীয় বিদ্রোহ বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নন। ইঁহাদের মতে, ১৮৫৭ খ্রীঃ দেশে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় নাই। কোন কোন অঞ্চলে এই বিদ্রোহ (অযোধ্যা ও বিহারের শাহাবাদ) গণ-বিদ্রোহের রূপ লইলেও ইহাকে জাতীয় বিদ্রোহ বলা যায় না। বিদ্রোহীদের সকলে দেশপ্রেমিক ছিলেন না। লুণ্ঠন ও অরাজকতা সৃষ্টি অনেকের লক্ষ্য ছিল। আধুনিক কালে ভারতীয় ও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিদ্রোহের চরিত্র বিচারে মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। ইঁহারা এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। আবার ইহাকে শুধু সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া বাতিল করিতেও ইঁহারা রাজী নন। ইঁহাদের মতে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ নয় ঠিকই, তবে সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষা ইহা অনেক বড় ঘটনা। ইহাকে ১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহ বলাই সঙ্গত।[১]

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণঃ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সিপাহীগণ, সাধারণ মানুষ, কৃষক ও মজুর সাহস ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমেরও অভাব ছিল না। তবুও তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে। শত শত বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। (১) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল সিপাহীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব। বিদ্রোহীগণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই করিয়াছিল। বিভিন্ন বিদ্রোহীগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ বা সাধারণ কর্মসূচী ছিল

(৭) টমাস. আর. মেটকাফ—আফটারমাথ অব রিভোল্ট—ইণ্ডিয়া ১৮৫৭-১৮৭০।

না। একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও ইহা পরিচালনা করে নাই। প্রতিপক্ষ ইংরেজগণ সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সিপাহীদের সহিত লড়াই করে। অপরদিকে সিপাহীদের পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র, তরবারি, বর্শা ও বল্লমের উপর নির্ভর করিতে হয়। (২) বিদ্রোহীরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তি কৌশলের সাহায্য পায় নাই। ইংরেজগণ এই দেশের রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগের সাহায্য লইয়া দ্রুত সৈন্য চলাচল ও সংবাদ আদান-প্রদান করিতে সক্ষম হয়। (৩) ইংরেজগণ এদেশের সামন্ত রাজাদের সাহায্য লইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, হায়দ্রাবাদের নিজাম, নেপালের রাণা, কাশ্মীরের রাজা প্রভৃতি ব্রিটিশ সরকারকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য দেন। আফগানিস্তানের শাসক দোস্ত মুহম্মদ ইংরেজদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। শিখ ও গুর্খা সৈন্য ইংরেজদের প্রতি অনুগত থাকে। রাজপুত ও মারাঠারাও ব্রিটিশের বিরুদ্ধাচারণ করে নাই।

(৪) বিদ্রোহীরা ভারতের সর্বত্র এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবে বিদ্রোহ হয় নাই। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্রোহ হইতে দূরে ছিল। সিপাহীদের লুঠপাটে ও অরাজকতায় বিরক্ত হইয়া অনেকে বিদ্রোহের অবসান কামনা করে। (৫) এই দেশের মহাজন, বণিক ও জমিদারশ্রেণী বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য দেয়। বাংলার জমিদার ও কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বড় বড় ব্যবসায়ীগণ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ নেয়। (৬) এই বিদ্রোহের নেতৃত্বের দুর্বলতা ইহার ব্যর্থতার জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। বিভিন্ন কারণে বিক্ষুব্ধ বহু গোষ্ঠী এই বিদ্রোহ শুরু করে। বিদ্রোহ সাফল্যলাভ করিলে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। ভিন্নমুখী লক্ষ্যের টানাপোড়েনে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। প্রাদেশিকতা গোষ্ঠীতান্ত্রিক মনোভাব ও সর্বভারতীয় চেতনা বা জাতীয়তাবোধের অভাব এই বিদ্রোহের পতন ঘটায়। (৭) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি ব্রিটিশ সরকারের সহিত বিরোধে জয়ী হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তাহাদের ছিল অপরিমিত সৈন্য-সামন্ত, সামরিক উপকরণ ও প্রভূত অর্থ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নৌবহর ছিল ইহার অধীন। এইরূপ শক্তিধর প্রতিপক্ষের সহিত তুলনায় বিদ্রোহীদের শক্তি ও সামর্থ্য ছিল নগণ্য। (৮) জন লরেন্স, আউটরাম, হ্যাভলক, নীল, ক্যাম্পবেল, এডওয়ার্ডস্ ও হিউরোজ প্রভৃতি ইংরেজ রাজপুরুষ ও সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষগণ বিদ্রোহদমনে অসাধারণ সাহস, যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তুলনায় এদেশীয় নেতৃত্ব খুব সংগঠিত ছিল না।

১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের তাৎপর্য ঃ ১৮৫৯ খ্রীঃ শেষদিকে মহাবিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমিত হয়। ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহ দমিত হইলেও ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। ভারতের ইতিহাসে ইহা এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। মধ্যযুগের প্রথাগত পদ্ধতিতে এবং এদেশীয় নেতাদের নেতৃত্বে ভারতকে বিদেশী শাসনমুক্ত করিবার ইহা ছিল এক মরণপণ প্রয়াস। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার ইহা ছিল এক মহান সংগ্রাম। এই বিদ্রোহ ভারতের জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের উত্থানের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। বিদ্রোহের সময় এদেশীয় বিদ্রোহী ও ইংরেজ শাসকগণ যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন তাহা উভয় জাতির মধ্যে চিরদিনের জন্য বিভেদের বীজ বপন করে। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকগণ এদেশীয়দের আর কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। জাতিবৈরিতা ও বিদ্বেষ ব্রিটিশ শাসনকে কলঙ্কিত করে। এই সময় হইতে ভারতীয়রা ক্রমশঃ ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে থাকে। বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ শাসনও পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। ১৮৫৭ খ্রীঃ সংগ্রামী বীরদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম পরবর্তীকালে জাতীয় সংগ্রামে প্রেরণার উৎস হইয়া দাঁড়ায়। ভারতীয় জনগণ ১৮৫৭ খ্রীঃ বীরদের কখনও বিস্মৃত হয় নাই। ইহাদের জাতীয় বীরের সম্মান দেওয়া হয়। জাতীয় আন্দোলনের উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহীদের বিশেষ মর্যাদা দেন। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বিদ্রোহী নেতাদের নামোল্লেখ পর্যন্ত সহ্য করিতে পারিত না। এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা যায়, ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ কার্যত ব্যর্থ হইলেও জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণা হিসাবে ইহা সার্থক হইয়াছিল।

অনুশীলনী

১। **এককথায় উত্তর দাও :—**(ক) আবদুল ওহাব কে ছিলেন? (খ) ভারতে
ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে? (গ) ফরাজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে?
(ঘ) কোল বিদ্রোহের দুইজন নেতার নাম কর। (ঙ) কোন্ গভর্ণর-জেনারেলের শাসন-
কালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়? (চ) সাঁওতাল বিদ্রোহের দুইজন নেতার নাম কর।
(ছ) তিতুমীর কোন্ জেলার লোক? (জ) মঙ্গল পাণ্ডে কে ছিলেন?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :—**(ক) ওহাবী আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক
কারণগুলি কি? (খ) ওহাবী আন্দোলনের বিবরণ দাও। (গ) ওহাবী আন্দোলনের
চরিত্র বিচার কর। (ঘ) তীতুমীর কে ছিলেন? তাঁহার আন্দোলনের পরিচয় দাও।
(ঙ) ফরাজী আন্দোলনের ফলাফল কি হইয়াছিল? (চ) ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের
নেতৃত্বের পরিচয় দাও। (ছ) এই বিদ্রোহ কোন্ কোন্ অঞ্চলে ঘটিয়াছিল? (জ) কোল
ও সাঁওতাল বিদ্রোহ কেন ব্যর্থ হয়?

৩। **বিশদভাবে আলোচনা কর :—**(ক) ফরাজী আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত
বিবরণ দাও। (খ) কোল বিদ্রোহের কারণগুলি আলোচনা কর। (গ) সাঁওতালরা কেন
বিদ্রোহী হয়? (ঘ) ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের কাবণগুলি আলোচনা কর। (ঙ) ১৮৫৭
সনের বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৪। **টীকা লিখ :—**(ক) সালামী (খ) তলবানী (গ) এনফিল্ড রাইফেল (ঘ) মঙ্গল
পাণ্ডে (ঙ) বখ্ত খান (চ) আজিমুল্লাহ্ (ছ) মৌলভী আহমদুল্লাহ্ (জ) অযোধ্যার
বেগম। (ঝ) তাঁতিয়া টোপী (ঞ) নানাসাহেব (ট) লক্ষ্মীবাঈ।

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**—(ক) উত্তর প্রদেশের — অধিবাসী সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন ভারতে ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। (খ) — ও — ছিলেন তাঁহার দুইজন বিশিষ্ট অনুচর। (গ) বারাসাতের জমিদার — প্রজাদের উপর নূতন কর স্থাপন করেন। (ঘ) তিতুমীর —বাঁশের কেল্লা বানাইয়া ব্রিটিশ শক্তির সহিত লড়াই করেন। (ঙ) — খ্রীঃ কোল বিদ্রোহ ঘটে। (চ) সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন —। (ছ) ছোটনাগপুর, সিংভূম ও পালামৌ অঞ্চলের — বিদ্রোহ করে। (জ) ভাগলপুর, রাজমহল ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের — ১৮৫৫ খ্রীঃ বিদ্রোহ করে। (ঝ) — খ্রীঃ ধর্মান্তরিত ভারতীয়ের পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইন পাশ হয়।

৬। **শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও :**—(ক) হাজী শরিয়ত উল্লাহ / তিতুমীর বাংলাদেশে ফরাজী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। (খ) ডোমনমাঝি, বীরসিং / সিনগ্রাই, বিন্দাই, খাঁজ পাটের কোল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। (গ) ১৮৫৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে ব্যারাকপুরে / মীরাটে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। (ঘ) আজিমুল্লাহ্ বাহাদুরশাহ / নানাসাহেব / অযোধ্যার বেগমের অনুচর ছিলেন। (ঙ) ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্ণর-জেনালের ছিলেন ডালহৌসী / লর্ড ক্যানিং।

ভারত ইতিহাসের কালপঞ্জী

(হরপ্পা সভ্যতা হইতে ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহ পর্যন্ত)

হরপ্পা সভ্যতার সূচনাকাল	—আনুমানিক খ্রী. পূ. ৩০০০ অব্দ।
আর্যদের ভারতে আগমনকাল	—আনুমানিক খ্রী. পূ. ২০০০ অব্দ।
ঋক্‌বেদের রচনাকাল	—আনুমানিক খ্রী. পূ. ১৫০০ অব্দ।
বর্ধমান মহাবীরের জন্ম ও মৃত্যু	—আনুমানিক খ্রী. পূ. ৫৪০ ও ৪৬৮ অব্দ।
গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যু	—আনুমানিক খ্রী. পূ. ৫৬৬ ও ৪৬৮ অব্দ।
আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ	—খ্রী. পূ. ৩২৭-৩২৬ অব্দ।
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনারোহণ	—খ্রী. পূ. ৩২৪ অব্দ।
সম্রাট অশোকের সিংহাসনারোহণ	—খ্রী. পূ. ২৭৩ অব্দ।
শকাব্দের শুরু	—৭৮ খ্রী.
গুপ্ত সম্বতের শুরু	—৩২০ খ্রী.
ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ	—৪০১-৪১০ খ্রী.
পয়গম্বর হজরত মহম্মদের জন্ম	—৫৭০ খ্রী.
হিজরী সন	—৬২২ খ্রী.
শশাঙ্কের রাজত্বকাল	—৬১৯-৬৩৬ খ্রী.
চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর অভিষেক	—৬০৯ খ্রী.
হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল	—৬০৬-৬৪৭ খ্রী.
হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ	—৬৩০-৬৪৫ খ্রী.
মহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়	—৭১২ খ্রী.
চোলরাজ রাজরাজের সিংহাসন লাভ	—৯৮৫ খ্রী.
সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সূচনা	—১০০১ খ্রী.
তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ	—১১৯১ ও ১১৯২ খ্রী.
দিল্লীতে স্বাধীন সুলতানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা	—১২০৬ খ্রী.
ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদের (বখতিয়ার খলজী) বঙ্গ বিজয়	—১২০০-১২০৫ খ্রী.
চেঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে ভারতে প্রথম মোঙ্গল আক্রমণ	—১২২১ খ্রী.
মার্কোপোলোর ভারত ভ্রমণ	—১২৮৮ খ্রী.
তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ	—১৩৯৮ খ্রী.
নিকোলোকন্তির বিজয়নগর ভ্রমণ	—১৪২০ খ্রী.
আবদুর রজ্জাকের ভারত আগমন	—১৪৪৩ খ্রী.
গুরু নানকদেবের জন্ম	—১৪৬৯ খ্রী.
চৈতন্যদেবের জন্ম	—১৪৮৫ খ্রী.
ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আগমন	—১৪৯৮ খ্রী.
গোয়ায় পর্তুগীজ অধিকার প্রতিষ্ঠা	—১৫১০ খ্রী.

প্রথম পানিপথের যুদ্ধ ও ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা	—১৫২৬ খ্রী.
খানুয়ার যুদ্ধ	—১৫২৭ খ্রী.
ঘর্ঘরার যুদ্ধ	—১৫২৯ খ্রী.
শেরশাহ্ কর্তৃক দিল্লী অধিকার	—১৫৪০ খ্রী.
দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ	—১৫৫৬ খ্রী.
তালিকোটার যুদ্ধ	—১৫৬৫ খ্রী.
বাংলায় মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা	—১৫৭৬ খ্রী.
রাণা প্রতাপের সহিত আকবরের হলদীঘাটের যুদ্ধ	—১৫৭৬ খ্রী.
দীন-ই-ইলাহী ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা	—১৫৮২ খ্রী.
ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা	—১৫৯৯ খ্রী.
আকবরের আসীরগড় দুর্গজয়	—১৬০১ খ্রী.
সুরাটে প্রথম ইংরেজ কুঠী স্থাপন	—১৬১২ খ্রী.
সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস রোর দৌত্য	—১৬১৬ খ্রী.
শিবাজীর জন্ম	—(মতান্তরে ১৬৩০) ১৬২৭ খ্রী.
বাংলার সুবাদার শাহ্ সুজা কর্তৃক ইংরেজদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য অধিকার দান	—১৬৫১ খ্রী.
শিবাজীর রাজ্যাভিষেক	—১৬৭৪ খ্রী.
পণ্ডিচেরীর প্রতিষ্ঠা	—১৬৭৪ খ্রী.
জোব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা	—১৬৯০ খ্রী.
পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা	—১৭১৩ খ্রী.
সম্রাট ফারুখশিয়ারের নিকট হইতে ইংরেজ কোম্পানীর ফারমান লাভ	—১৭১৭ খ্রী.
নাদিরশাহের দিল্লী অধিকার	—১৭৩৯ খ্রী.
বাংলায় মারাঠা আক্রমণের সূচনা	—১৭৪২ খ্রী.
নবাব সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকার	—১৭৫৬ খ্রী.
পলাশীর যুদ্ধ	—১৭৫৭ খ্রী.
বন্দীবাসের যুদ্ধ	—১৭৬০ খ্রী.
তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ	—১৭৬১ খ্রী.
বক্সারের যুদ্ধ	—১৭৬৪ খ্রী.
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীলাভ	—১৭৬৫ খ্রী.
বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	—১৭৭০ খ্রী.
রেগুলেটিং এ্যাক্ট	—১৭৭৩ খ্রী.
হিকিসাহেব কর্তৃক প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট প্রতিষ্ঠা	—১৭৮০ খ্রী.
কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা	—১৭৮১ খ্রী.
সলবাইয়ের সন্ধি	—১৭৮২ খ্রী.
ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি	—১৭৮৪ খ্রী.

বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা	—১৭৮৪ খ্রী.
শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি	—১৭৯২ খ্রী.
কাশীতে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা	—১৭৯২ খ্রী.
বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	—১৭৯৩ খ্রী.
মহাদজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু	—১৭৯৪ খ্রী.
টিপু সুলতানের পতন	—১৭৯৯ খ্রী.
নানাফাড়নীশের মৃত্যু	—১৮০০ খ্রী.
শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা	—১৮০০ খ্রী.
কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন	—১৮০০ খ্রী.
বেসিনের সন্ধি	—১৮০২ খ্রী.
ইংরেজদের সহিত রঞ্জিৎ সিংহের অমৃতসরের সন্ধি	—১৮০৯ খ্রী.
নেপাল ও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে সগৌলীর সন্ধি	—১৮১৬ খ্রী.
কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা	—১৮১৭ খ্রী.
দিগ্‌দর্শন ও সমাচার দর্পণ প্রকাশ	—১৮১৮ খ্রী.
ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা	—১৮২৮ খ্রী.
সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন	—১৮২৯ খ্রী.
কোল বিদ্রোহ	—১৮৩১-৩২ খ্রী.
লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ	—১৮৩৫ খ্রী.
কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা	—১৮৩৫ খ্রী.
জমিদার সমিতির প্রতিষ্ঠা	—১৮৩৭ খ্রী.
ইংরেজদের সিন্ধু জয়	—১৮৪৩ খ্রী.
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা	—১৮৪৩ খ্রী.
ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কর্তৃক কলিকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন	—১৮৪৯ খ্রী.
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা	—১৮৫১ খ্রী.
ভারতে প্রথম রেলপথ (বোম্বাই হইতে থানা) উদ্বোধন	—১৮৫৩ খ্রী.
প্রথম টেলিগ্রাফ উদ্বোধন	—১৮৫৩ খ্রী.
প্রথম ডাক টিকিটের প্রচলন	—১৮৫৪ খ্রী.
স্যার চার্লস উডের শিক্ষা বিষয়ক ডেসপ্যাচ	—১৮৫৪ খ্রী.
সাঁওতাল বিদ্রোহ	—১৮৫৫-৫৬ খ্রী.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	—১৮৫৭ খ্রী.
সিপাহী বিদ্রোহ	—১৮৫৭ খ্রী.

মগধের রাজবংশাবলী

(ক) হর্যঙ্ক বংশ ঃ (খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)

(১) বিম্বিসার (৫৪৫—৪৯৩)
|
২) অজাতশত্রু (৪৯৩—৪৬২)
|
(৩) উদয়ী (৪৬২—৪৪৫)
|
(৪) অনিরুদ্ধ ও মুণ্ড (৪৪৫—৪৩৭)
|
(৫) নাগদশক (৪৩৭—৪৩০)

(খ) শৈশুনাগ বংশ ঃ

(১) শিশুনাগ
|
(২) কালাশোক বা কাকবর্ণ
|
(৩) নন্দী বর্ধন ও তাঁহার ভ্রাতাগণ

(গ) নন্দবংশ ঃ (খ্রীঃ পূঃ ৩৬৪—৩২৪)

(১) মহাপদ্ম নন্দ
|
(২) আটপুত্র—শেষ রাজা ধননন্দ

(ঘ) মৌর্যবংশ ঃ

(১) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (প্রিয়দর্শন) খ্রীঃ পূঃ ৩২৪—৩০০ অব্দ
|
(২) বিন্দুসার (অমিত্রঘাত) খ্রীঃ পূঃ ৩০০—২৭৩ অব্দ
|
সুশিম (সুমন) — (৩) অশোক (প্রিয়দর্শী) খ্রীঃ পূঃ ২৭৩—২৩৬ — বিগতাশোক

সুশিম (সুমন)
|
মহেন্দ্র

(৩) অশোক — সংঘমিত্রা (কন্যা), চারুমতী (কন্যা), (৪) কুনাল, জলৌক, তিবর

(৪) কুনাল — (৫) দশরথ, (৬) সম্প্রতি, বিগতাশোক

(৬) সম্প্রতি
|
(৭) শালিশুক
|
(৮) বৃহদ্রথ

বিগতাশোক
|
বীরসেন

গুপ্তবংশ ঃ

(১) শ্রীগুপ্ত
|
(২) ঘটোৎকচগুপ্ত
|
(৩) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
|
(৪) সমুদ্রগুপ্ত
|

- (৫) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য
  - গোবিন্দগুপ্ত
  - (৬) প্রথম কুমারগুপ্ত
    - (৭) স্কন্দগুপ্ত
    - (৮) পুরুগুপ্ত
      - (৯) নরসিংহগুপ্ত (বালাদিত্য)
        - দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
          - বিষ্ণুগুপ্ত
      - (১০) বুধগুপ্ত
    - ঘটোৎকচগুপ্ত
  - প্রভাবতী (কন্যা)

বাংলার পাল ও সেন বংশ

পালবংশ ঃ

- দয়িতাবিষ্ণু
  - শ্রীবাপ্যত
    - (১) প্রথম গোপাল
      - (২) ধর্মপাল
        - ত্রিভুবনপাল
        - (৩) দেবপাল
          - রাজ্যপাল
      - বাকপাল
        - জয়পাল
          - বিগ্রহপাল
            - নারায়ণপাল
              - রাজ্যপাল
                - দ্বিতীয় গোপাল
                  - দ্বিতীয় বিগ্রহপাল
                    - প্রথম মহীপাল
                      - নয়পাল
                        - তৃতীয় বিগ্রহপাল

সেনবংশ ঃ

- বীরসেন
  - সামন্তসেন
    - হেমন্তসেন
      - বিজয়সেন
        - বল্লালসেন
          - লক্ষ্মণসেন

দিল্লী সুলতানী (ইলবারী তুর্কী শাসকগণ)
১২০৬—১২৯০

- (১) কুতবউদ্দিন আইবক
  - (২) আরামশাহ্
  - (৩) জামাতা ইলতুৎমিশ
    - নাসিরুদ্দিন মাহমুদ
    - (৪) রুকনুদ্দিন ফিরোজ শাহ্
      - (৭) আলাউদ্দিন মাসুদ
    - (৫) সুলতানা রাজিয়া
    - (৬) মুইজুদ্দিন বাহরাম
    - (৮) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ
      - (৯) শ্বশুর গিয়াসউদ্দিন বলবন
        - মহম্মদ
          - (১০) কায়কোবাদ
        - বুখরা খান

খলজী বংশ (১২৯০—১৩২০)

- কায়িমখান
  - ১) জালালুদ্দিন ফিরোজ শাহ্
    - (২) রুকনুদ্দিন ইব্রাহিম
    - (৩) জামাতা আলাউদ্দিন
      - খিজর খান
      - (৪) শিহাবুদ্দিন ওমর
      - (৫) কুতুবুদ্দিন মুবারক
        - (৬) নাসিরুদ্দিন খসরু

তুঘলক বংশ (১৩২০—১৪১৩)

- (১) গিয়াসউদ্দিন তুঘলক
  - (২) মহম্মদ বিন তুঘলক
- ভ্রাতা রজব
  - (৩) ফিরোজ শাহ্
    - ফতখান
      - (৪) দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন তুঘলক
      - (৮) নসরত শাহ্
    - জাফরখান
      - (৫) আবুবকর
    - (৬) নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ শাহ্
      - (৭) আলাউদ্দিন সিকান্দর
      - (৯) মাহমুদ শাহ্

সৈয়দ ও লোদী বংশ

(ক) সৈয়দ বংশ (১৪১৪—১৪৫১) ঃ

- (১) খিজর খান
  - (২) মুইজুদ্দিন (মুবারক)
  - ফরিদ খান
    - (৩) মহম্মদ শাহ্
      - (৪) আলাউদ্দিন (আলম শাহ্)

(খ) লোদী বংশ (১৪৫১—১৫২৬) ঃ

- (১) বহলুল লোদী
  - বরবক শাহ্
  - (২) সিকান্দর লোদী
    - (৩) ইব্রাহিম লোদী
  - আলম

মুঘল বংশ (১৫২৬—১৭০৭)

- (১) জহিরুদ্দিন বাবর
  - (২) হুমায়ুন
    - (৩) জালালুদ্দিন আকবর
      - (৪) নূরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর (সলিম)
        - খসরু
        - পারভেজ
        - (৫) খুররম (শাহজাহান)
          - দারাশিকো
          - সুজা
          - (৬) আরঙ্গজেব
          - মুরাদ
        - শাহরিয়ার
      - মুরাদ
      - দানিয়াল
    - মির্জা হাকিম
  - কামরান
  - হিন্দল
  - আসকারী

পেশোয়া বংশ (১৭১৩—১৮১৮)

- বিশ্বনাথ
  - (১) বালাজী বিশ্বনাথ
    - (২) প্রথম বাজীরাও
      - (৩) বালাজী বাজীরাও
        - বিশ্বাসরাও
        - (৪) প্রথম মাধবরাও
        - (৫ নারায়ণরাও
          - (৭) মাধবরাও নারায়ণ
      - (৬) রঘুনাথ রাও
        - অমৃতরাও
        - (৯) দ্বিতীয় বাজীরাও
          - নানাসাহেব (দত্তক)
        - চিমনজী আপ্পা
    - চিমনজী আপ্পা

বাংলার নবাবগণ (১৭০০—১৭৭২)

(১ মর্শিদকুলী খান
|
(২) জামাতা সুজাউদ্দিন
|
(৩ সরফরাজ খান
|
(৪) আলীবর্দী খান
|
(৫) সিরাজুদ্দৌলা (দৌহিত্র)
|
(৬) মীরজাফর (১৭৫৭—৬০)
|
(৭) মীরকাশিম (১৭৬০—৬৩)
|
(৮) মীরজাফর (দ্বিতীয় বার, ১৭৬৩—৬৫)

- (৯) নাজমুদ্দৌল্লা (১৭৬৫—৬৬
- সৈফুদ্দৌল্লা (১৭৬৬—৭০
- মুবারক উদদোলা (১৭৭০—৭২)

পরিশিষ্ট

গভর্ণর ও গভর্ণর-জেনারেলগণ (১৭৫৭—১৮৫৭)

ক. বাংলার গভর্ণরগণ

রবার্ট ক্লাইভ	১৭৫৭—১৭৬০
ভ্যান্সিটার্ট	১৭৬০—১৭৬৫
লর্ড ক্লাইভ (দ্বিতীয়বার)	১৭৬৫—১৭৬৭
ভেরেলস্ট	১৭৬৭—১৭৬৯
কার্টিয়ার	১৭৬৯—১৭৭২
ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭২—১৭৭৪

গভর্ণর-জেনারেলগণ

ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭৪—১৭৮৫
স্যার জন ম্যাকফারসন	১৭৮৫—১৭৮৬
লর্ড কর্ণওয়ালিশ	১৭৮৬—১৭৯৩
স্যার জনশোর	১৭৯৩—১৭৯৮
লর্ড ওয়েলেসলী	১৭৯৮—১৮০৫
লর্ড কর্ণওয়ালিশ (দ্বিতীয়বার)	১৮০৫
স্যার জর্জ বার্লো	১৮০৫—১৮০৭
আর্ল অব মিণ্টো (প্রথম)	১৮০৭—১৮১৩
লর্ড হেস্টিংস	১৮১৩—১৮২৩
জন এ্যাডাম	১৮২৩
লর্ড আমহার্স্ট	১৮২৩—১৮২৮
উইলিয়ম বেইলী	১৮২৮
লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক	১৮২৮—১৮৩৫
স্যার চার্লস মেটকাফ	১৮৩৫
লর্ড অকল্যাণ্ড	১৮৩৬—১৮৪২
লর্ড এলেনবরা	১৮৪২—১৮৪৪
উইলিয়ম বার্ড	১৮৪৪
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪—১৮৪৮
লর্ড ডালহৌসী	১৮৪৮—১৮৫৬
লর্ড ক্যানিং	১৮৫৬—১৮৫৮